বঙ্গভঙ্গে জিজ্ঞাসা ও জনমত

ভাণ্ডার-সংকলন

নেতাজি ইনস্টিট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫ বৈশাখ ১৪০৭

প্রকাশক

সুরঞ্জন দাস

নেতাজি ইনস্টিট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ

১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০২০

মুদ্রক

অভিজিৎ সরকার

জেনিথ অফসেট

২০বি শাঁখারিটোলা স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০১৪

পরিবেশক

দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

-ঃ সূচী ঃ-

ভাণ্ডার । অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১৩

ভাণ্ডার । ফাল্গুন ১৩১৩

ভাণ্ডার । চৈত্র ১৩১৩

ভান্ডার ।। বৈশাখ ১৩১২

লোকশিক্ষার উপায়

অধুনা, আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসমূহের মধ্যে একটা দুর্লঙঘ্য ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাহা চিন্তা করে, যে ভাবের দ্বারা উত্তেজিত ও পরিচালিত হয়, ইংরাজি অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত ইতর সাধারণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহার একটা কারণ, আমাদের মধ্যে যে লোকশিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে। তখন নিতান্ত অজ্ঞ নিরক্ষর লোকেরাও কথকদিগের কথা শুনিয়া আমাদের পুরাতন ইতিহাস পুরাণাদির আদর্শ-চরিত্র সকল অবগত হইতে পারিত—এমন কি, দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বেরও কতকটা জ্ঞানলাভ করিত; বাউলিয়া-সম্প্রদায় সহজ উপমাচ্ছলে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করিত, তাহা তাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিত। এই জন্যই দেখা যায়, ইংলণ্ডের ইতরলোক অপেক্ষা আমাদের ইতর লোকেরা সভ্যতা ও নীতিবিষয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এইরূপে তখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান ও ভাবের সমতা রক্ষিত হইত। তখন যাহা উচ্চশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহার স্থূল মর্ম্ম, আপামর সাধারণের মধ্যেও প্রবেশ করিত।

এক্ষণে, কালের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান, ভাব, চিন্তা ও উদ্যমেরও পরিসর-বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ভাবের অনুশীলন—শুধু অনুশীলন নহে, তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও বিস্তার না করিতে পারিলে, আমাদের মঙ্গল নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিরা এক্ষণে পল্লির গণ্ডি—প্রদেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, সমস্ত ভারতকে 'জননী জন্মভূমি'' বলিতে শিখিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত সাধারণ এইরূপ উচ্চতম ও বিস্তৃত-পরিধি "স্বদেশী" ভাবে এখনো অনুপ্রাণিত হয়ে নাই। এই ভাবটি যখন জনসাধারণের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিবে, তখনি আমরা নবজীবন লাভ করিব। তখন চাঁদা উঠাইবার "চারি আনা" পদ্ধতি কেন—"দুই পয়সা" পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

এক্ষণে, এইরূপ জাতীয় ভাব—স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত করিয়া কিরূপে লোকশিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, তাহারি উপায় চিন্তা করা আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশে, এখনকার উপযোগী করিয়া, আমাদের লোকশিক্ষার পুরাতন পদ্ধতিগুলি পুনরুজ্জীবিত করা আবশ্যক।

আজকাল এই মহানগরীতে "চৈতন্য লাইব্রেরী" "সাবিত্রী লাইব্রেরী", "রামমোহন

লাইব্রেরী" প্রভৃতি লোকশিক্ষার অনেকগুলি অধিষ্ঠান হইয়াছে। উহাদের কার্য্যের পরিসর-বৃদ্ধি করা হউক। উহাদের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে যদি এক একটি "লোকশিক্ষা-বিস্তারিণী" সমিতি থাকে, তাহা হইলে লোকশিক্ষার বিবিধ উপায় নির্দ্ধারিত ও অবলম্বিত হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত পারে। উহাদের কর্ত্তৃত্বে একএকটি "জনসভা" স্থাপিত হউক। সেই সভায় কথকদিগের কথা হইবে, স্বদেশীয়ভাবের উত্তেজক উচ্চ অঙ্গের গান, বাউলিয়ার গান ও কীর্ত্তনাদি হইবে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া রাখি;—এই উদ্দেশে যদি একটি বাউলিয়ার দল গঠিত হয়, তাঁহারা পথে ঘাটে গান গাহিয়া যে ভিক্ষা উপার্জ্জন করিবেন, তাহা এই লোকশিক্ষার কাজেই ব্যয়িত হইবে। ইহা ছাড়া, এই জনসভায় সদ্‌বক্তারা, উপজীবিকার বিবিধ উপায়সম্বন্ধে—স্বাস্থ্যরক্ষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, জাতীয় উন্নতি-প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে অতি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিবেন।

মফস্বলেও, পল্লিতে পল্লিতে এইরূপ "জনসভা" সংগঠিত হউক। যে সকল ছাত্রেরা উচ্চশিক্ষার্থ কলিকাতায় আইসেন, তাঁহারা ছুটির সময়ে যখন নিজ নিজ পল্লিতে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহারা সংবাদ পত্রাদি হইতে পৃথিবীর মুখ্য ঘটনাগুলি চাষা-ভূষাদের নিকট বিবৃত করুন; কোথায় জাপান, কোথায় রুষ্, কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় আমাদের দেশ — তাহা 'গ্লোব" ও ম্যাপের সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিন; জাপানীরা কিসে যুদ্ধে জয়ী হইল, কিসে রুষেরা পরাভূত হইল, একতার অভাবে আমাদের কিরূপ দুর্দ্দশা—এই সমস্ত তাহাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন; ছায়াবাজির সাহায্যে বিভিন্ন দেশের দৃশ্য ও লোকের আকার প্রকার আচার ব্যবহারের চিত্র প্রদর্শন করুন। কি উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে, স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে—এই সকল বিষয় তাহাদের বুঝাইয়া বলুন। যাহাদের গ্রন্থপাঠ করিবার সামর্থ্য নাই, কিংবা অবসর নাই—সেই সকল ব্যক্তিরাও এইরূপে মুখে মুখে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে এবং জগতের সাধারণ ঘটনা ও দেশের অবস্থাসম্বন্ধে তাহাদের ঔৎসুক্য ক্রমশই বর্দ্ধিত হইবে।

যেখানে যেখানে "প্রাদেশিক পরামর্শ-সভা"র অধিবেশন হইবে, সেই সভার অধীনে লোকশিক্ষার উদ্দেশে এক একটি বিশেষ সমিতি সংগঠিত হউক। কি উপায়ে ইতর লোকদিগের অভাব দূর হয়, শিক্ষালাভ হয়, সেই সব বিষয়ে তাঁহারাও উপায় অবধারণ করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করুন।

এইরূপে আপামর সাধারণের সহিত শিক্ষিত-সমাজের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ নিবন্ধ হইবে, এবং এই উপায়েই আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রকৃত পত্তনভূমি প্রস্তুত হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজ-ধর্ম্ম

অমৃতের পুত্র হইয়াও জীব যেমন আপনাকে মৃত্যুর অধীন কল্পনা করিয়া অশেষ শোক-যাতনা ভোগ করে, সেইরূপ নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াই নিত্য-মুক্ত-স্বভাব প্রকৃতিপুঞ্জ আপনার অসাধারণ দৈবশক্তি ও ঐশ্বরভাব ধারণা করিতে না পারিয়াই আপনাকে দুশ্ছেদ্য-পাশবদ্ধ মনে করে এবং নির্ব্বীর্য্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অকারণে পরাধীনতার অশেষ দুঃখ দুর্গতি লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে।

ফলত দেবাংশসম্ভূত বলিয়া মানুষ স্বভাবতই স্বাধীন। স্বাধীনতা তাহার মূল প্রকৃতি ও নিত্যধর্ম্ম। এই স্বাধীনতা কদাপি কোনও কারণে একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে না। আপাতত যেখানে তাহাকে নিতান্তই পরাধীন বলিয়া মনে হয়, সেখানেও মূলত ও বস্তুত সে স্বাধীনভাবেই এই পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিয়া থাকে এবং যাহার অধীনে সে আপনাকে স্থাপন করে, কোনও না কোনও আকারে, স্বল্পবিস্তর পরিমাণে তাহাকেও আপনার অধীন করিয়া লয়।

অবলাগণের অধীনতা লোক-প্রসিদ্ধ। প্রায় সকল সভ্যসমাজেই কুলরমণী পুরুষের অধীনে বাস করেন। কিন্তু রমণীগণের এই বশ্যতা সম্ভোগ করিবার জন্য পুরুষদিগকে কতদিকে ও কতটা পরিমাণে যে আপন আপন স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া রমণীর অধীন হইয়া চলিতে হয়, ইহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও সাধারণত এ জগতে আপনার স্বাধীনতার বিনিময়-ব্যতিরেকে কেহ কোথাও অপরকে আপনার অধীনে রাখিতে পারে না।

লোকে মনে করে প্রজাই কেবল রাজার অধীন; রাজা স্বাধীন, যথেচ্ছভাবে আপনার রাজ্যশাসন করিতে পারেন, কিন্তু এইরূপ নিরঙ্কুশ রাজকীয় স্বাধীনতা ইতিহাসে কুত্রাপি কখনও দৃষ্ট হয় নাই। প্রজা যেমন রাজার অধীনে বাস করে, রাজাকেও সেইরূপ অতি অলক্ষিতে ও নিগূঢ়ভাবে আপনার প্রজাসমষ্টির অধীন হইয়া থাকিতে হয়; না থাকিলে প্রচণ্ড বিদ্রোহের দেশব্যাপী দাবালনের মধ্যে আপনার সিংহাসন রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। অর্থলোভী বেতনভোগী বৈদেশিক সৈন্যসামন্তের সাহায্যে যেখানে রাজা প্রজাবর্গের উপরে যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াছে, সেখানেও তাহাকে আপনার প্রজার বশ্যতা অস্বীকার করিতে যাইয়া এই সকল বিদেশী সেনাদলের অধীনতা অপরোক্ষভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; না করিলে যে অস্ত্রে সে আপনার প্রাজাগণকে আহত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারই আঘাতে স্বয়ং পরিণামে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে।

ফলত প্রজাশক্তি হইতেই রাজশক্তির উৎপত্তি হয়। প্রজা যদি রাজ-আধার হইতে আপনার বিপুল শক্তিরাশি প্রত্যাহার করে, রাজার পক্ষে মুহূর্ত্তকালের জন্যও শাসনদণ্ড ধারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। প্রজাশক্তিকে আপনার করায়ত্ত না রাখিলে রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা অসাধ্য বলিয়াই প্রজারঞ্জন রাজধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। রাজধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্ম পরস্পরের উপরে নিতান্তই নির্ভর করিয়া চলে, একের বিনাশে অপরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

রাজা আকাশ হইতে পতিত হয় না, ভূগর্ভ হইতেও স্ফুরিত হইয়া উঠে না। প্রাজাসাধারণের শক্তিই সমাজের কল্যাণকামনায় আধার-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হইয়া রাজার সৃষ্টি কবিয়া থাকে। দশজনে মিলিত হইয়া কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলেই, সেই দশজনের সমবেত শক্তিতে কোনও এক আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দশজনকে তাহার অধীনতা স্বীকার করতে হয; না করিলে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিযা থাকে। জনসমাজের রক্ষণাবেক্ষণ সমাজের দশজনেরই কার্য্য, সকলেরই স্বার্থ ইহার সঙ্গে সমভাবে বিজড়িত। বহিঃশত্রু ও অন্তর্বিদ্রোহ হইতে সমাজ যদি নির্মুক্ত না হয়, জনগণের পক্ষে কি আত্মরক্ষা ও পরিজনপ্রতিপালন, কি জ্ঞানচর্চ্চা, ললিতকলানুশীলন, ধর্ম্মসাধন প্রভৃতি জীবনের মহত্তব কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বা উচ্চতর সুখসম্ভোগ, কিছুই সম্ভব হয় না। সমাজ সুরক্ষিত ও সুশাসিত হইলেই প্রকৃতিপুঞ্জেব পক্ষে আপন আপন জীবনের সম্যক্ সার্থকতা সম্পাদন সাধ্যায়ত্ত হয়। এইজন্য সমাজের শাসন-রক্ষণাদির যথাযথ ব্যবস্থা করা সমাজের সকলেরই কার্য্য; এবং এই কার্য্যসিদ্ধির জন্য দেবতারা যেমন আপন আপন শক্তি ও সাধন-সম্পত্তি দ্বারা আদ্যাশক্তি ভগবতীকে সুসজ্জিত করিয়া, শুম্ভনিশুম্ভ-নিধনের জন্য রণক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমাজের দশজনের শক্তিকে সংহত করিয়াই রাজাব প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এইরূপে প্রজাশক্তি হইতেই রাজশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে। রাজা সর্ব্বত্রই প্রজার প্রতিভূ হইয়া রাজশাসন করিয়া থাকেন। প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র সর্ব্ববিধ রাজব্যবস্থাতেই রাজার প্রচণ্ড প্রতাপ ও প্রভুত্ব এই প্রজা-প্রতিভূত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাশক্তি সংহত ও আধার-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হইয়াই রাজশক্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই শক্তি-কেন্দ্র-নির্ব্বাচনের প্রণালী সর্ব্বত্র একরূপ নহে। সমাজের শৈশবে যুদ্ধবিগ্রহাদি নিত্যঘটনার মধ্যে পরিগণিত হয় এবং এই সকল যুদ্ধবিগ্রহকালে, সমাজ যখন প্রবলপরাক্রান্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, তখন সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা

বলশালী, সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপবান্, সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও যুদ্ধকৌশলবিশারদ, সমাজের সংহত শক্তিরাশি তাহাকেই স্বত অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। বিজয়ী সেনাপতিগণই এইরূপে সমাজের শৈশবে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম ক্রমে রাজধর্ম্মে পরিণত হয়।

পরবর্ত্তীকালেও রাষ্ট্রবিপ্লবাদি উপস্থিত হইলে, সমাজ আত্মরক্ষার প্রেরণায় এইরূপে নেতৃনির্ব্বাচন করিয়া থাকে। চুম্বক যেমন সহজে, বিনা আড়ম্বরে, বিচ্ছিন্ন লৌহ-কণা সকলকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করে, সহসা কোনও রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে, বলশালী বীরপুরুষেরা সেইরূপ আপন আপন সমাজের জনসাধারণের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমাজ তখন স্বেচ্ছায় ও সচ্ছন্দচিত্তে, স্বহস্তে ও সগৌরবে, ইহাদিগের বীরপ্রভাদীপ্ত ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দেয়। আসন্ন বিপদ্ভয়ে সন্ত্রস্ত পক্ষিশাবকেরা যেমন প্রকৃতির প্রেরণাতেই পক্ষিমাতার পক্ষপুটনিম্নে যাইয়া ঘননিবিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়; সভা করিয়া, বিচার করিয়া, কন্ষ্টিটিউসন্ ফাঁদিয়া পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞের মত আত্মরক্ষণ ও আত্মশাসনের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া রাখেনা; সেইরূপ আপৎকাল উপস্থিত হইলে, স্বভাবের প্রেরণাবলেই অসাধারণশক্তিশালী বীরপুরুষগণকে, আপনাদিগের শক্তিদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, অত্যাচারপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাদিগের চারিদিকে যাইয়া ঘননিবিষ্টভাবে দণ্ডায়মান হয়। ব্রিটিশ-বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশ প্রজাসাধারণে এইরূপেই আপনাদিগের শক্তিদ্বারা ক্রমওলের অভিষেক করিয়াছিল। মার্কিনিয়েরা ওয়াশিংটন্কে, ফরাসীরা নেপোলিয়ান্কে, মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজী মহারাজকে এবং শিখেরা গুরুগোবিন্দ সিংহকে এইরূপেই আত্মশক্তিদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়া নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এইরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই প্রকৃতিপুঞ্জ আত্ম-প্রয়োজনে, ব্যক্তিবিশেষে আপনাদিগের শক্তি ও অধিকারকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া রাজা বা সেনানীরূপে আপনার শীর্ষস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহার শাসনদন্ড স্বীকার করিয়া থাকে। দেবোপাসক যেমন স্বহস্তনির্ম্মিত প্রতীককে আপনার অন্তরস্থ ভাব ও ভক্তি দ্বারা সজীব ও শক্তিশালী করিয়া তাহারই চরণে ভক্তিমুক্তি প্রার্থনা করে, সেইরূপ জনমণ্ডলীও পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে আপনাদিগের শক্তি সংগ্রহ করিয়া রাজ-আধারে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনাদিগের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত করিয়া রাজকীয় শক্তিকে সকলের উপর স্থাপন করে এবং আপনাদিগের সংহত-শক্তি-সম্ভূত ও সেই শক্তিদ্বারাই রক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রজাধর্ম্ম প্রতিপালন করে।

প্রজা আত্মপ্রয়োজনেই রাজার সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির সুব্যবস্থা করিবার জন্যই প্রকৃতিপুঞ্জ আপনাদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু যে স্বাধীনতাকে এইরূপে সঙ্কুচিত করিয়া সমাজের রক্ষণ ও শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়, সেই স্বাধীনতার সম্যক্ বিকাশের উপরেই আবার সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনুষ্যত্ব-বিকাশই সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য। বন্ধন নহে, কিন্তু মোক্ষই সামাজিক জীবনের লক্ষ্য। সংযম-ব্যতিরেকে মনুষ্যত্ব ও মোক্ষ কিছুই সিদ্ধ হয় না। আর স্বাধীনতার বিকাশ-ব্যতিরেকে সংযম-সাধনও সম্ভবপর নহে। এই জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতার বিকাশ ও প্রসার সম্পাদন সমাজধৰ্ম্ম ও রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। প্রকৃতিপুঞ্জের এই স্বাভাবিক স্বাধীনতা-বিকাশের ব্যবস্থা করিয়াই রাজশক্তি প্রজার আত্মরক্ষণ ও আত্মোন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে। প্রকৃতিপুঞ্জকে হীনবুদ্ধি ও নিরস্ত্র করিয়া যে অর্ব্বাচীন রাজশক্তি শুদ্ধ আপনার অভিমানস্ফীত বুদ্ধিবলে ও জন কত প্রহরী পাহারার সাহায্যে রাজ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাবর্গের জীবনবিত্তাদি সংরক্ষণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করিতে যায় পরিণামে সেই নির্ব্বীর্য্য নিশ্চেষ্ট ও নিরস্ত্র প্রকৃতিপুঞ্জকে কি বহিঃশত্রু কি অন্তর্বিদ্রোহ কিছুরই হস্ত হইতে সে রক্ষা করিতে পারে না। কারণ মানুষকে মানুষ রাখিয়া ও মানুষ করিয়াই সম্যক্‌রূপে নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও শাসিত করিতে পারা যায়, পশু বা জড় করিয়া নহে। কিন্তু এই মনুষ্যসংঙ্ঘ যখন নির্ব্বীর্য্য নিশ্চেষ্ট ও তামসিকভাবচ্ছন্ন হইয়া জড়তা-প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা পতনোন্মুখ তুষারশৈলের ন্যায় নিতান্ত দুর্ব্বার হইয়া উঠে ও আপনার বিরাট্ বপুর অসংযত সঞ্চালনে সুবিশাল ও বিপুল শক্তিশালী সাম্রাজ্য সকলকেও মুহূর্ত্ত-মধ্যে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

রাজা আপনার সুখভোগ বা স্বার্থ-অন্বেষণে নহে কিন্তু প্রজার কল্যাণ সাধনে রাজ্যের সমুদায় শক্তিকে নিয়োজিত করিবে, ইহাই সনাতন রাজধৰ্ম্ম। প্রজা আত্মপ্রয়োজনেই রাজার সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই প্রয়োজন-সাধনেই রাজশক্তির সার্থকতা সম্পাদিত হয়। প্রজার প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে রাজশক্তি প্রযুক্ত হইলেই রাজধর্ম্মের ভীষণ ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে এবং এই ব্যভিচার-নিবন্ধন ক্রমে প্রজাধৰ্ম্মও বিলোপ-প্রাপ্ত হয় ও সমাজ মধ্যে অত্যাচার অবিচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপ্লবাদি আনয়ন করিয়া থাকে। সেই বিপ্লবতরঙ্গাভিঘাতে রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন ও রাজসিংহাসন বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং প্রকৃতিপুঞ্জ পুনরায় আপনাদিগের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসনের জন্য অভিনব ব্যবস্থা করিয়া লয়।

মার্কিণে, ইংলণ্ডে, ফরাসীদেশে, ইতালীতে এবং কখনও কখনও ভারতবর্ষেও এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীনতা ও আত্মশাসনশক্তি প্রজাদ্রোহী রাজার হস্ত হইতে ছিন্ন করিয়া তাহাদেরই হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছে এবং তাহারা তখন স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত রাজা বা রাজপুরুষের হস্তে পুনরায় সেই রাজদণ্ড স্থাপন করিয়া তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষ যেমন আপনার সমুদায় জীবনীশক্তিকে বীজরূপেই পরিণত করিয়া কৃতার্থ হয়, সেইরূপ বিপুল প্রজাশক্তি হইতে প্রচ্ছন্নভাবে উৎপন্ন রাজশক্তিও পরিস্ফুট ও পরিপক্ক অকারে পুনরায় সেই প্রজামণ্ডলীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইরূপে রাজশক্তি সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতি-পুঞ্জে প্রত্যর্পিত হইলেই রাজধর্ম্ম পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

স্মৃতিরক্ষা

আজ কাল আমাদের দেশে বড়লোকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টায় সভা করা হইয়া থাকে। এই সকল সভা যে বার বার ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

যে দেশে কোনো একটা চেষ্টা ঠিক একটা বিশেষ জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া যায় আর অগ্রসর হইতে চায় না, সে দেশে সেই চেষ্টাকে অন্য কোনো একটা সহজ পথ দিয়া চালনা করাই, আমি সুযুক্তি বলিয়া মনে করি। যেখানে দরজা নাই কেবল দেয়াল আছে, সেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া লাভ কি?

আমাদের দেশে মানুষের মুর্ত্তিপূজা প্রচলিত নাই। এই পৌত্তলিকতা আমরা যুরোপ হইতে আমদানি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হইবার কোনও লক্ষণ দেখিতেছিনা।

ইজিপ্ট্‌ মৃতদেহকে অবিনশ্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপ মৃতদেহকে কবরে রাখিয়া যেন তাহা রহিল এই বলিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখে। যাহা থাকিবার নহে তাহার সম্বন্ধে মোহ একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলা আমাদের দেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা লক্ষ্য।

অথচ য়ুবোপে বার্ষিক শ্রাদ্ধ নাই, আমাদের দেশে তাহা আছে। দেহ নাই বলিয়া যে, যাঁহাকে শ্রদ্ধানিবেদন করিব তিনি নাই একথা আমরা স্বীকার করি না। মৃত্যুর পরে আমরা দেহকে সমস্ত ব্যবহার হইতে বর্জ্জন করিয়া অনশ্বর পুরুষকে মানিয়া থাকি।

আমাদের এই প্রকারের স্বভাব ও অভ্যাস হওয়াতে মানুষের মুর্ত্তিস্থাপনায় যথেষ্ট উৎসাহ অনুভব করি না। অথচ আমাদের দেশে মুর্ত্তিরক্ষার পরিবর্ত্তে কীর্ত্তিরক্ষা বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ মৃত্যুর পরে ইহলোকে মুর্ত্তিরূপে নহে কীর্ত্তিরূপে থাকে, এ কথা আমরা সকলেই বলি। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" কথার অর্থ এই যে, যাঁহার কীর্ত্তি আছে তাঁহাকে আর মূর্ত্তিরূপে বাঁচিতে হয় না।

কিন্তু কীর্ত্তি মহাপুরুষের নিজের, পূজাটা ত আমাদের হওয়া উচিত। কেবল পাইব, কিছু দিবনা সে ত হইতে পারে না।

তা ছাড়া মহাপুরুষকে স্মরণ করা কেবল যে কর্ত্তব্য, তাহা ত নয়, সেটা যে আমাদের লাভ। স্মরণ যদি না করি, তবে ত তাঁহাকে হারাইব। যত দীর্ঘকাল আমরা

মহাত্মাদিগকে পূজা করিব, ততই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

বড়লোককে স্মরণীয় করিবার একটা দেশি উপায় আমাদের এখানে প্রচলিত আছে, শিক্ষিতলোকে সেদিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমাদের দেশে জয়দেবের মুর্ত্তি নাই, কিন্তু জয়দেবের মেলা আচে।

যদি মুর্ত্তি থাকিত, তবে এতদিনে কোন্ জঙ্গলের মধ্যে অথবা কোন্ কালা-পাহাড়ের হাতে তাহার কি গতি হইত বলা যায় না। বড় জোর ভগ্নাবস্থায় ম্যুজিয়মে নীরবে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভয়ঙ্কর বিবাদ বাধাইয়া দিত।

মুর্ত্তি মাঠের মধ্যে বা পথের প্রান্তে খাড়া হইয়া থাকে, পথিকের কৌতূহল-উদ্রেক যদি হয় ত সে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখে, না হয় ত চলিয়া যায়। কলিকাতা সহরে যে মুর্ত্তিগুলা রহিয়াছে, সহরের অধিকাংশ লোকই তাহার ইতিহাসও জানে না, তাহার দিকে চাহিয়াও দেখে না।

একবার সভা ডাকিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের শিল্পীকে দিয়ে অনুরূপ হউক্ বা বিরূপ হউক্ একটা মুর্ত্তি কোনো জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া গেল। তার পরে ম্যুনিসিপালিটির জিম্মায় সেটা রহিল; ইহা মৃত মহাত্মাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে "থ্যাঙ্ক্‌স্" দিয়া বিদায় দেওয়ার মত ক্বায়দা।

তাঁহার নামে একটা লাইব্রেরি বা একটা বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেও কিছুদিন পরে নানাকারণে তাহা নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু মেলায় যে স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এক কাল হইতে অন্য কাল পর্য্যন্ত ধনী দরিদ্র, পণ্ডিতে মুর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না—ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।

দেশের শিক্ষিতসমাজ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি? রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশি উপায়ে খর্ব্ব না করিয়া ব্যর্থ না করিয়া কেবল নগরের কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে বদ্ধ না করিয়া দেশ-প্রচলিত সহজ উপায়ে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি?

সম্পাদক

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাৰ্জ্জী

আজকালকার পব্লিক্ উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত-সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

পব্লিক উদ্যোগ বলিতে যদি পোলিটিকাল আন্দোলনের মত কোনো একটা ব্যাপার বুঝায়, তবে আমাকে সংক্ষেপে উত্তর করিতে হয় যে, এমন উপায়ের চেষ্টায় না যাওয়াই ভাল। এমন কি, আমি আরো বেশি করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি যে, এ শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে যাহাতে প্রাকৃত লোকে জড়াইয়া না পড়ে, তাহার জন্যই বিশেষ চেষ্টা পাওয়া উচিত। যাহারা কিছুই জানে না কিসের জন্য কি করিতে হইবে, তাহাদের দ্বারা আন্দোলনের কিই বা সহায়তা হইতে পারে? আর যাহাদের গোড়াকার শিক্ষার জমিই প্রস্তুত হয় নাই, তাহারা যে এই সকল আন্দোলন হইতে কোনো শিক্ষা লাভ করিবে, এমনো আশা করা যায় না। ফলত পোলিটিকাল আন্দোলনে প্রাকৃত-সাধারণের যোগদানে তাহারাও মাটি হইবে, কাজটাও অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিবে।

প্রাকৃত লোকদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, তাহাদের প্রতিদিনের চলতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে সজাগ করিয়া তোলা। শিক্ষার মধ্যে প্রথমত লেখা ও পড়া এবং নিজ নিজ ব্যবসায়-সংক্রান্ত মূল কথা। তা ছাড়া— সঞ্চয়ের অভ্যাস, নেশা না করা, ঘরের লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার, লোক সমাজে ভদ্র আচরণ— এ সকল বিষয়েও কিছু কিছু সদুপদেশ দেওয়া চাই। ক্রিয়া-কর্ম্মে ধুমধামে টাকা ওড়ানো, পুকুরের জল নষ্ট করা, বাজে মামলায় মাতিয়া থাকা

যে পাপকর্ম্ম এটা তাহাদিগকে বোঝানো আবশ্যক।

যে কোনো প্রকার পল্লিক উদ্যোগের দ্বারা ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা কাজকর্ম্মের সহায়তা হইতে পারে, আমি তাহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। বস্তুত রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে বসার পূর্ব্বে প্রাকৃত-সাধারণ আপনাদিগকে সামলাইতে শিখুক। যাহারা নিজের হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম, তাহারা কি করিয়া অপরকে মতামত দিবার অধিকারী হইতে পারে? কিসে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, কিসে পল্লীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, নিজ নিজ ক্ষমতা ও সুযোগ সব চেয়ে কি করিয়া ভালমতে খাটানো যায়— এ সমস্ত ইহারা ভাল করিয়া জানে না। মুখে মুখে ও পুস্তকের দ্বারা এরূপ শিক্ষা উহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। প্রদর্শনী ও সুবুদ্ধিসঙ্গত আমোদ-অনুষ্ঠানের দ্বারাও কতক ফলের আশা করা যায়।

আর এক কথা এই যে, সমাজের ভদ্র ও প্রাকৃতগণকে এখনকার চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাছাকাছি আনা আবশ্যক। ইহাতে করিয়া প্রাকৃতদের ব্যবহারগত ও বুদ্ধিগত উন্নতি হইবে এবং যে ভদ্রলোকেরা দেশের মুখপাত্র বলিয়া গণ্য হইতে চান, তাঁহারা দেশকে চিনিতে শিখিবেন।

দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন স্বাস্থ্য। তাহার পরেই শিক্ষা— সর্ব্বপ্রকারের প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত শিক্ষা। সাধারণ কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট উপায় একটা সমবায় দল বাঁধিয়া তুলিতে সাহায্য করা— সেটা বাক-বিতণ্ডার জন্য নহে, মন্ত্রণা করিবার জন্য। গ্রামের স্বাস্থ্য বা সামাজিক অবস্থার প্রসঙ্গ, বদমাইসি নিবারণ ও শান্তি রক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা, জমিদার বা সরকারের নিকট অভিযোগ আবেদনাদি উপস্থিত করিবার সদুপায়-উদ্ভাবন— এই সমস্তই সেখানে পরামর্শের বিষয় হইতে পারিবে।

এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া দলপতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবচর্চ্চা হইতে থাকিবে ও সেই সঙ্গে তাহাদের ক্ষুদ্র পল্লিকটির, তাহাদের পল্লী বা পল্লীসমষ্টির হিতসাধনে ব্রতী থাকিবার শিক্ষালাভ হইবে। কিন্তু পরের সমালোচনা করাকে একটা প্রধান কাজের মধ্যে বিবেচনা করা সম্বন্ধে এরূপ দলকে কোনো প্রকারে প্রশ্রয় না দিয়া নিজের ত্রুটির অনুসন্ধান ও সংশোধনের অভ্যাস জন্মানো আবশ্যক।

নিজকে শোধরাইতে শিখিবার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষকে কর্ত্তব্য-উপদেশ দেওয়া কিছুতেই শোভা পায় না।

২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রশ্নটা যখন উঠিয়াছে, তখন একটু স্পষ্ট বাচ্যে তাহার উত্তর দেওয়া ভাল। যেন কাহারও বিরক্তিভাজন না হই।

প্রথম কথা এই যে, এ পর্য্যন্ত এসকল উদ্যোগ-আয়োজনের সহিত জন-সাধারণকে সংযুক্ত করার জন্য আমরা বিশেষ কিছুই চেষ্টা করি নাই। তাহার কারণ এই যে, আমরা এতদিন যে ভাবে আন্দোলন করিতেছিলাম (বিশেষতঃ রাজনীতিক্ষেত্রে), তাহার লক্ষ্যস্থল ছিল,— ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ। ইংলন্ডে আন্দোলন হয় আমরা ইংরাজি-শিক্ষিত, অতএব আমাদের শিক্ষিতত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য আমাদেরও আন্দোলন করা আবশ্যক। এইভাবে ভাবিত হইয়া যে আন্দোলন করা হইয়াছে, তাহা যে অস্বাভাবিক ও অকিঞ্চিৎকর হইবে ইহাতে বিস্ময় কি? দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ের কোন যোগ ছিল না। তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, ভাব ভঙ্গী, প্রণালী পদ্ধতি সমস্তই বিদেশী ধরণের। লোক-সাধারণের সহিত তাঁহাদের সংযোগ-সূত্র কোথায়? অতএব যদি দেশের লোককে আমাদের উদ্যোগে 'যক্ত করিতে হয়, তবে যাঁহারা রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের অধিনায়ক, তাঁহাদের নিজের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যাঁহারা মনে প্রাণে বিদেশী আছেন— দেশী হইতে হইবে। বক্তৃতা সখ হইতে আর তাঁহারা ইংরাজির ফোয়ারা উড়াইতে পারিবেন না। আপাদমস্তক বিলাতী পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া আর স্বদেশের হিতগান করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি ইংলন্ড হইতে অপসারিত করিয়া, ভারতবর্ষে নিবদ্ধ করিতে হইবে। এই দুরূহ ব্রত তাঁহারা উদ্যাপন করিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন, তবে আমাদের হয় তাঁহাদিগকে ছাড়িতে হইবে, না হয় জনসাধারণকে ছাড়িতে হইবে। দেশের লোক কাহাকে ছাড়িবেন, মনেস্থির করুন।

দ্বিতীয় কথা। আমাদের অনুসৃত আন্দোলন-প্রণালীর ভুল, পরিশোধন করিতে হইবে। এখন আমরা সুধু বক্তৃতা করি ও রেজোলিউসান পাশ করি। কর্ত্তৃপক্ষ তাহা পড়েন কিনা সন্দেহ। যদিই বা পড়েন, তাহার দ্বারা কৌতুক চরিতার্থ করা ভিন্ন অন্যরূপে মনোযোগী হন না। কেনই বা হইবেন? যাহাদের সমস্তই বক্তৃতা, তাহাদের কথায় কে কর্ণপাত করিবে? যাহারা জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহাদের কথার পশ্চাতে কার্য্যের শক্তি কোথায়? দিন কয়েক এভাবের বক্তৃতা ও রেজোলিউসন্ পাশ করা বন্ধ করিলে মন্দ হইবে না। অন্তত বায়ুস্তরের বিলোড়ন

কতক পরিমাণে শান্ত হইবে। অবশ্য এরূপ করিলে সংবাদপত্রে নাম জাহির হওয়ায় ব্যাঘাত হইবে এবং আরও ভয়ানক ক্ষতি— এত সাধের ব্যবস্থাপক সভার উচ্চাসনে সমাসীন হওয়ার ঐশ্বর্য সম্বরণ করিতে হইবে। এতটা আমরা পারিয়া উঠিব কি?

বক্তৃতা বন্ধ করিয়া, জনসাধারণের যাহার সহিত প্রাণের যোগ হইতে পারে, এরূপ অনুষ্ঠান করিলে কেমন হয়? বাঙ্গালা দেশের যেখানে মেলা হয়, সেইসব মেলাতে শিক্ষিতেরা যদি যোগ দেন, যেখানে মেলা নাই সেখানে যদি মেলার প্রবর্ত্তনা করেন; সেই সকল মেলাতে যদি সাধারণের প্রীতির জন্য যাত্রাগান প্রভৃতির বন্দোবস্ত রাখেন এবং রাজনৈতিক শিক্ষা ও উদ্দীপনায় পূর্ণ যাত্রার পালা গান কীর্ত্তন রচনা করেন এবং যদি একান্তই বক্তৃতা না করিলে অচল হয় তবে অল্প মাত্রায় বক্তৃতা কিন্তু অধিক মাত্রায় কথকতা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন; আর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্য কৃষি বিষয়ক প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করেন, তবে কেমন হয়? রবীন্দ্রবাবু 'স্বদেশীসমাজ' প্রবন্ধে এই ধরণের একটা কথা তুলিয়াছিলেন; পরে সীতারাম উৎসবের উদ্যোগকারিগণ এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নায়কবর্গ তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিয়াছেন কি? সীতারাম-উৎসবে তাঁহাদের কাহাকেও পাওয়া যায় নাই কেন? সুদূর মহম্মদপুরে (কলিকাতা হইতে প্রায় ১০ ঘণ্টার পথ) বনের মাঝে গিয়া দেশ হিতৈষিতা করিতে হইবে এরূপ ত তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রোগ্রামের মধ্যে নাই। তাঁহারা ইহাতে যাইবেন কিরূপে? টাউনহলে শিবাজি-উৎসব করুন, তাঁহারা যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। হায় রে দুর্ভাগ্য দেশ! কিন্তু যদি কাজ করিতে যাই, তবে এ তো সামান্য, ইহার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহিতে হইবে। যে প্রণালীতে আন্দোলনের ইঙ্গিত করিলাম তাহাতে সফলতা লাভ করিতে হইলে, অনেক সময় অনেক শক্তি ও অনেক অর্থব্যয় করিতে হইবে। সম্ভবত কর্ত্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে। দেশের লোকের শিক্ষার গুরুভার আপনাদের স্কন্ধে বহিতে হইবে। আমরা এসব পারিব কি? যদি না পারি তবে প্রাকৃত সাধারণকে পব্লিক্ উদ্‌যোগে সংযুক্ত করিবার দুরাশা যেন হৃদয়ে পোষণ না করি।

৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

আমাদের পব্লিক্ আন্দোলনটা কি? মন্ত্রীসভায় আরও দুই চারিজন দেশী লোকের জায়গা হইলে হয়; আমাদের দেশের আরও দুই চারিজন লোক গবর্মেন্টের চাকরি পাইলে দেশের উপকার হয়; ম্যুনিসিপালিটি কিংবা য়ুনিভার্সিটি যেরূপ আছে থাকুক, গবর্মেন্টের প্রতাপ সে সব জায়গায় বেশি প্রবল হওয়া উচিত নহে; পুলিশে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে দেশের লোক দুই এক জন ভর্ত্তি হইলে উত্তম হয় ইত্যাদি আবদারের কথা লইয়া আমরা ব্যস্ত। যাহাতে যথার্থ সাধারণের উপকার হয় যাহাতে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে শনি প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে কোনো গতিকে বিদায় করা যায় তাহার চেষ্টা আমরা কি করি? দেশে জলের অভাব, অন্নের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, শিক্ষার অভাব। সে অভাব ঘুচাইবার কি করা হইতেছে? দেশী মন্ত্রী খাড়া করিয়া কি উপকার তাহা লইয়া সাধারণের নিকট আন্দোলনের কি প্রয়োজন? উপকার যে কিছু আছে তাহা কি গবর্মেন্ট বোঝেন না? ইহার উত্তরে বলিতে পারেন যে জন সাধারণে এই উপকারটা চাহে না গবর্মেন্ট এমন কথা বলিয়া থাকেন, অতএব দেশের সাধারণ লোকেরা এই সমস্ত জিনিষ যে চাহে তাহা তো গবর্মেন্টকে বুঝাইতে হইবে। অতএব সাধারণকে ডাকিয়া সভা করিব, প্যাম্ফলেট ছাপাইয়া বিতরণ করিব, ক্রমে ক্রমে হাটে বাজারে বক্তৃতা করিব। আচ্ছা বেশ, করুন, কিন্তু গবর্মেন্ট তখনও বলিবেন, সাধারণকে যাহা বলিতে বলিবে তাহারা তাহাই বলিবে। পুতুল নাচান মাত্র। গবর্মেন্ট যদি বলেন Collector সাহেবকে দিয়া কাল আর একটা মীটিং করাইব, আজ তোমাদের সাধারণ সভায় যে রেজোল্যুশন হইয়াছে কাল আর একটা সাধারণ সভায় ঠিক বিপরীত রেজোল্যুশন পাস করাইব। তখন তাহার উত্তর কি দিবেন? আমাদিগের রাজা, মহারাজ, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি লোকেরা গবর্মেন্ট যাহা বলেন প্রায় তাহার বিপক্ষে কিছু বলিতে সাহস করেন না। শিক্ষা-শূন্য সাধারণের মীটিং করিয়া এমনি কি লাভ? মীটিং করুন, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের যাহা প্রয়োজন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আমাদের আজকালকার পব্লিক আন্দোলনের সহিত সাধারণের নিকট সম্বন্ধ অতি কম। সেই আন্দোলনের সহিত তাহাদিগের যোগ দিবার যে কোন প্রয়োজন আছে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। দেশের লোক বাঁচিয়া থাকিয়া যাহাতে মানুষ হয় তাহার জন্য যাহা কিছু করিবেন তাহাতে উপকার হইবে। বারোয়ারী পূজার মেলা, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি দিন দিন লোপ পাইতেছে কেন? "Mass meeting" অপেক্ষা এই সব উপায় সহজ-সাধ্য নহে কি?

৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

রাজনৈতিক কাজে জন সাধারণকে আমাদের সহকারী করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দিতে হইবে। পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা অনেক আছে, আরো হইবে এমন আশা পাওয়া যাইতেছে। এইরূপে সাধারণের মধ্যে পড়িতে পারে এমন লোক বাড়িয়া গেলে খবরের কাগজ এবং অন্য উপায়ে দেশের কাজে তাহাদিগকে টানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

কিন্তু সে দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ইতিমধ্যে শিক্ষিত লোকদিগকে কাজে লাগিতে হইবে। জীবনে যাঁহাদের উৎসাহের দিন চলিয়া গেছে এবং যাঁহারা সংসারের মধ্যে একবারে জড়াইয়া পড়িয়াছেন সেই সকল প্রবীণ এবং বিষয়ী লোকেরা যে এ সকল কাজে হাত দিবেন এমন আশা করা যায় না। সুতরাং সর্ব্ব সাধারণকে আমাদের সুখদুঃখের সাক্ষী করিয়া লইবার চেষ্টা কেবল দুই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই সম্ভবপর। এক যাঁরা সহজেই সংসারের কোনও ধার ধারেন না, নিজের টুকু লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত থাকেন না, পরের কাজে লোকের হিতে যাঁরা আপনাকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এমন লোক পাওয়া বড় শক্ত। কিন্তু যদি দেশের ভাগ্যক্রমে এমন লোক দুই চারিটি জুটিয়া যান তবে কাজ কত সহজ হয় তা বলাই বাহুল্য।

আর এক, যুবকদের মধ্যে এখনো যাঁরা কতকটা হাল্কা আছেন তাঁরা মনে করিলে অনেকটা কাজ করিতে পারেন। আমি বলি না যুবকেরা নিজের সব কাজ ছাড়িয়া পুঁথিপত্র একবারে বন্ধ করিয়া এই সকল কাজে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। কিন্তু তাঁহাদের যে অবকাশমাত্রই নাই তাহা নহে। সেই অবকাশের সময়ে যদি তাঁরা সাধারণকে শিখাইবার ভার লন তবে তাহাতে তাঁহাদেরও অনেক শিক্ষা হইবে। গ্রীষ্মের ছুটি এত লম্বা যে, সে সময়ে তাস পাশা গল্পগুজব বাদেও অবসর হাতে অনেক থাকে। অন্তত সে টুকু সময়ও যদি তাঁরা দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার সময়টাতে কৃষী মজুরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার ছলে তাহাদের জ্ঞানের সীমানা কতকটা বাড়াইয়া দিতে পারেন তবে ইহাতে নিজেরও আনন্দ আছে, অন্যেরও উপকার আছে এবং এই উপায়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সৌহার্দ্দ জন্মিয়া সমস্ত পার্থক্যের মধ্যেও একজাতি বাঁধিবার সুযোগ হইতে পারে।

শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপে দুটো একটা কথা বলিয়া লই। পাড়াগাঁয়ে সাধারণ লোকের পৃথিবীর ধারণাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। সুতরাং ভূগোল-শিক্ষার ছলে

তাহাদিগকে নানা বিষয় জানাইয়া দেওয়া যায়। ধর, কলিকাতার গল্প বলিবার উপলক্ষে জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, লাট সাহেবের বাড়ি, লাটসাহেব কে, এ দেশের রাজা প্রজার সম্বন্ধ কি, শাসনকার্য্য কি প্রণালীতে চালিত হয়, অন্যদেশেই বা কিরূপে চলে, অন্যান্য দেশে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ কত প্রকার আছে, এইরূপ নানা কথাই বলা যাইতে পারে। গল্পচ্ছলে রুশ-জাপানের যুদ্ধ, চীন, জাপান ও আমাদের মধ্যে সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহাদিগকে অনেক কথাই শেখানো যাইবে। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য চাষ বাস, দুঃখদৈন্য, ব্যাধি ও অত্যাচার, সামাজিক অবস্থা, তাহাদের প্রতি রাজার কর্ত্তব্য, স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, এই সকল কথা তাহাদিগকে বুঝাইতে বুঝাইতে ক্রমেই তাহাদের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। সঙ্গে যদি একটা ম্যাজিক লণ্ঠন থাকে ও তাহার সাহায্যে পৃথিবীর নানাস্থানের দৃশ্য ও প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য তাহাদের চোখের সামনে ধরিয়া দেওয়া যায় তবে তো কথাই নাই।

যদি আমাদের যুবকদের মধ্যে একদল এমন কাজে ব্রতী হইতে রাজি থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে চালাইবার জন্য কয়েকজন যোগ্য বিচক্ষণ দেশহিতৈষী লোকের প্রয়োজন। ইহারা নেতা হইয়া ইচ্ছুক ছাত্রগণকে লইয়া যদি জ্ঞান প্রচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ও সাধারণের দুঃখ কষ্ট অভাব অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখেন তবে সর্ব্ব সাধারণকে আমাদের সম্পদ বিপদের সাথী করিয়া লইতে পারেন। এমন কাজে বেতন দিয়া লোক রাখা চলে না। বিলাতে অনেক সুশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক গরীব পাড়ায় এইরূপ শিক্ষা ও পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে যে কেবল তাঁহাদের মনের ঔদার্য্য, চরিত্রের উন্নতি ও পুণ্যলাভ হয়, তাহা নহে, ইহাতে তাঁহারা অনেক জিনিষ শিখিতে পারেন।

৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শিক্ষিত সমাজের আন্দোলন অধিকাংশই রাজনীতি-ঘটিত। ইহার সহিত অশিক্ষিত জনসাধারণের সম্পর্ক ঘটান এখন সহজ বোধ হয় না। বিবিধ খবরের কাগজ আজকাল এই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিতেছে। কিন্তু যাহারা নিজে পড়িতে জানে না অপরের পড়া শুনে মাত্র, তাহাদের নিকট ছাপা কাগজের বাক্য দৈববাণী-স্বরূপ। তাহারা মুগ্ধ হইয়া শোনে,সব কথা বুঝিতে পারে না এবং নিজের যে কোন কর্ত্তব্য আছে সে কথা তাহাদের মনেই উঠে না। ফল কথা ভারতবর্ষ

বলিয়া একটা বৃহৎ দেশ আছে, তাহা আমাদের দেশ; সেই বৃহৎ দেশে যে যেখানে বাস করে, সে আমাদের জাতিভাই, তাহার সুখদুঃখে আমাদের বেদনা দেখান আবশ্যক, এই বৃহৎ দেশের ভাগ্যবিধান যে রাজার হাতে, তাহাকে কোনরূপে ধরা পাকড়া করা উচিত, এ জ্ঞানটাই জনসাধারণের মধ্যে এখনও জন্মায় নাই। শিক্ষিতের মধ্যেই যে জন্মিয়াছে, ইহা যোল আনা সত্য নহে। এই জ্ঞানটা যতদিন না হইতেছে, সঙ্কীর্ণতা, গ্রামিকতা ও সামাজিকতা ছাড়িয়া একটা বৃহৎ দেশের ও বৃহৎ জাতির সহিত সম্পর্ক-জ্ঞান যত দিন না জন্মিতেছে, ততদিন শিক্ষিতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অশিক্ষিতে যোগ দিবে না ও শিক্ষিতের ভাষাও অশিক্ষিতে বুঝিবে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঝিকারগাছায় এক বৃহৎ মেলা ডাকিয়া শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিতের যোগ-ঘটনার চেষ্টা হইয়াছিল। ঐরূপ মেলার সহিত নানারূপ তামাসা যোগ করিলে অনেক লোক জুটিতে পারে এবং উহা দ্বারা লোকশিক্ষার নানা কাজ হইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা চলিবে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমত বৃহৎ জনসভার মধ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা করিতে গেলে গবর্ণমেন্ট আতঙ্কিত হইবার সম্ভব; তাহা হইলে অচিরে উহার মূলোচ্ছেদের আশঙ্কা। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির তত্ত্ব জনসাধারণকে তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বুঝাইতে গেলে অনেক বড় কথাকে ছোট করিতে হইবে, ছোট কথাকে বড় করিতে হইবে, আসল কথাকে বিকৃত যা-নয়-তা বলিতে হইবে ও অমূলক অস্বাভাবিক আতঙ্কের সৃষ্টি করা হইবে। উহা রাজা প্রজা উভয়েরই পাপ; উহা মঙ্গলজনক নহে।

আমার বিবেচনায় এখন সাহিত্যের দিক দিয়া সমাজের উপরের ও নীচের স্তরে যোগের চেষ্টা আবশ্যক এবং অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া শিক্ষিতের মুখের বড় বড় কথা অশিক্ষিতের মধ্যে প্রচার করা আবশ্যক। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। আধুনিক সাহিত্য কেবল শিক্ষিতের জন্য, অশিক্ষিত উহার ভাষাও বুঝে না, উহার ভাবও হৃদয়গত করিতে পারে না। এমন সাহিত্য চাই, যাহা দ্বারা জাতীয় ভাব ও রাষ্ট্রীয় ভাব অশিক্ষিতের মধ্যে জন্মাইতে হইবে।

প্রাচীন সাহিত্য কেবল পৌরাণিক কথায়, রামকথায় ও কৃষ্ণকথায় আবদ্ধ ছিল। আধুনিক সাহিত্য রামকথা ও কৃষ্ণকথা বর্জ্জন করিয়াছে— কাজটা খুব ভাল হয় নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছে, তাহাতে শিক্ষিতের তৃপ্তি ঘটিতে পারে,

কিন্তু অশিক্ষিতের প্রবেশ-নিষেধ। অশিক্ষিতের উপর এখনও প্রাচীনপন্থী গায়ক ও কথক, যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, কীর্ত্তনিয়া ও ভিখারীর দলের একাধিপত্য—ছাপাখানার আধিপত্য তাহার নিকট কিছুই নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেন্দ্রের কথা ও পুরাণের কথা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথার সঙ্গে রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের কথা, কুরুপাণ্ডবের সঙ্গে মদোৎকট হর্ষবর্দ্ধনের কথা, রাজপুতের মারাঠার ও শিখের কথা, চীন জাপান ও ফরাসী জর্ম্মানির কথা এই সকল সেই প্রাচীনপন্থী নায়ক ও কথক, যাত্রাওয়ালা ও কীর্ত্তনিয়া প্রভৃতির সাহায্যে মৃদঙ্গ করতাল ও গোপীযন্ত্রের সহকারে জনসাধারণ মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে না কি?

এই একটা নূতন পথ আছে। এই পথে বঙ্গবাসী কৃষককে ক্রমশ বুঝান যাইতে পারে যে পঞ্জাবের, রাজপুতনার, মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে! পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপসিংহ, জয়চন্দ্র ও লক্ষ্মণসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত, কালিদাস ও দিঙ্নাগ কোন কালে কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, পল্লীগ্রামের গৃহস্থ কৃষক ও তাহাদের স্ত্রী পুত্র তাহার ফলভোগ করিতেছে। এইরূপে ক্রমশ বৃহৎ জাতীয় ভাব ও রাষ্ট্রীয় ভাবের ভিত্তি-পতন হইতে পারে।

কিন্তু এই সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে প্রতিভা চাই। ইংরেজি শিক্ষা ভিন্ন অন্যে ইহার সৃষ্টি করিতে পারিবে না, কিন্তু ইংরেজিনবীশকে এখনকার চলিত সাহিত্যের ভাষা ছাড়িয়া নূতন ভাষা গঁড়িতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শিক্ষিতের জন্য নূতন পথ সৃষ্টি করিতেছে। অশিক্ষিতের জন্য এই নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করিবে কে? এই সাহিত্য যেদিন জনসমাজে প্রচারিত হইবে ও জনসমাজ আগ্রহ করিয়া এই সাহিত্যের রস-আস্বাদনে ছুটিবে, সেইদিন তাহাদিগকে রাষ্ট্রনীতি বুঝান কঠিন হইবে না, তখন তাহারা নিজেই দল পাকাইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিবে।

প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখন পদ্মিনীর উপাখ্যানের আদর নাই কেন? পুরু-বিক্রম ও সরোজিনীর শ্রেণীর নাটক লিখিত বা অভিনীত হয় না কেন?

৬। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়

আবহমান কাল সর্ব্বত্রই জাতীয় শক্তি পর্ণকুটীরে বাস করে। এই পর্ণকুটীরবাসীদিগের শিক্ষা ও উন্নতির সহিত জাতীয় উত্থান ও পতন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। দেশের যাঁহারা উন্নতি-কামনা করেন, লোকশিক্ষার উপর তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য। যে যে জাতির ভিতরে শিক্ষার অধিকতর আদর জন্মিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সেই সব জাতিই প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক সময়ে অনেকানেক দেশে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য রাজশক্তি-কর্ত্তৃক নানাবিধ বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ও দু'একটি দেশে নিরক্ষর-মূর্খতা ও আইনানুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। লোকশিক্ষায় জার্ম্মেনী, আমেরিকা ও জাপান আজ পৃথিবীর ভিতরে সর্ব্বাগ্রগামী, তাইত এই তিন জাতির ইতিহাস সর্ব্বতোভাবে অন্যান্য দেশের অনুকরণীয়।

প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে জাপান আজ সকলেরই দৃষ্টান্তস্থল। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে নিরক্ষর মূর্খ লোক সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। গত ৩০ বৎসরের ভিতরে জাপানে লোক-শিক্ষার অলৌকিক বিস্তার হইয়াছে এবং এই শিক্ষা-বিস্তারের ফল, অদম্য স্বদেশানুরাগ, অদ্ভুত জাতীয়-শক্তি-সঞ্চার এবং অর্থাগমের শতধা চেষ্টা। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে "অসভ্য জাপান" এ দেশেও উপহাসের লিষয় ছিল; আজ, বলিতে গেলে, জাপান পৃথিবীর ভিতরে সর্ব্বোচ্চ জাতি।

যে সোপানে আরোহণ করিয়া জাপান আজ পৃথিবীর ভিতরে এত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, আমাদের আজ সেই সোপানের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণশাসন কাল হইতে লোকশিক্ষা সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এতদ্দেশীয় নানাবিধ শাস্ত্রে ও পুরাণে ব্রাহ্মণেতর জাতির ভিতরে বিদ্যাভ্যাস অসঙ্গত ও অবৈধ কার্য্য বলিয়া প্রকটিত হইয়াছে। ফলে জনসাধারণের মানসিক শক্তির হ্রাস ও জাতীয় শক্তির সম্যক্ বিকাশাভাব এবং দেশে কৃষি শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্য-বিস্তার, অর্থাগমের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন কিংবা রাজনৈতিক শক্তিসঞ্চারাদি বিষয়ে জনসাধারণের চরম ঔদাসীন্য। বহুশতবর্ষাদৃত এই ঔদাসীন্য ভঙ্গ করাই এখন আমাদের প্রধান ও কঠোর ব্রত বলিয়া মনে করিতে হইবে। অর্থাভাব ও দুর্ভিক্ষের নিদারুণ প্রপীড়নে দেশের লোক হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; স্বদেশীয় কৃষি শিল্প বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে; দেশের ধন পরদেশবাসী জাতি সমুদয়

কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে এবং এই ঔদাসীন্য-বশত আমাদের রাজনৈতিক প্রার্থনাগুলিও রাজপুরুষ দিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর চুপ করিয়া বসিয়া সময় গনিলে চলিবে না।

জাপানের দৃষ্টান্তে এখন আমাদিগকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। আমাদিগের লোকশিক্ষা চাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শনে" স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালায় ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোনও কার্য্য হয় না তাহার কারণ এই যে বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই।" এই অভাব-পূরণ করিতে আজ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের আপামর সাধারণের ভিতর শিক্ষা-বিস্তার চাই। যাত্রা, গান ও কথকতা দ্বারা যে শিক্ষা হয় হউক, কিন্তু সে শিক্ষায় সুধু চলিবে না। দেশের স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই বিদ্যাভ্যাস করাইতে হইবে, স্বদেশীয় ভাষার অক্ষর শিখাইতে হইবে, লিখিতে শিখাইতে হইবে, পড়িতে শিখাইতে হইবে। এই সকলের একমাত্র উপায় গ্রামে গ্রামে স্কুল-স্থাপন ও সহজ-সুখপাঠ্য সাহিত্যের সম্যক বিস্তার এবং শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে সহানুভূতি ও সমবেদনা।

বিদ্যাভ্যাসের কোন সুগম সরল পন্থা নাই— লিখিতে ও পড়িতে না শিখিয়া বিদ্যাভ্যাস অসম্ভব ব্যাপার। মুখে শুনিয়া যে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন হয়, তাহাকে উপহাস করা সঙ্গত নয় বটে, কিন্তু সে বিদ্যা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় চরিত্র-সংশোধন ও রাষ্ট্রীয় শক্তি-সঞ্চারের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

গভর্ণমেন্ট আজকাল অনেক পাড়াগাঁয়ে স্কুল পাঠশালা খুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু যেখানে গভর্মেন্ট স্কুল খুলিবেন না সেখানে আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গদেশে গ্রামে গ্রামে স্ত্রী পুরুষের জন্য স্কুল খুলিতে হইবে; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানালোচনা অধিকতর প্রয়োজনীয় এ কথা সদাসর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; এবং গ্রামে গ্রামে আপামর সাধারণের ভিতর সহজ, সুখপাঠ্য পুস্তকাদির বহুল প্রচার করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত বিখ্যাত দেশ ও জাতি আছে তাহাদের উন্নতি ও অবনতির সহজ ইতিহাস তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। এ দেশের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় তাহাদিগকে সম্যক উপলব্ধি করাইতে হইবে। আরও তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে কারণ ছাড়া কোন কার্য্য হয় না, 'অসম্ভব' ও 'হইতে পারে না' এরূপ কথা শুধু আলস্য ও মানসিক জড়তার পরিচায়ক, প্রেতবিশ্বাস ও অলৌকিক ঘটনায় আস্থাস্থাপন জাতীয় উন্নতির অন্তরায় মাত্র এবং কুসংস্কার-বর্জ্জিত শিক্ষা-ব্যতিরেকে

প্রকৃতজ্ঞানের ও জাতীয় শক্তি বিস্তারের আশা আকাশকুসুম মাত্র। সর্ব্বোপরি বুঝিতে হইবে ও বুঝাইতে হইবে যে সৃষ্টি বৈচিত্র্যে আমাদের সকলেরই আবশ্যকতা ও স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য নিৰ্দ্ধারিত আছে, সেই সকল কর্ত্তব্য বুঝিয়া আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই প্রকার জ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সম্যক বিকাশ হইলেই আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। বিদ্যাভ্যাস ও সাহিত্যসেবাই ইহার উপায় এবং এই উপায়কে সহজ করিতে গেলেই আমাদের কামনা ব্যর্থ হইবে। পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে জ্ঞানালোচনার কোন সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই ও হইবার কোন সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হইতেছে না।

৭। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল

ইংরাজিতে যাহাকে Public Movements বলে, এই প্রশ্নে স্বদেশী আন্দোলন কথাটা বোধ হয় তাহারই প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ আন্দোলনে দেশের আপামর সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?

যোগরক্ষার কথা ভাবিতে গেলে যোগ আছে ধরিয়া নিতে হয়। আমরা শিক্ষিত দশজনে মিলিয়া যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছি, আমাদের দেশের আপামর সাধারণের তাহার সঙ্গে কোনও প্রকারের যোগ স্থাপিত হইয়াছে কি? গাছে না চড়িতেই এক কাঁদির ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলে চলিবে না। আগে যোগ-স্থাপন কর, তারপর যোগরক্ষার উপায় আপনি উদ্ভাবিত হইবে।

এদেশে এখনও পব্‌লিক্ জীবটাই জন্মায় নাই। যে দেশে রাজা বিদেশী, রাজ্যশাসন প্রণালী প্রজাতন্ত্র নহে, প্রজা যেখানে কন্‌ষ্টেবল, ডিপুটি, জজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনদণ্ডে মাত্র রাজশক্তির সম্মুখীন হয়, এবং রাজদ্বারের বহির্ভাগে আপন আপন ব্যক্তিগত বা জাতি ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও সম্বন্ধেই আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের জীবনযাপন করে, সেখানে পব্‌লিক্ বলিতে বা নেশন বলিতে যে বৃহৎ জীবন বোঝায় তাহার এখনও উৎপত্তি হয় নাই। ইংরাজি-শিক্ষা যাঁহারা পাইয়াছেন .ও ইংরাজি-অনভিজ্ঞ হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সাহায্যে যাঁহারা আধুনিক ভাব, চিন্তা ও আদর্শের সন্ধান কিছু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা পব্‌লিক কিয়ৎ পরিমাণে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও সম্বন্ধের উপরে একটা জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয়তার বা

ন্যাশন্যালিটির বৃহত্তর সম্বন্ধ স্বল্পবিস্তর অনুভব করিতেছেন। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি পব্‌লিক্ ব্যাপারের সূচনাও হইয়াছে। আপামর সাধারণের সঙ্গে এখন ইহার কোনও যোগ নাই।

পব্‌লিক্ বস্তুটা আমাদের দেশে নূতন। নেশন-ভাবটাও আধুনিক। আমরা যে সূত্রে ইহাকে পাইয়াছি, সেই সূত্র ধরিয়া দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এই ভাব, এই আদর্শ ও এই আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমরা দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়া এই বস্তু লাভ করিয়াছি। সাধারণ জনগণের পক্ষে সেরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অজ্ঞাত বস্তুর অন্বেষণ করা সম্ভব নহে। বিবর্ত্তনের প্রণালীও এরূপ নহে। যে বস্তু ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে বহুযুগ ধরিয়া তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, একবার কোথাও ফুটিয়া উঠিলে, তাহাকে অতি অল্পকাল-মধ্যেই পুনরুৎপাদন করা যায়। কিন্তু কালসংক্ষেপ হইলেও, বিবর্ত্তনের মূল-প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটে না।

আমাদের মধ্যে এই পব্‌লিক্ বস্তুটা ও এই নেশন-ভাব ও ন্যাশন্যালিটির আদর্শ কিরূপে জন্মিয়াছে? ইংরাজি ও য়ুরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস হইতেই আমরা ইহা লাভ করিয়াছি। পশ্চিম দেশে এই পব্‌লিক্ ও এই নেশান বস্তুটা স্বাভাবিক উপায়ে দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সহায়ে জন্মিয়াছে। আমরা কিন্তু সে বস্তুকে অপেক্ষাকৃত পূর্ণাবয়বেই দেখিয়াছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; লুব্ধভাবে তাহার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং সেই বস্তুকে আপনাদিগের মধ্যে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি।

ইংরাজের, মার্কিনীয়ের, ফরাসীসের, ইতালীয়ের স্বদেশপ্রেমের কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের প্রাণে একপ্রকারের স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। এই স্বদেশপ্রেম পশ্চিমে নেশনবৃক্ষের ফল। আমরা বৃক্ষ উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই ফল লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছি।

ইহাতে যে আমাদের বিশেষ অপরাধ হইয়াছে তাহাও নহে। বৃক্ষ হইতে যেমন ফলের উৎপত্তি হয়, ফল হইতেও সেইরূপ সর্ব্বদাই বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তবে ফলকে সিকেয় টাঙ্গাইয়া রাখিলে হয় না, মৃত্তিকাগর্ভে পুতিয়া রাখিতে হয়।

আমরা নেশনবৃক্ষের ফল বিদেশ হইতে পাইয়াছি। এখন তাহাকে মাটির নীচে পুতিতে হইবে। আমাদের পব্‌লিক্ আন্দোলনকে সজীব ও সতেজ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।

পশ্চিমে আগে নেশন জন্মিয়াছে ও তার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে নেশন-হিতৈষা বা স্বজাতিপ্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারা উভয়ে পরস্পরের বিকাশের সাহায্য করিয়াছে।

আমাদিগকে নেশন-হিতৈষা আগে জাগাইতে হইবে। এজন্য লোকশিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষা প্রাইমারী বা সেকেন্ডারী বা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিতর দিয়াই একদিন আমরা পাইয়াছিলাম, এখন সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণকে এ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

প্রথমত স্বদেশ বস্তুটা কি, বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বদেশ একটা ভূখণ্ড-মাত্র নহে। শরীরটা যেমন একটা রক্তমাংসের পিণ্ড নহে, কিন্তু ইহার মধ্যে বিদেহী আত্মা বাস করিয়া, ইহার শক্তি-সৌন্দর্য্য-সম্পাদন ও অনন্যসাধারণ মহামূল্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছে, সেইরূপ স্বদেশ কেবল ভূখণ্ড নহে, ইহার মধ্যে পুরুষপরম্পরায় আমরা বাস করিয়া আসিয়াছি, ইহা পিতৃপুরুষদিগের পদরজে পবিত্রীকৃত হইয়া আমাদের পূজার্হ হইয়াছে। লোকের ভীটে যেমন মাটি হইয়াও পবিত্রপুণ্যতীর্থ, সেইরূপ জন্মভূমি সামান্য ভূখণ্ড হইয়াও স্বর্গাদপি গরীয়সী। পিতৃপুরুষদিগের বাসভূমি ও কর্ম্মভূমি ভগবানের অপূর্ব্ব লীলাভূমি, স্বজাতীয় সভ্যতা ও সাধনার উদ্ভবক্ষেত্ররূপে পূজিত হইবে।

এই শিক্ষা দিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জাতীয় সাহিত্য, ও জাতীয় সাধনা সকলেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কেবল ইহাতেও চলিবে না। স্বজাতিহিতৈষাকে ধর্ম্মরূপে পরিণত করিয়া, তাহার উপযোগী (Symbol) বিগ্রহ, ব্রত, অনুষ্ঠানাদির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা এক উপায়। কিন্তু ইহাতে ভাবাঙ্গ মাত্রই সাধিত হইবে, বস্তুলাভ এখনও হইবে না। এইজন্য, এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কর্ম্মের সূচনা করিতে হইবে, সে কর্ম্ম তিলে তিলে এই পব্‌লিক্‌কে গড়িয়া তুলিবে।

গ্রামে গ্রামে এইজন্য যথাসম্ভব একটা স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা আমাদিগের না করিলে চলে না, অথচ যাহা কেহ একাকী করিতেও পারে না। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা এরূপ একটি প্রধান বিষয়। এইজন্য আমরা গ্রামের দশজনের শক্তিকে সমবেত করিয়া পথ-ঘাট পরিষ্কার পয়ঃপ্রণালী-খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে কেন না নিযুক্ত করিব? দশজনে মিলিয়া যেমন বারোয়ারী করে, সেইরূপ এই সকল কাজের জন্য একটা বারোয়ারীর ব্যবস্থা

করিতে হইবে। আপনাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য লোকে যাহাতে আপনাদের মধ্যে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে। এইরূপে গ্রামে গ্রামে নেশনের বীজ বপন করিলে ক্রমে তাহা হইতে বিরাট নেশন-বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

এই কাজ করিতে গেলে শিক্ষিত লোকদিগকে ক্রমে এখন সহর ছাড়িয়া গ্রামের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া পড়িতেছেন বলিয়াই আমাদের পব্‌লিক্ আন্দোলনগুলোও নিতান্ত সহুরে হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের লোকে এ সকলের কিছুই জানে না, যদি কিছু কখনও শুনিতে পায়, তাহা আদৌ বোঝে না।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের ভদ্র সাধারণের সঙ্গে আপামর সাধারণের একটা যোগ ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে গিয়া দাঁড়াইতেছেন, তাঁহাদের গ্রামের শত শত লোক সেখানে গিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইত। তাঁহাদের মানে গ্রামের লোক, দেশের লোক আপনাদিগকে সম্মানিত, তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করিত। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতে না।

আজ আমাদের দেশমান্য নেতৃবর্গের মধ্যে এমন একজনও নাই, যাঁহার পশ্চাতে প্রয়োজন হইলে দশজন সাধারণ লোকও কোমর বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইবে। যে দিন এই হইবে, সেদিন বুঝিব দেশে নেশন গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, পব্‌লিক্ বস্তুটা জন্মাইতেছে।

বর্ত্তমান অসন্তোষের কারণগুলি সম্বন্ধে চিন্তা

জানুয়ারি মাসের ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রে ফ্রেড্‌রিক্‌ হ্যারিস্‌ন্‌ সাহেব "বর্ত্তমান অসন্তোষের কারণগুলি সম্বন্ধে চিন্তা" নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তাহার সকল কথা আমাদের দেশের পাঠকদের পক্ষে বিশেষ মনোযোগের বিষয় নহে। তাহার মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

সম্প্রতি লর্ড ল্যান্সডৌন্‌ এবং ইংলন্ডের রাজার চেষ্টায় ফ্রান্সের সহিত ইংলন্ডের যে একটা সখ্যস্থাপন হইয়া গেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন এখনকার কালের প্রধান লক্ষণ এই দেখিতেছি, দেশের সমস্ত ব্যাপারে কোনো না কোনো রকমের ব্যক্তিগত প্রভাব যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে— তা' রাজার হউক বা প্রেসিডেন্টের হউক বা চান্সেলরের হউক বা আর কাহারো হউক। উদ্যম, সত্বরতা এবং উপযুক্ত অভিজ্ঞতার সহিত কোনো একটা জটিল ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়া তোলা পার্লামেন্ট, সেনেট, এমন কি, মন্ত্রীসভার (Cabinet) পক্ষেও অসাধ্য হওয়াতেই এই অবস্থা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। পার্লামেন্ট যখন দেশের কার্য্যনির্ব্বাহিকরূপে ছিল সে দিন এখন আর নাই। রুষিয়ার বণিক রণতরীর দল যেমন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহারও অবস্থা সেইরূপ। দেশপতি রাজা বা একজন প্রধানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে পুরাতন ফেশানের হুয়িগ এবং র‍্যাডিক্যালের দল সেকেলে বাঁধিবুলির যোগে যতই চীৎকার করুন না, তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

উপরে ফ্রেড্‌রিক্‌ হ্যারিসনের মত উদ্ধৃত করা গেল। কিন্তু আমাদের দেশের কাহারো কাহারো ধারণা দেখি যে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যাপারে বিশেষ একজন লোককে অধিপতিরূপে স্বীকার করাটা এতই সেকেলে যে তাহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। এদিকে দেখিতেছি, হ্যারিসন তাহার উল্টা কথাটাই সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। আমাদের বোধহয় মানুষঘটিত ব্যাপারমাত্রই অবস্থাভেদে এতই বিচিত্র যে কোনো পুঁথিগত সংস্কারের দ্বারা কোনো কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কখনো বা একাধিপত্যেরও প্রয়োজন হয় কখনো বা দশজনের নায়কতারও দরকার হইতে পারে।

এই প্রবন্ধে হ্যারিস্‌ন্‌ সাহেব আর দুই একটা কথার যা উল্লেখ করিয়াছেন,

আজকালকার দিনে সেও আমাদের পক্ষে ভাবিবার বিষয়। যাহাদের চক্রান্তে বোয়ারযুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে লেখক বলেন— তোমরা বলিয়া থাক যে, তোমরা সোনার খনি চাও নাই। মিথ্যা কথা— সোনার খনি ছাড়া তোমরা আর কিছুই চাও নাই। তোমরা বল যে তোমরা সেখানে স্বাধীনশাসন ও সমাধিকার স্থাপন করিয়াছ। মিথ্যা কথা। পোলাণ্ডে ও ফিন্‌লাণ্ডে রুশিয়ার সম্রাট যেরূপ শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তোমরাও তাই করিয়াছ। তোমরা আফ্রিকায় বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলে? মিথ্যা কথা। তোমরা সেখানকার প্রধান অবলম্বন কৃষি ছারখার করিয়াছ, খুলিয়াছ কেবল সোনার খনি। একমাত্র বাণিজ্যের আনুকূল্য করিয়াছ, সে কেবল দাসবাণিজ্য। তোমরা কথা দিয়াছিলে যে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষেরা যে রসিদ দিয়াছিল তাহা ভাঙাইয়া টাকা পাওয়া যাইবে— এ কথা রক্ষা হয় নাই এবং কোনোকালে হইবেও না। তোমরা সত্য দিয়াছিলে যে উচিত মতে খেসারৎ দিবে— তোমাদের সেরেস্তার দপ্তরে যাই বলুক না কেন যাদের ক্ষতি করা হইয়াছিল আজ তাহারা না খাইয়া মরিতেছে।

আর একটী জায়গা উদ্ধৃত করি। বিলাতে আজকাল মাশুল-সংস্কার ব্যাপার লইয়া চেম্বার্লেনেব দল কিরূপ দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে তাহা সকলেই জানে— তাহাবই প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন— এই ব্যাপারের পশ্চাতে অনেকগুলি কারখানার মহাজনদের চক্রের (Rings) সংস্রব আছে। এই সব লোকের টাকা আছে, উদ্যম আছে ব্যবসায়-জ্ঞান আছে এবং কৃত্রিম উপায়ে লোক নাচাইবার প্রতিভা (Genius for wire-pulling) আছে। এই রকমের গুটিকয়েক লোক যাহাদের পশ্চাতে টাকা আছে কিন্তু অন্তরে ধর্ম্মজ্ঞান নাই ইহারা খবরের কাগজ হস্তগত করে, নির্ব্বোধ উপাধিধারীদের ভোজ দেয়, সভাস্থলে লোক ভাড়া করিয়া আনে এবং নিজের দলের প্রতি সাধারণের সপক্ষতার একটা ভড়ং বানাইয়া তোলে।

বিলাতে পব্লিক্ ব্যাপারে মিথ্যাচার কি বস্তুতই এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, না ইহা ফ্রেড্‌রিক্ হ্যারিসনের অত্যুক্তি? কিন্তু হর্বার্ট্ স্পেন্সরের Facts and Comments নামক গ্রন্থে হ্যারিস্‌ন্ সাহেবের এই সকল কথার অনেক সমর্থন পাওয়া যায়। পব্লিকধর্ম্ম ইংরেজি সভ্যতার ভিত্তি সেখানে যদি তলে তলে মিথ্যা প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে একদিন সঙ্কটের সময়ে যে কি দৃশ্য দেখা যাইবে বলা যায় না।

[**শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**]

মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস

পুরাতন সেরেস্তার দলিল খুঁটিয়া ঘটনা বাহির করাই যে ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ একথা রাইক্ সাহেব স্বীকার করেন না। কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা আসিল, কোন্ শালে কি লড়াই হইল, কবে কোথায় বাণিজ্যের পত্তন হইল, এসকল বিবরণ কীটের মুখ হইতে উদ্ধার করাই যে ইতিহাস তাহা নহে।

আসল কথা মানুষের ইতিহাসে মানুষের মনটা সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। সমস্ত ঘটনার পিছনে পর্দ্দার আড়ালে মানুষের মন কি কাণ্ডটা করিতেছে ইহাই ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া যে ইতিহাস লেখা যাইতে পারে রাইক্ সাহেব তাহাকেই Psychological History অর্থাৎ মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস নাম দিয়াছেন।

লেখক বলিতেছেন ফরাসী-ইতিহাসে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের ফরাসী-ইতিহাসে স্ত্রীলোকের প্রভাবটা খুব দেখা যায়। অথচ ফরাসী-মধ্যযুগের বড় বড় যে সকল ইতিহাস লেখা হইয়াছে তাহাতে এই মেয়েদের কথা ভাল করিয়া পাওয়া যায় না। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজের পলিটিক্স, ব্যবসায় এবং ধর্ম্মে ওলন্দাজের প্রভাব খুব গুরুতর হইয়াছিল। সেই প্রভাব হইতেই ইংরাজী প্যুরিটানিকতার জন্ম। এই প্যুরিটানিকতাই বহুকাল ইংরেজী ইতিহাসের কাণ্ডারী ছিল। অথচ এই প্রভাবটার কথা ইংলণ্ডের ইতিহাসে তেমন করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সেরেস্তার নথি জিনিষটা যে খুব বিশ্বাস-যোগ্য তাহা নহে, এই সকল নথীতে অনেক সময় আসল কথাটা গোপন করিয়াছে। রাইক্ সাহেব তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

তারপর ইতিহাসে কেন যে কি ঘটনা ঘটিল, তাহার সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই ফাঁকি মাত্র। প্রাচীন গ্রীক রোমান সভ্যতা এক একটি সহরকে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে ইতিহাসবিৎ বলেন সভ্যতার উন্নতিবশত হইয়াছিল। এ কথার কি কোন মানে আছে? কেন যে গ্রীক সহর-রাজ্যগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে হইল, কেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে হইল না, কেন যে নিজ গ্রীসে তাহার আরম্ভ না হইয়া এশিয়া মাইনরে তাহার আরম্ভ হইল,

কেন যে য়ুরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন সভ্যতার একটি বিশেষ হাওয়া বহিয়াছিল, তখন সহর-রাজ্যের সৃষ্টি হইল না, কেন যে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার উন্নতিকালে সহর-রাজ্য দেখা দেয় নাই, সেটার তো কৈফিয়ৎ চাই।

সকলেই জানেন আধুনিক য়ুরোপের সব চেয়ে বড় বড় তিনটি উদ্যম— রেনেসাঁস, ধর্ম্মসংস্কার এবং পোলিটিকাল ও সামাজিক বিপ্লব। এই তিনটের রহস্য আজও যথার্থভাবে ভেদ করা হয় নাই।

ইতিহাসের এই যে দারিদ্র্য, ইহার কারণটা অত্যন্ত সোজা। নির্ব্বিচারে কতকগুলা বৃত্তান্ত মাত্র লইয়া ইতিহাস গড়া যায় না। বৃত্তান্ত তো চাকব, তাহার প্রভু আইডিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিমূলক কল্পনা।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ভান্ডার ।। জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

পূর্ব্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি

বৈশাখের ভাণ্ডারে যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল অর্থাৎ আমাদের দেশের পব্লিক্ উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃতসাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি— দেশের নানা বিশিষ্ট লোকের কাছ হইতে তাহার উত্তর পাওয়া গেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের আধুনিক উদ্‌যোগগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবু মোটের উপর তাঁহাদের উত্তরগুলির মধ্যে কোনো অনৈক্য নাই।

তাঁহারা সকলেই এই কথা বলেন যে, প্রাকৃতসাধারণকে আমাদের পব্লিক্ উদ্‌যোগে আহ্বান করা এখন চলে না। আগে তাহাদের শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করা চাই।

তাহার কারণ ইহারা বলিতেছেন, দেশ বলিতে কি বুঝায় তাহা দেশের সাধারণ লোকে বুঝে না এবং দেশের হিত যে কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাও ইহাদের বুদ্ধিতে আসিবে না। অতএব, ইস্কুল করিয়া এবং অন্য পাঁচরকম উপায়ে ইহাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দেওয়া চাই।

কথাটা একটা বড় কথা। প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের স্থিরতা হওয়া চাই, তার পরে কাজে লাগিতে হইবে।

ভাণ্ডারের পরীক্ষায় এটা দাঁড়াইতেছে যে, মতের মিল হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতের মিল হওয়া সহজ, উপায় সম্বন্ধে মিল হওয়াই কঠিন।

তবু কাজ আরম্ভ করিতে হইলে কাজের কথা পাড়িতেই হইবে, কোথায় কি বিঘ্ন আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া না দেখিলে চলিবে না।

আমরা দেখিতেছি, গবর্মেন্ট আমাদের দেশের প্রাকৃতসাধারণের শিক্ষার একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। ইহাও দেখিতেছি, সেই সঙ্গে তাঁহারা ভারি একটা দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, দেশের লোক রোগে এবং দুর্ভিক্ষে একেবারে অবাধে মারা পড়িতেছে। ইহাতে তাঁহাদের শাসনকার্য্যের একটা ভারি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজার অন্নবস্ত্র এবং প্রাণটা বাঁচানো কেবল যে প্রজার হিত তাহা নহে, তাহা রাজারও স্বার্থ।

কর্ত্তারা মনে করিতেছেন, চাষারা যদি আর একটু ভাল করিয়া চাষ করিতে শেখে এবং স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া চলিবার উপদেশ পায়, যদি সাধারণ হিসাবপত্রটা লিখিয়া জমিদার ও মহাজনের অন্যায় প্রবঞ্চনার হাত এড়াইতে পারে, তবে তাহাতে দেশের যতটুকু শ্রীরক্ষা হইবে, তাহাতে প্রজার লাভ এবং রাজারও লাভ। অতএব গোড়ায় তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

কিন্তু শিক্ষা জিনিষটাকে একদিকে একবার সুরু করিয়া দিলে তার পরে তাহাকে গণ্ডি টানিয়া কমানো শক্ত। বিদেশী রাজার পক্ষে সেটা একটা বিষম ভাবনা। প্রজা বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকে, এটা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বাঁচার চেয়েও যদি বেশি অগ্রসর হইয়া পড়ে, তবে সেটা তাঁহার প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

এইজন্য প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্ত্তৃপক্ষের নানারকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, খাল কাটিয়া বেনো জল ঢোকানো কাজটা ভাল নয়— শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।

অতএব চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে, পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তা ছাড়া তাহাদের ভাষাশিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার।

অতএব প্রথমেই দেখিতেছি, আমরা চাষাদের শিক্ষালাভ হইতে দেশের যে সুবিধাটা আশা করিতেছি, কর্ত্তৃপক্ষ স্বভাবতই সেটাকে আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

আমাদের দেশহিতৈষীরা যদি মনে করেন, সরকারের কর্ত্তব্য দেশের সাধারণ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আমাদের কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে রেজোল্যুশন পাস করা, তবে এ কথাটা আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, সরকারের হাতে শিক্ষার ভার দিলে সে শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই চেষ্টা করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য দেখিবেন না। তাঁহারা চাষাকে গ্রামের চাষা রাখিবার জন্যই ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে ভারতবর্ষের অধিবাসী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

শিক্ষা যদি নিজের হাতে লই, তবেই নিজের মৎলবমত শিক্ষা দিতে পারিব— ভিক্ষাও করিব, ফরমায়েসও দিব, এ কখনো হয় না। ইংরাজিতে একটা চল্‌তি কথা আছে, দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।

আমাদের নিজের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিজেরা করিব এ কথা তুলিলেই আপত্তি এই উঠে যে, আমাদের পাঠশালার শিক্ষায় অন্নের সংস্থান কেমন করিয়া হইবে? সরকার যদি এমন কথা বলেন, সরকারী বিধানের ছাঁচে বিদ্যালয় না বানাইলে সেখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে আমরা উমেদারীর বেলা আমল দিব না, তবে আমরা কি উপায় করিব?

এই প্রশ্নের সদুত্তর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রশ্নের বিষয়টাকে পরিষ্কার করিয়া সম্মুখে ধরা যাক।

প্রথম কথা— দেশের কাজে দেশকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিতে হইলে গোড়ায় সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা— শিক্ষার যদি একটা প্রধান উদ্দেশ্য এই হয় যে, দেশের লোককে দেশের কাজে যোগ্য করা, তবে স্বভাবতই শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হইবে না।

তৃতীয় কথা— যদি তাহা না হয় তবে পরের বাঁধী-চালে কতকগুলা বিদ্যালয় বানাইয়া বিদেশের শাসনে স্বদেশের সরস্বতীকে জিঞ্জির পরাইলে বিশেষ ফললাভ প্রত্যাশা করা চলিবে না। শিক্ষাপ্রণালীকে সকল প্রকারেই স্বদেশের মঙ্গলসাধনের উপযোগী করিবার জন্য দেশের বিদ্যালয়কে সরকারের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার।

শেষ কথা— তাহার বাধা এই যে, অন্নের দায়ে বিদ্যা সরকারের দ্বারে বাধা পড়িয়াছে। সে বন্ধন না কাটিলে বিদ্যাকে স্বাধীন করিব কি উপায়ে?

সত্য কথা বলিতে গেলে, বাধা যে শুধু এইমাত্র, তাহা নহে। দেশের যেকোনো একটা মঙ্গলসাধনের ভার নিজের হাতে লইতে গেলে, যে পরিমাণে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, আমরা যে ততদূর প্রস্তুত আছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদিবা প্রস্তুত হই, তবে গোড়াতেই যে বিঘ্নটা আছে, সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার। এসম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন ও চিন্তা করা উচিত বোধ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ইহার বিচার প্রার্থনা করি। আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, দেশকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের হিতৈষিগণ "ভাণ্ডারে" তাহারই আলোচনা উপস্থিত করুন।

সম্পাদক

আমাদের ভলান্‌টিয়ারদল

প্রতি বৎসরই কন্‌গ্রেস-উপলক্ষে একটি করিয়া ভলান্‌টিয়ারদল গঠিত হয়। যে সহরে কন্‌গ্রেস বসে, সেখানকার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা কন্‌গ্রেসের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হন, তাঁহাদিগকে লইয়াই এই ভলান্‌টিয়ারদল গঠিত হইয়া থাকে। এই সকল ভদ্রসন্তানেরা কিরূপ নিরভিমানী হইয়া, সামান্য চাকরের মত, বিদেশী প্রতিনিধিগণের সেবা করেন, ইহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি, ও দেখিয়া সর্ব্বদাই মুগ্ধ হইয়াছি। এই সকল উৎসাহী, কর্ম্মঠ. স্বার্থাভিমানত্যাগী, মাতৃসেবারত যুবকগণের প্রতি যখন চাহিয়াছি, তখনই এই অধঃপতিত দেশের ভবিষ্যৎ যে নিতান্ত নিরাশার বিষয় নহে, ইহা অন্তরে অন্তবে অনুভব করিয়াছি। এইজন্য এই সকল ভলান্‌টিয়ারদলকে স্থায়িভাবে রক্ষা করিতে পারা যায় কি না, এ প্রশ্ন প্রায়ই মনে জাগিয়াছে।

এবারকার মৈমনসিং প্রাদেশিক সমিতি আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন শক্তি সঞ্চাব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বৈদেশিক ভাব, ভাষা ও চাটুবাক্যের মোহিনীশক্তি হইতে আমাদের শিক্ষিতসমাজ যে অল্পে অল্পে মুক্তিলাভ করিতেছেন, মৈমনসিং তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোনও প্রাদেশিক সমিতিতে এতগুলি বাংলা বক্তৃতা হয় নাই। সমিতির কার্য্য এবারে বাংলাতেই হইয়াছে বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। সভাপতি মহাশয়ের প্রথম বক্তৃতাটী ইংরাজিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও সমিতির অধিবেশন সাঙ্গ করিবার সময় বাংলাতেই আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এবং ভূপেন্দ্রবাবুর সেই বাংলা বক্তৃতা এমন সরল, এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে, তিনি কেন যে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা বাংলাভাষায় করেন নাই, ইহা ভাবিয়া লোকে বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিল। এতো গেল ভাষার কথা। তার পর ইতিপূর্ব্বে দেশের জনসাধারণে কখনও আমাদের এই সকল সভাসমিতিতে যোগদান করে নাই। এবারে প্রায় নয় হাজার লোকের মধ্যে অন্ততঃ ছয় হাজারই পল্লিবাসী কৃষি ব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ সভার আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বক্তৃতায় ভাষার চাতুর্য্য না থাকিলেও ভাবের গভীরতা ও জ্ঞানের পরিপক্কতার প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু মৈমনসিং প্রাদেশিক সমিতির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি— মৈমনসিংএর

ভলান্‌টিয়ারদল। চারিশত শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া মৈমনসিংএ ভলান্‌টিয়ারদলভুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের উৎসাহ, ইঁহাদের বিনয়, ইঁহাদের সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক নিরাশপ্রাণেও আশার সঞ্চার হইয়াছে।

কিন্তু এ উৎসাহ, এ তেজ, এ নিরভিমান, ও এ স্বদেশপ্রেম ইহাদের প্রাণে কদিনই বা থাকিবে? বিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরা এ প্রশ্ন যে তোলেন নাই তাহাও নহে।

প্রথম যৌবনে আমাদেরওতো এইরূপ উৎসাহ-উদ্যমই ছিল। মাতৃসেবার জন্য কত লোকেই না তখন জীবন উৎসর্গ করিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এখন কোথায়? বিষয়ের আবর্ত্তে, সংসারের ভোগবিলাসে, স্বার্থের শতজঞ্জালে জড়িত হইয়া, আজ তাহারা যৌবনের সে পুণ্যস্মৃতিকে অজ্ঞানতার কুহক বলিয়াই ভাবিতেছে! আজিকালিকার এই সকল উৎসাহী যুবক যে সেরূপ করিবেন না, তাহার আশা কোথায়?

ইঁহাদের এ উৎসাহ-উদ্যম থাকিবে কি না, তাহা আমাদেরই উপরে নির্ভর করিতেছে। আমাদের যৌবনের আশা ও আকাঙক্ষা এ সংসারে আশ্রয় না পাইয়াই মরিয়াছে। প্রাণের নিরাকারভাব যতক্ষণ কার্য্যে, সংস্কারে, অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে সাকারভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ না করে, ততক্ষণ তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। আমাদের সময়ে, পঁচিশবৎসরপূর্ব্বে, এ দেশে স্বদেশহিতৈষার কোনও বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা Institution এর সৃষ্টি হয় নাই। আশ্রয়হীন লতা যেমন ভূতলে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবে আমাদের যৌবনের স্বদেশপ্রেমও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল যুবককে তাঁহাদের এ নবীন উৎসাহের উপযুক্ত আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবেই এ উৎসাহ বয়োবৃদ্ধিসহকারে ক্ষীণ না হইয়া আরো বাড়িয়াই উঠিবে।

কন্‌গ্রেস বা কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে যে সকল ভলান্‌টিয়ারদল গঠিত হয়, কোনও উপায়ে তাহাদিগকে একটা স্থায়িত্ব দিতে পারিলে, আমার মনে হয়, তদ্‌দ্বারা আমরা অনেক কাজ পাইতে পারিব।

কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্সের সেবায় যে প্রেমের প্রথমসংস্কার হয়, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া, তবে তাহাকে পাকাইয়া তুলিতে হইবে। এই সকল ক্ষুদ্রকার্য্যের অভাব নাই। উপযুক্ত নেতা ও উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবেই এই সকল ক্ষুদ্রকার্য্য আমরা করিয়া উঠিতে পারি না। ভলান্‌টিয়ারদল যদি স্থায়ী হন, তবে তাঁহারা সহজেই এ কার্য্য করিতে পারিবেন।

কন্‌গ্রেস বা কন্‌ফারেন্সের সময়ে যাঁহারা, লোকে যাহাকে হীনকার্য্য বলে, তাহা করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন না, কন্‌গ্রেস ভাঙ্গিয়া গেলে কেন হইবেন, ইহার কোনও কারণ নাই। যদি ভলান্টিয়ার দল ভাঙ্গিয়া না দেওয়া হয়, তবে তাঁহাদের দ্বারা সহরের অনেক সৎকার্য্য সহজে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

সুধু সহরের কেন, সহরতলীর অনেক পল্লীগ্রামেরও অনেক উপকার তাঁহাদের দ্বারা স্বচ্ছন্দে সাধিত হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ— অগ্নিভয়নিবারণ। কোনও পল্লীতে আগুন লাগিলে, ইঁহাদের দ্বারা সেই আগুন নিবারণের সুন্দর বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। এ জন্য ইঁহাদের কাওয়াজ শিখিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার ভিন্ন ভিন্ন দলের উপরে অর্পণ করিতে হইবে। একদল জল বহন করিবেন, তাঁদের প্রত্যেকের চিহ্নিত বালতী বা কলসী থাকিবে; এই সকল বালতী বা কলসী দলের আফিসে মজুত থাকিবে। আগুন লাগিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া দলপতি যখনই শঙ্খ বাজাইবেন, অমনি যে যেখানে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সেই আফিসের দিকে ছুটিবেন এবং আপন আপন বালতী বা কলসী হাতে করিয়া দলপতির পশ্চাতে সারি দিয়া গিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া আগুন নিভাইতে যাইবেন। এইরূপে কোনও দল দড়ি, সিঁড়ি, মৈ প্রভৃতি লইয়া ছুটিবেন, কেহ কেহ বা আপনাদের দলপতির অধীনে গৃহস্থের তৈজষাদি রক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। আগুন সর্ব্বদা লাগিবে না। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুত সর্ব্বদাই থাকিতে হইবে এবং প্রস্তুত হইবার জন্য নিয়মমত কাওয়াজাদি অভ্যাস করিতে হইবে, ও মধ্যে মধ্যে অকারণে সংঙ্কেতধ্বনি করিয়া সকলকে সমবেত করিয়া, তাঁহাদের অভ্যাসটা বজায় রাখিতে হইবে; এবং এইরূপে এই নিয়মাধীনতা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংযমাদি চরিত্রের উচ্চতর গুণসকলও ফুটিয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়তঃ— পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা। সময় সময় সর্ব্বত্রই চোরের প্রাদুর্ভাব হয়। সরকারি পুলিশ প্রায়ই এ সকল আপদ দূর করিতে পারে না। ভলান্‌টিয়ারদলকে স্থায়ী করিয়া ইহারও একটা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রহরে প্রহরে এক এক দল আপন আপন দলপতির অধীনে সহর ঘুরিয়া আসিবেন। ইহাতে যে কেবল সাধারণের উপকার হইবে তাহা নহে, সেবকদলেরও মহাকল্যাণ হইবে। নির্ভীকতা, শ্রমসহিষ্ণুতা, কার্য্যকুশলতা, মন্ত্রগুপ্তি প্রভৃতি গুণ ইঁহাদের মধ্যে এই উপায়ে নিশ্চয়ই স্বল্পবিস্তর ফুটিয়া উঠিবে।

তৃতীয়তঃ— আহতের শুশ্রূষা ও রোগীর সেবা। এই ভলান্‌টিয়ারগণ হইতে একটি Ambulance Corps ও একটি Nursing-Bandও সহজেই গঠন করা যায়। বরিশালের ছাত্রগণ কিয়ৎ পরিমাণে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সহরের একজন উপযুক্ত ডাক্তারকে এই দুই দলের কর্ত্তা করিয়া দিতে হইবে; এবং First Aid সম্বন্ধে Ambulance Corpsকে ও সাধারণ শুশ্রূষাতত্ত্ব সম্বন্ধে Nursing-Bandকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। এই উপায়ে ইঁহারা এমন এক শিক্ষা লাভ করিবেন, যাহাতে ভবিষ্যতে সংসারে প্রবেশ করিয়াও অনেক বিষয়ে আপনারা উপকৃত হইতে পারিবেন এবং পরকেও সাহায্য করিতে পারিবেন।

চতুর্থতঃ— সহরের বা পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা। একদল ভলান্‌টিয়ারকে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যেও নিযুক্ত করা যায়। অবসরকালে ইঁহারা সহরের বা সহরতলীর পল্লী সকলের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। একদিন বা কোনও স্থানের জঙ্গল কাটিয়া পথঘাট পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিলেন, আর একবার কোনও পানাপুকুরের পানা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। কখনও বা কোথাও একটা বাঁশের পোল তৈয়ার করিলেন। এ সকল কাজ করিতে যাইয়া এমন একটা কর্ম্মক্ষমতা জন্মিয়া যাইবে, যাহাতে ভবিষ্যতেও অনেক উপকার হইতে পারে। আর ভদ্রসন্তানেরা এ সকল কাজ করিতেছেন দেখিয়া শ্রমজীবীদের প্রাণে এমন এক উৎসাহ ও গৌরব জন্মিবে, যাহাতে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে।

পঞ্চমতঃ— এই সকল ভলান্‌টিয়ারকে দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যেও নিযুক্ত করিতে পারা যায়। একদল সহরে Night-School এর কাজে কিছু কিছু সময় দিবেন। আর একদল ছুটী উপলক্ষে পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া সন্তানধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

এই সকল উপায়ে ভলান্‌টিয়ারদলকে স্থায়ী করিয়া বিবিধকার্য্যে লাগাইতে পারিলে, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। মৈমনসিংএর বন্ধুদিগের নিকটে এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম। পুনরায় আজ সর্ব্বাদৌ তাঁহাদের নিকটেই ইহা উপস্থিত করিলাম।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

গবর্মেন্ট-শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল বিলাতি ছবি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেছে এবং সেখানে দেশীয় চিত্রশিল্পাদি শিখাইবার আয়োজন হইতেছে— ইহাতে আমাদের লাভ হইবে, কি ক্ষতি হইবে?

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা সহরে কলেজ স্কোয়ারে আমাদেব জন্য ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেমন একটা অন্নসত্র বসানো হইয়াছে, তেমনি ইংরেজ পাড়ায় চৌরঙ্গীর ময়দানে সরকারী শিল্পবিদ্যালয় নাম দিয়া একটা কারখানা আমাদেরই জন্য খোলা আছে.

জ্ঞানশিক্ষায় আমরা তো একরকম নাম করিতে পারিয়াছি এবং কাজও পাইতেছি, কিন্তু এতকাল বামধনুর রং ফলাইতে শিখিয়া, বিলাতিধরণে তুলি টানিয়া, তেলেজলে-কালিতে-কয়লাতে দুইটা হাতকে পরিপক্ক করিয়া শিল্পে তেমন ফল পাইলাম কই?

সেজন্য দোষ দিব কাহাকে? যে অজস্র অর্থব্যয়ে য়ুরোপ দেশ-বিদেশ হইতে শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করিয়া শিক্ষার্থীর মানসভূমির উপরে সৌন্দর্য্যের সুধাবর্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাকে সরস রাখিতেছে, উর্ব্বরা করিতেছে, এবং সেখানে কলাকল্পলতার শাখায় শাখায় পারিজাত ফুটাইবার সুযোগ করিয়া দিতেছে, আমাদের সে অর্থ কোথায়? যে সকল রত্নের হাটে সমস্ত য়ুরোপের কুবেরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত, সেখানে আমাদের কর্ত্তা কানাকড়িটি দিয়া কি কিনিবেন?

তাই তাঁহারা সস্তাদরে দুঃখী ভারতবাসীকে অনুগ্রহ করিয়া শিল্পবিদ্যা দিতে অগ্রসর হইলেন। আমরাও ভুলিলাম— সাহেবের রক্তমুখপদ্ম দেখিয়া ভুলিলাম। দুঃখিনী ভারতমাতার গৃহে কলালক্ষ্মীর প্রসাদ সুলভ হইলেও আমরা বিলাতি রুটির লোভে পরের দ্বারে হাত পাতিলাম। সাহেব-দোকানদার আমাদের গাঁঠ হইতে কাঙালের

কড়িটি খুলিয়া লইয়া আধখানি টুকরামাত্র দিল। যখন বাকি আধখানির আশায় তাহাদের মুখের দিকে তাকাইলাম, তাহারা কহিল— যে কড়ি দিয়াছ তাহার উপযুক্ত জিনিষ পাইয়াছ, এখন আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে যাও।

তবু রুটির লোভ—পয়সার মায়া ছাড়িতে পারিলাম না। সাহেবের দ্বারে বসিয়া—আজ-নয়-কাল পাইবার আশায়—সেই আধখানি রুটি চিবাইতে লাগিলাম। তাহাতে আমাদের জাতও গেল, পেটও ভরিল না, শুষ্কতালু আরো শুকাইয়া উঠিল, মাঝে হইতে আমাদের ভারতমাতার গৃহে কলালক্ষ্মীর প্রসাদ পাইবার অধিকারটুকুও হারাইলাম।

আজ বিলাতের সেই কলাবিদ্যা— যাঁহার দ্বারে এই পঞ্চাশবছর আমরা মজুরি করিয়া মরিলাম— নিজের প্রবাসবাসের সস্তাদরের আসবাবপত্র নিলামে চড়াইতে হুকুম দিয়া টিকিট কিনিয়া জাহাজে চড়িলেন— এদেশের জলবায়ুতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। কলিকাতা আর্টস্কুলের বিলাতি ছবিগুলা সম্প্রতি বিক্রি করা হইয়াছে। আমাদের এত সাধের শিল্পশালায় নিলামের ঘণ্টা বাজিল— বিলাতি ছবি, গিল্টীর ফ্রেম কিনিতে ধনবান ক্রেতার ভিড় জমিল— আমরা মাথায় হাত দিয়া এই বলিয়া কাঁদিতেছি যে, "ঘরের লোক হইলে সে কি আজ আমাদিগকে এমন করিয়া পথে বসাইয়া পালাইতে পারিত?"

এখন অভিমান করিব কাহার উপর? দোষ দিব কাহাকে? হায়, যাহারা নন্দনের পারিজাত মর্ত্ত্যে ফুটাইতে চায, তাহারা কি ভুলই করে! পারিজাত তো ফোটেই না, বরং এখানকার ধূলায়-কাদায় মন্দারবৃক্ষ পাল্‌তে-মাদারে পরিণত হয়। স্বর্গের অমৃত শোষণ করিয়া মন্দারবীজ অঙ্কুরিত হয়, যে আলোকে যে সু-বাতাসে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া তাহা পারিজাতকুসুম প্রসব করে, আমাদের এখানে সে বীজ আনিলেও সে অমৃত পাইব কোথায়?

সত্যভামার মত আমরা একদিন আবদার ধরিয়াছিলাম, আমাদের খৃষ্টীয়বন্ধু স্বর্গ হইতে আমাদের জন্য পারিজাতও আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে ত আমাদের এখানে রহিল না। আমাদের মনে দারুণ মৃগতৃষ্ণিকা জাগাইয়া সেটা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

যাহা ধরা দিবার নয়, তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় কাজ কি? এখন আমাদিগকে এই বুঝিতে হইবে যে, দেবলোকের গাছকে মাটিতে পুতিয়া মাটি করিবার চেষ্টা না করিয়া, মর্ত্ত্যলোকের মানস-সরোবরে স্বর্ণ-শতদল বিকশিত করিবার যত্নে শতগুণ সার্থকতা আছে; আমাদের ভারতের ভারতী যখন তাহার উপরে প্রসন্নপদক্ষেপ

করিবেন, তখনই মানাইবে ভাল। পারিজাত ফুলে আমাদের কাজ কি— আমাদের বিল্বদল-তুলসীমঞ্জরীও ত দেবতার পূজায় দেওয়া চলে।

আমরা আর ক্ষোভ করিব না। নিজের হাতে শিল্পপঞ্চবটী রচনা করিয়া তাহার ছায়ায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইব এবং অবশেষে সিদ্ধিলাভ করিয়া আমাদের শুষ্কপ্রায় মানসহ্রদে মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করিয়া কলালক্ষ্মীর পূজার পদ্ম ফুটাইয়া তুলিব; তখন ভিক্ষান্নের জন্য আমাদিগকে কাহারো মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না—দেবীর অমৃত প্রসাদ লাভ করিয়া আমরা দেবতার ন্যায় অমর হইব।

২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়

আশা হয়, অতঃপর আমাদের দেশীয় চিত্রশিল্পের আদর বাড়িবে। এ বিষয়ে আমাদের পথভ্রম হইয়াছিল, এতদিনে যেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

চড়াইপাখী খঞ্জনের মতন করিয়া চলিতে গিয়াছিল, তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই; লাভের মধ্যে সে নিজের স্বাভাবিক চলনটি ভুলিয়া এখন লাফাইয়া চলে। আমাদেরও বিদেশীয় বিদ্যাশিক্ষা ঘটিয়া উঠিল না, এখন নিজের যাহা ছিল তাহাও হারাইবার উপক্রম।

তবে কি ফিরিব? আর গত্যন্তর কি? আমাদের যে উভয়কূল যায়! তথাপি ফিরিবার পূর্ব্বে একটিবার দাঁড়াইতে ইচ্ছা করে। এ সময়ে অনেক কথা মনে হইতেছে; তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখা ভাল। ভুল করাটা আমাদের পক্ষে নূতন ব্যাপার নহে; এটি আমাদের অভ্যস্ত বিদ্যা। ভুল আমরা অনেকবারই করিয়াছি; অনেকবার ভুল বুঝিতে পারিয়াছি; আবার তাহাকে শোধরাইতে গিয়া, নূতন রকমের উৎকটতর ভ্রমে পতিত হইয়াছি। ফিরিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং একান্তই উৎসুক। কিন্তু ফিরিবার পথটি আমার নিকট কিঞ্চিৎ ঝাপ্‌সা ঠেকিতেছে; ভয় হয়, পাছে আবার ভুল করি।

প্রথম কথা, কেন ফিরিতেছি? যাহার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা পাই নাই, এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু শুধু তাই বলিয়াই কি ফিরিতেছি? তাহা নহে। ঘরের জিনিষটি ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহার জন্যই ফেরা; নতুবা, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা যে আমাদের একেবারেই পাইবার নহে, অথবা পাইলে আমাদের মঙ্গলের বিষয় হইত না, এ কথায় কিছুতেই মন সায় দিতেছে না। দুধের লোভে ভাত ফেলিয়া

দেওয়া নির্ব্বোধের কাজ বটে, কিন্তু দুধ পাইলে ভাত খাওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা। দেশীয় বস্তুটিকে পরিত্যাগ করাই আমাদের অন্যায় হইয়াছিল, নচেৎ তাহাকে বজায় রাখিয়া ইউরোপীয় চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা হইলে, আমাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতির কোন কারণ ছিল না। দেশীয় চিত্রশিল্পেব সৌন্দর্য্য আছে, তেমনি অনেকানেক ত্রুটিও আছে; এই সকল ত্রুটির সংশোধনের জন্য ইউবোপীয় শিল্পকলার জ্ঞান আবশ্যক।

তাব পর কথা এই যে, যে ক্ষেত্রে দুধেরই প্রয়োজন, তাহাতে ভাতের ব্যবস্থা চলে না। দেশীয পদ্ধতিতে সৌন্দর্য্যের অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যানুসারিতার অভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। যেখানে কোন বস্তু অথবা ব্যাপারের অবিকল আলেখ্যের প্রয়োজন, সেখানে ইউরোপীয় পদ্ধতিই অবলম্বনীয়। শিক্ষা এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক অসংখ্য সচিত্র পুস্তকগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, একমাত্র এই একটি কারণেই দেশীয় শিল্পের অপেক্ষাও ইউরোপীয় শিল্প আমাদের কতদূর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, একমাত্র দেশীয শিল্পের দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্য স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারে কি না? যদি বলেন যে, তোমবা না বুঝিয়া অকারণ বিদেশী শিল্পকলার পক্ষপাতী হইতেছ, তাহাতেও এ প্রশ্নের সদুত্তর হইবে না। কারণ ইউরোপীয় চিত্রশিল্প বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠতর। আর এ কথাও সত্য নহে যে, আমাদের স্বভাব এবং আমাদের দেশেব জলবায়ুর মধ্যে এমন কিছু আছে যে, উচ্চঅঙ্গের ইউরোপীয় চিত্রকলার রসগ্রহণ অথবা তাহার চর্চ্চা আমাদের পক্ষে অশোভন বা অকল্যাণকর হইতে পাবে। বরং ইহাই ত মনে হয় যে, কবিতার ন্যায় ইহারও একটা সার্ব্বভৌমিকত্ব আছে, এবং উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় চিত্রকলার উপযুক্তরূপ চর্চ্চা এ দেশে হইলে আমাদের অনেক উপকার হইত।

আমরা দেশীয় শিল্পকলাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত ভুল করিয়াছিলাম; তাহার সংশোধন হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের কারুবিদ্যাগুলি আমাদের অমূল্য সম্পত্তি। সেগুলিকে হারাইয়া আমরা আর যাহাই লাভ করি না কেন, আমাদের দারিদ্র্যের অবধি থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ইউরোপীয় শিল্পকে একেবারে পরিত্যাগ করা এখন আর ইচ্ছা থাকিলেও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং সেটিও আমাদের অবশ্য শিক্ষণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য একজনেরই উভয় বিদ্যা শিখিতে হইবে, এমন কথা হইতেছে না। কিন্তু দেশের জন্য দুয়েরই প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ?

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন হওয়া উচিত, ইহাতে আর সন্দেহ কি? পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি যতই উঁচুতে থাকেন, সমাজের ততই লাভ। শত মুর্খের অপেক্ষা এক পণ্ডিতপুত্র, বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা করুক, ইহাই চাণক্য-পণ্ডিতের সহিত আমরাও প্রার্থনা করি। এ বিষয়ে আবার বিবাদ কি?

যেখানে বিবাদ, সেখানে অন্যপক্ষ নিরুত্তর। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জননীই কেবল পণ্ডিত প্রসব করেন না, এ বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছামত কাজ হয় না; জননী প্রসববিষয়ে ঠিক কর্ত্তা নহেন, অনেকটা অধিকরণস্থানীয়।

একশটা সন্তানের মধ্যে নব্বইটা গণ্ডমুর্খ, নয়টা না পণ্ডিত না মুর্খ, ও একটা পণ্ডিত জন্মে। বিশ্ববিদ্যালয় দুরূহ শিক্ষা ও কঠিন পরীক্ষায় পণ্ডিতকে বাছিয়া সর্ব্বজনমান্য করুন; মুর্খগুলা প্রাইমারি স্কুলে কাগজে-কলমে চাষ শিখুক, কিন্তু মধ্যশ্রেণীর উপায় কি হইবে? তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিত্যক্ত ও কৃষিবিদ্যায় অনধিকারী। তাহাদের জন্য কি কেবল B class ও C class এর ব্যবস্থা ও চরমস্থান কেরাণির ডেস্ক? অন্যদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে এই মধ্যশ্রেণীর জন্য বহুবিদ্যার আলয় আছে। এদেশে এই পঙ্গপালের আশ্রয়স্থান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ পাইয়া তাহারা তবু ভদ্রসমাজে স্থান পাইত! বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে তাহারা যায় কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে উপাধি না দেন, একটা জীবনধারণের অনুমতি বা লাইসেন্স আপাততঃ দিতে এত আপত্তি কেন?

তার পর আর একটা কথা— শিক্ষার আদর্শ দুরূহ হওয়া উচিত, পরীক্ষাও কঠিন হওয়া উচিত, কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতিটা সঙ্গে সঙ্গে তোলাবার চেষ্টা উচিত নয় কি? আগে ভাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিয়া কোন পরীক্ষা কঠিন করিলে কি ফল হইবে? কিন্তু শিক্ষাদানের উন্নতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায় না কেন?

জর্ম্মানিতে, আমেরিকায়, জাপানে যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এখানে সে ব্যবস্থা করিবে কে? গবর্ণমেন্ট কিছু বলেন না, দেশের লোকেও কিছু বলে না, পরস্পর মুখ চাহিয়া আছে মাত্র।

উচ্চশিক্ষা যত উচ্চ হয়, ততই ভাল। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য উচ্চশিক্ষকের প্রয়োজন, সে শিক্ষক কোথায়?

একালের উচ্চশিক্ষার সরঞ্জামে খরচ চাই— এখন ধান দিয়া লেখাপড়া হইবে না— দুলাখ-দশলাখের কাজ নয়, এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুকোটি-দশকোটি আবশ্যক। মার্কিনের দেশে, জর্ম্মানিতে ও জাপানে সেইরূপ ব্যবস্থা। আগে সেইরূপ ব্যবস্থা কর, তার পর সেই সকল দেশের সঙ্গে এক তুলাদণ্ডে শিক্ষার তুলনা করিও।

নূতন আইনে ত বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে' নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয়ের কি করেন, দেখিতে চাই!

দেশের বড়লোকেব কাছে হাত পাতিয়া বিশেষ ফল হইবে না। একালের বিদ্যাদান তাহাতে হয় না। অন্যদেশে গবর্ণমেন্ট উচ্চশিক্ষায় কি খরচ করেন, সেটা একবার দেখা আবশ্যক।

বাগানে ভাল ভাল গাছ থাকিলেই বাগানের শোভা, কিন্তু মালী যদি কেবল আগাছা উপড়াইবার জন্যই ব্যস্ত থাকে, তাহাতে ভাল গাছ তো-জন্মায় না, আগাছা উপড়াইয়াও অত পাওয়া যায় না। ভাল গাছের চারা পুতিয়া উচিতমত সার-গোবরের বন্দোবস্ত আবশ্যক।

একটা কথা মনে রাখা উচিত। সকল বিষয়েরই দেশকালপাত্র বিবেচনা আছে। ঐ বিবেচনাদির নাম কাণ্ডজ্ঞান।

কাণ্ডজ্ঞানটা বর্জ্জন করা ঠিক নহে। যিনি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যালেণ্ডারের পাতায় লম্বাচৌড়া Syllabus ছাপাইয়া দেশ উদ্ধার করিতে চাহেন, তিনি নিতান্তই "উৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি।"

২। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

কোন্ শিক্ষাপ্রণালী ও পরীক্ষার কথা আলোচনা করা হইতেছে, প্রশ্নটিতে তাহা সূক্ষ্ম করিয়া বলা হয় নাই; তবে বুঝা যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও পরীক্ষা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, তাহাই বিচারের বিষয়। যাহারা পরীক্ষা আরও কঠিন করিতে চান, তাঁহারা স্বীকার করেন যে, ইহাতে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাঘাত হইবে; কিন্তু তাঁহারা বলেন, শিক্ষার আদর্শ উচ্চতর করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কমিয়া যায় যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই।* তদুত্তরে আমরা বলি, শিক্ষাবিস্তার অত্যাবশ্যক, যত অধিক লোকের শিক্ষালাভের সুযোগ হয় ততই ভাল, আদর্শ বড় করিতে গিয়া অত্যাবশ্যক বস্তুকে দুষ্প্রাপ্য করিলে দেশের সর্ব্বনাশ। কিন্তু ইহাতে [ইহাও] স্বীকার করি, যাঁহারা সুবিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে চান, তাঁহাদের জন্য কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত; সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া কাহারও গায়ে পাণ্ডিত্যের ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছিলেন Let not the University pinchbeck and call it gold ঝুটা জিনিষকে সাচ্চা বলিয়া বিক্রয় করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু তিনিই আবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দুরূহতর করিবার বিরোধী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষাগুলি আর একটু কঠিন করিলে ক্ষতি নাই, বোধ হয় কোন কোন বিষয়ে কঠিনতর পরীক্ষা আবশ্যক; কিন্তু নিম্নতর পরীক্ষাগুলি কঠিনতর করিলে প্রভূত অনিষ্ট ঘটিবে। "এম এ" বা "বি এ" "অনার" পরীক্ষা কঠিন হওয়া উচিত কিন্তু বি.এ. পাস্ ও নীচের দুইটি পরীক্ষা দুরূহতর করা কখন উচিত নয়। যাঁহারা বিদ্যামন্দিরে উচ্চাসনের অভিলাষী, তাঁহারা বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র বা সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন কি না দেখিয়া লওয়া উচিত; অপর দিকে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসী নহেন, তাঁহারা যাহাতে যথাশক্তি জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। এই পথ অবলম্বন না করিলে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির বাধা দেওয়া হইবে। জ্ঞানলাভ বিলাসের সামগ্রী নয়, ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। যদি দেশের অতি অল্প লোক যোড়শোপচারে ভোজন করেন, আর সকলের একবেলা ক্ষুন্নিবৃত্তিরও উপায় না হয়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা যেমন ভয়ানক হয়, দুইচারিটি লোক সুপণ্ডিত, আর সকলে মূর্খ, এরূপ হইলে শিক্ষাবিষয়ে দেশের অবস্থা সেইরূপ শোচনীয় হইবে।

---

* ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট, ৫৬ পৃষ্ঠা।

মোটামুটি কাজ চলিতে পারে, এরূপ শিক্ষালাভের পথ সহজ রাখিয়া প্রতিভাশালী যুবকগণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

যে সকল যুবকগণ এল্.এম্.এস্ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৩০ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত। অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে, যাহারা প্রবেশিকা বা তৎপরবর্ত্তী পরীক্ষায় কষ্টে-সৃষ্টে উত্তীর্ণ হয়, তাহারা মেডিকেল কলেজে সহজেই কৃতকার্য্য হয়। যদি এই সকল ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাদের দশা কি হইবে? নিম্নতর পরীক্ষাগুলি কঠিনতর করা উচিত নয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আজকাল অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজী ভাষায় অধিকার লাভের চেষ্টা না করিয়া, কেবল পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা মুখস্থ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সুপ্রণালীতে শিক্ষা দিলে ব্যাখ্যা মুখস্থ করা অপেক্ষা ভাষা শিক্ষা করা ছাত্রগণের পক্ষে অনেক সহজ। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাই আরও কঠিন করিতে চান, তাঁহাদের এক যুক্তি এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য কমিয়া গিয়াছে। পরীক্ষা সহজ হওয়াতে অনেক অযোগ্য ছাত্র উপাধিলাভ করিতেছে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ও প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি লোকের আস্থা থাকিতেছে না। তদুত্তরে আমরা বলি, যে সকল ছাত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন না, কেবল কোনপ্রকারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের দ্বারা কোন দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবরক্ষা হয় না। যাঁহারা ছাত্রাবস্থায় এবং তৎপরে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাঁহারাই তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করেন। যখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলাম, একদিন শুনিলাম, আমাদের ভক্তিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত টনিসাহেব অপর একজন অধ্যাপককে বলিতেছেন— অক্সফোর্ডের একজন 'পাস্ বি এ''-র নিকট বেশি কিছু আশা করা যাইতে পারে না। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটিতে শ্রীযুক্ত ওয়ানসাহেবও বলিলেন, কোনও বিদ্যালয়ের "পাস্ বি এ" বেশী কিছু জানেন শুনেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষার জন্য যাঁহারা বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক; কেবল তাঁহাদের পরীক্ষা কঠিনতর না করিয়া নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। উপযুক্ত ছাত্রদিগকে কোন বিশেষ বিদ্যানুশীলন করিবার জন্য বৃত্তি দেওয়া উচিত। আর একটি কথা বলিতে চাই, সর্ব্বাগ্রে সুশিক্ষক, তৎপরে শিক্ষার ব্যবস্থা, তারপর পরীক্ষা। মহাত্মা কাউয়েল বা উড্‌রোর স্থান অধিকার করিতে পারেন, এমন অধ্যাপক এখন এ দেশে কোথায়?

৩। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

শিক্ষার আদর্শ দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা সম্বন্ধে "ভাণ্ডারে" যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, আমি কেবল বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞান চর্চ্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

এমন স্থলে, এ দেশের য়ুনিভার্সিটিকে এ দেশের অবস্থা ও অভাব বিশেষভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই— অন্য দেশের অনুকরণ করিতে গেলে, সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা কবিতে পারিতাম তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। যে ব্যক্তি চলিতে শিখিলেই আপাতত খুসি হওয়া যায়, তাহাকে একদমে লাফ দিতে শিখাইতে হইবে এমন পণ করিয়া বসিলে, লাফ দেওয়া ত হইবে না, মাঝে হইতে চলাই দুর্ঘট হইবে।

দেশে যাহারা একটা নূতন ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহারা কি উপায় গ্রহণ করে? ভারতবাসীদের মধ্যে চায়ের ব্যবসা জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য কি করা হইয়াছে? দেশের যথাসম্ভব লোক যাহাতে চায়ের স্বাদ পায়, চা-পান করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার জন্য দেশ জুড়িয়া সস্তায় চা-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সেরাজাতের দামী চা চড়াদরে বাজারে বাহির করা, দেশে চা-প্রচলনেব পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

দেশে নূতন বিদ্যা চালাইবারও এই একই উপায়। প্রথমপরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই;— যখন অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিদ্যার রস পাইতে থাকিবে, তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্য এখনকার চেয়ে কড়াক্কড়ি চলিতে পারিবে।

বিদেশী য়ুনিভার্সিটির চেয়ে আমাদের আদর্শ খাটো হইয়া পড়িবে, এই মিথ্যালজ্জার কোনো মূল্য নাই। সেখানকার আদর্শও চিরদিন একইভাবে ছিল না— জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

যাই হোক না কেন, রাজবাড়ীতে সকলে ক্ষীর খাইতেছে বলিয়া, দরিদ্র বেচারাকে

সেই আদর্শে লজ্জার বশে দুধ খাওয়া ছাড়িতে কেহ পরামর্শ দিবে না— আপাতত যাহা আমাদের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সেই দিকে মন দিতে হইবে, গৌরবের কথা পরে ভাবা যাইবে।

তা ছাড়া, আর একটি কথা বলিবার আছে' বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই, বিজ্ঞানসাধকের মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞান পাণ্ডিত্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে।

আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই, এবং ছাত্ররা যাহাতে পুঁথিগতবিদ্যার শুষ্ক কাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া, প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞানদৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

এরূপ শিক্ষা ভাগ্যদোষে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু দুরূহ নহে।

৪। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি কমিশনের অপরাপর সদস্যমহোদয়গণেব মতের অনৈক্যের কারণ এই যে, তাঁহারা যে দিক হইতে সংস্কার মনে করেন, আমি বিষয়টি সে দিক হইতে দেখি নাই; তাঁহারা উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও বিদ্যালয়ের অনুশাসন উন্নত করিবার পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা যে সকল প্রস্তাব **করিয়াছেন,** তাহাতে শিক্ষা সম্বন্ধে সকল কর্তৃত্ব সরকার বাহাদুর এবং অল্পসংখ্যক **বিশেষজ্ঞের** হাতে যাইয়া পড়িবে, অল্প সরঞ্জামের কোন কলেজ টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না, সাধারণশক্তিসম্পন্ন দরিদ্র ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষালাভ অসাধ্য হইবে এবং শিক্ষাবিষয়ে সাধারণের হাত অনেক পরিমাণে উঠিয়া যাইবে। আমার আশঙ্কা হয়, জিনিষটা অতিমাত্র উঁচু করিবার চেষ্টায় ভিত্তিটা পাছে অতিসংকীর্ণ হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় উহা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। (ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট।)

শিক্ষার আদর্শের উন্নতি সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু আমার বিশ্বাস সংস্কার ধীরে ধীরে করা ভাল, একবারে পূর্ব্বপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়া আরম্ভ করা ভাল নহে। শুধু এ দেশে নহে; শিক্ষাবিষয়ে অধিকতর অগ্রসর দেশসমূহেও শিক্ষার তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারিত করিতে পারেন, এরূপ মনস্বীদের সংখ্যা বেশি নহে। অধিকাংশের আশয় ও শক্তিতে ততটা কুলায় না, উচ্চশিক্ষার একটি মোটামুটি ফল তাঁহারা পাইয়া থাকেন, জগতের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে না পারিলেও নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে শক্ত হয় না। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীর সংখ্যা যেরূপ অল্প, উচ্চশিক্ষায় কোনরূপ উপকার পাইতে পারেন না— তদ্রূপ লোকের সংখ্যাও সেইরূপ অল্প। ইউনিভার্সিটি অল্পসংখ্যক মনস্বীদিগকে শিক্ষার উচ্চতম সোপানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না, দেশের অধিকাংশ লোক যাহাতে মোটামুটি শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য। নতুবা শিক্ষা জিনিষটা দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া উঠিবে সত্য, কিন্তু প্রসারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শুকাইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, গভর্ণমেন্ট শিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি করিতে চান না, কারণ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে দেশের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে, তাহাতে দেশের শান্তি নষ্ট হইবার কথা। এই মতাবলম্বীদিগের কথায় আমি সায় দিতে পারি না; বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির ন্যায় অসামান্য পণ্ডিত ও মনস্বী কর্ত্তৃক পরিচালিত সুসভ্য ইংরেজ গভর্ণমেন্ট, এরূপ কথায় কর্ণপাত করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। যদি বর্ত্তমান গভর্ণমেন্টের স্থায়িত্বে কাহারও গুরুতর স্বার্থসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা বিশেষভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। অবশ্য এ কথা সত্য যে, তাঁহারা রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করিয়া থাকেন এবং মাঝে মাঝে গভর্ণমেন্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকলাপ রাজভক্তি ও রাজবিধি সম্মত; সময়ে সময়ে অনুচিত ভাষা প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা সরকারকে উত্যক্ত করেন বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া সংশোধনের উপায় নহে। কঠোরতা অবলম্বন না করিয়া শমিতভাবের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহাদের সুশিক্ষা হইতে পারে। বাহ্যজগতে যেরূপ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়, নৈতিক জগতেরও সেই নিয়ম। (শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা।)

৫। শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন

আদর্শ লইয়াই যখন প্রশ্নটা উঠিয়াছে ও যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, একপক্ষ শিক্ষার আদর্শকে যথাসম্ভব দুরূহ করিয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন. তখন ইংরাজিতে যাহাকে Counsel of perfection বলে, সেইরূপ একটা খুব উচ্চদরের পরামর্শ দিতেই ইচ্ছা হইতেছে। পরামর্শটা নেহাত অকেজো না হইতেও পারে।

আমার মনে হয়, শিক্ষার আদর্শ ও আদর্শ শিক্ষক একই বস্তুর দুইটি দিক মাত্র। সুতরাং আমাদের মধ্যে উচ্চ আদর্শের শিক্ষা চলিবে কি না, ও সেই আদর্শে ছাত্রেরা পরীক্ষিত হইবে কি না, এই প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদের দেশে কতকগুলি আদর্শ শিক্ষকের জোগাড় করা দরকার।

আদর্শ শিক্ষক তাঁকেই বলি, যাঁর নিজের একটা শিখিবার ও শিখাইবার বিষয় আছে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শুধু পুঁথির সাহায্যে পরের উপার্জ্জিত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিলেই আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না। তিনিই এই নামের যোগ্য, যিনি মননশীল, যিনি বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু নূতন তত্ত্ব (তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না) স্বীয় প্রতিভায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উদ্ভাবনী শক্তিই তাঁহাকে বিষয়টির উপর দখল দিয়াছে ও এই কারণেই বিষয়টি তাঁহার একান্তই নিজের হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চিন্তাকে নিয়ত অনুকূল করিয়া তুলিতেছে, তাঁহার কৌতুহলকে চিরদিন নবীনভাবে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপ শিক্ষক পাইলে ছাত্রদের পরীক্ষা করিবার ভার অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাদের হাতে অর্পণ করা যাইতে পারে। এমন কি, ছাত্রদের পক্ষ হইতেও কোন আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কারণ যাঁহারা নিজে কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা অপরের চেষ্টা কি যত্নের মূল্য সহজেই অবধারণ করিতে পারেন, এবং নিতান্ত দাম্ভিক না হইলে তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা নিজে কত সামান্য উপকরণ লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। অজ্ঞতাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করাতে, কোনও পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রতি কঠিনতম দণ্ডবিধি প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অত্যন্তই অনিচ্ছুক হইবেন।

অতএব উত্থাপিত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি ইহাই যে— আদর্শ শিক্ষকদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাঁহাদের হাতে পরীক্ষার ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাঁহাদের

সহজবুদ্ধির (Good sense) উপর নির্ভর করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই শিক্ষার আদর্শ উচ্চতম হইলেও পরীক্ষার কঠিনতা সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ শ্রুত হইবে না।

উত্তরটা তত ভাল শুনাইল না; বর্ত্তমান শিক্ষক অথবা পরীক্ষকদের যোগ্যতার তারতম্য বিচার করিতে হইবে, এরূপ কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মোটেই প্রীতিকর নহে। সুতরাং এ কথা ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করি, পরীক্ষক কি প্রণালীতে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন? যদি তিনি ইহাই জানিতে চাহেন, ছাত্র কতটা ভাবিতে শিখিয়াছে, অথবা ভাবিবার প্রণালী কতটা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার পরীক্ষাপ্রণালী এক ধাঁজের হইবে। আর যদি তিনি জানিতে চাহেন, ছাত্র পরোক্ষে বা অপরোক্ষে জগতের সংখ্যাতীত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলির মধ্যে কতগুলি বিষয়েব বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার পরীক্ষাপ্রণালী অন্য ধাঁজের হইবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুই প্রণালীর প্রার্থক্য সমুচিতভাবে স্বীকৃত হয় নাই। ইহার ফল হইতেছে যে, ছাত্রেরা যতদূর সম্ভব বৃত্তান্ত (Knowledge) মুখস্থ করিয়া পাসের জোগাড় করিতেছে, আর পবীক্ষকেরা একরূপ "ঠকানে প্রশ্ন" জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদেব শ্রমকে পণ্ড করিয়া দিতেছেন।

৭০ বৎসর পূর্ব্বে Lamb আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আধুনিক স্কুল মাষ্টারদের জগতের ছোট বড় সকল বিষয়ের খবর রাখিতে হইবে, নতুবা সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা নাই। সামাজিক দাবী কমিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না; ধনমানের রেষারেষির ন্যায় পাণ্ডিত্যের রেষারেষি যে, শিক্ষিতসমাজকে আক্রমণ করে নাই, তাহা ত বলা যায় না। এমন অবস্থায় যদি কে কত বিষয় জানে, এই লইয়া পরীক্ষক ও ছাত্রের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঁড়াইয়া যায়, তবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ভীত হইতে হয়।

পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য, ছাত্রদের মানসিক শক্তির পরিচয় লওয়া। এই লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়া প্রবেশিকা হইতে শেষতম পরীক্ষা পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক (Graduated) পরীক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষয়, আমাদের শিক্ষাবিভাগের মনীষিগণের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। দেখা যাউক, তাঁহারা কি করেন। একটা কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না— যাহা যত স্বাভাবিক তাহা তত সহজ হইয়া থাকে।

প্রবেশিকায় ছাত্রেরা ইংরাজি ও মাতৃভাষায় রচনা করিতে কতটা সক্ষম হইল,

সংস্কৃত বা অপর কোন একটি অপ্রচলিত ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে এবং কথঞ্চিৎ সেই ভাষার (ভাষায়) অনুবাদ করিতে শিখিল, অঙ্কশাস্ত্রের মুলসূত্রগুলি বাস্তববিষয়ে (Concrete Examples) কতদূর প্রয়োগ করিতে শিখিল, একটি কোন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে নীতি বা মনোরাজ্যের সামান্য কার্য্যকারণ সংঘটিত নিয়মগুলি কতটা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইল, দুই একটি প্রাকৃত পদার্থ দেখিয়া তাহা চিত্রে ও ভাষায় বর্ণনা করিতে কতটা পারিল, এইরূপ মোটামুটি তাহাদের শক্তির পরিচয়লাভ করাই প্রবেশিকা পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। তাহার পর ছাত্রেরা কতদূর প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে প্রবেশ করিতে পারিল, ভাষার রসবোধ ও তৎসঙ্গে ভাষাকে ভিন্ন করিয়া ভিতরকার ভাবকে আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা কতদূর বাড়িল, নিজের রচনা প্রণালীকে (style) কতদূর গঠিত করিল, অঙ্কশাস্ত্রের বীজমন্ত্রগুলি কতটা বুঝিল,প্রকৃত পরিচয় কতদূর লাভ করিল, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের* কারণ অনুধাবন করিতে কতটা সক্ষম হইল— ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিচয় উত্তরোত্তর পরীক্ষা দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে। সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় তাহাদের উৎকৃষ্ট ক্ষমতা, আমাদের ভারতবর্ষেরেই যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া, স্বীয় নিপুনতার পরিচয় দিবে। বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় আমাদের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা, এই দেশের আকাশ-অন্তরীক্ষ ও ভূস্তর, ইহার মন ও সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য, ইহার রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, ইহার ব্যবসা ও বাণিজ্য, ইহার ধর্ম্ম ও পরমার্থ সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া নিজেদের সার্থকতার পরিচয় দিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই আনন্দলাভের আশা কি বাস্তবিকই দুরাশামাত্র?

আমি পরীক্ষা পর্য্যায়ের যে প্রোগ্রেম লিখিলাম, তাহাতে অনেক ভুল থাকিতে পারে। ক্রটি অনিবার্য্য। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যদি একটি উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষা প্রণালীকে যথাযথ শ্রেণীবদ্ধ না করা হয়, তবে পরীক্ষায় কৃত্রিমতা ক্রমশ বাড়িতেই থাকিবে। এবং আশঙ্কা হয় যে, পরীক্ষার দণ্ডবিধির কঠোরতাপ্রযুক্ত অধিকাংশ ছাত্রই মনুষ্যত্ব ও বিদ্যার বিমল আনন্দ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইবে। ইহার অপেক্ষা গভীর মনস্তাপের বিষয় আর কিছু থাকিতে পারে, তাহা জানি না।

এই কথাটার জন্য আমরা ভাণ্ডারসম্পাদকের নিকট ঋণী রহিলাম।

ভাণ্ডারের নিয়মাবলী।

১। ভাণ্ডারের অগ্রিম বার্ষিকমূল্য শহর ও মফস্বলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সহিত ২।০। খুচরা সংখরা ।০ আনা।

২। ভাণ্ডার প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে। ৭ই তারিখের মধ্যে কেহ ভাণ্ডার না পাইলে আমাদিগকে জানাইবেন।

৩ গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয়ের জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে, তাহাই গ্রাহক নম্বর।

৪। ভাণ্ডারসম্বন্ধীয় টাকাকড়ি চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি সমস্তই নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। কেহ কোন বিষয় জবাব চাহিলে রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাকটিকেট পাঠাইবেন অন্যথা জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

৫। ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপনের হার ঃ— এক পৃষ্ঠা মাসিক ৫৲ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ হিসাবে দিতে হয়। বেশী দিনের বন্দোবস্ত হইলে সুবিধাজনক নিয়ম আছে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

ভাণ্ডারের গ্রাহকদিগের বিশেষ সুবিধা।

প্রতি মাসে তিনটি জিনিষের নাম ও মূল্যের তালিকা ভাণ্ডারে প্রকাশিত হইবে; গ্রাহক তাহার মধ্যে যে জিনিষ পছন্দ করিবেন, আমরা তাহা বাজার দর হইতে প্রতি টাকায় /১০ পয়সা ন্যূন মূল্যে দিব। সর্ব্বশুদ্ধ দুই টাকার অধিক দামের জিনিষ কোনও এক মাসে দেওয়া যাইবে না।

১। এইচ বোসের পারফিউমারি।

২। কলিকাতা পটারিওয়ার্কের জিনিষ।

৩। পাইওনিয়ার কন্ডিমেন্ট কোংর চাটনি ও সিরাপ ইত্যাদি।

এ. কে. সেনগুপ্ত

ম্যানেজার, ৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাধীন শিক্ষা

দেশের শিক্ষাকে বিদেশী রাজার অধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য কি উপায় করা যাইতে পারে, এই প্রশ্ন 'ভান্ডারে' উঠিয়াছে।

যতদিন বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের উপরে অন্নলাভ নির্ভর করিবে, ততদিন মুক্তির আশা করা যায় না এই কথাই সকলে বলিতেছেন।

কিন্তু কথাটা কেবল উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেই খাটে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ে প্রাকৃতগণ যে শিক্ষালাভের জন্য ছেলেকে পাঠশালায় পাঠায়, সে শিক্ষার দ্বারা গবর্মেন্টের চাকরি কেহ প্রত্যাশা করে না।

আমাদের দেশে এই পাঠশালা চিরকাল স্বাধীন ছিল। আজও এই সকল পাঠশালার অধিকাংশ ব্যয় দেশের লোক বহন করে; কেবল তাহার উপর আর সামান্য দুই-চার-আনার লোভে এই আমাদের নিতান্তই দেশীয় ব্যবস্থা পরের হাতে আপনাকে বিকাইয়াছে।

এই প্রাথমিক পাঠশালার চেয়ে উপর পর্য্যন্ত উঠে অথচ কলেজ পর্য্যন্ত পৌঁছে না এমন একদল ছাত্র আছে, সাধারণতঃ ইহারাও সরকারী চাকরির দাবি করিতে পারে না। ইহারা অনেকেই সদাগরের আপিসে, জমিদারের সেরেস্তায়, ধনিগৃহের দপ্তরখানায়, গৃহস্থঘরের বাজার-সরকার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।

কিন্তু দেশে ইহাদের শিক্ষার তেমন ভালো ব্যবস্থা নাই। পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি স্কুল ইহাদের কতকটা উপযোগী ছিল। কিন্তু মাইনর স্কুল এখন ছাত্রবৃত্তিকে প্রায় চাপিয়া মারিল। ইংরেজি শিক্ষাই যে সব স্কুলের প্রধান লক্ষ্য এবং কলেজই যাহার গম্য স্থান, সে সকল স্কুলে কিছুদূর পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলে না বাংলা না ইংরাজী না কিছুই শেখা হয়।

অতএব যাহারা পাঠশালা পর্যন্ত পড়ে এবং যাহারা নানা প্রকার অভাব ও অসুবিধাবশতঃ তাহার চেয়ে আর কিছু দূর মাত্র পড়িবার আশা করিতে পারে, দেশ তাহাদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইলে বাধার কারণ ত কিছুই দেখা যায় না।

গুণতি করিয়া দেখিলে কলেজ পাস করা ছাত্রদের চেয়ে ইহাদের সংখ্যা অনেক

বেশী হইবে। এই বহুবিস্তৃত নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষা আমরা যদি উপযুক্তভাবে দিতে পারি, তবে দেশের শ্রী ফিরিয়া যায় সন্দেহ নাই।

ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমন ভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা ভাল করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে কলমে সকল রকমে তৈরী হইয়া উঠিতে পারে। পাঠশালায় শিশুবয়সে যে সকল ভাব, জ্ঞান ও অভ্যাস সঞ্চার করিয়া দেওয়া যায়, বড় বয়সে বক্তৃতার দ্বারা তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না।

যাই হোক, উচ্চশিক্ষায় দেশের লোকের পক্ষে গবর্মেন্টের প্রতিযোগিতা করিবার যে সকল বাধা আছে নিম্নশিক্ষায় তাহা নাই।

কিন্তু এত বড় দেশব্যাপী কাজের ভার আমাদিগকে নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা বলিলেই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হতাশ হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহারা ইহাও জানেন, এ কাজ সরকারের হাতে দিলে কিন্ডারগার্টেনের ধুয়া ধরিয়া নিতান্ত ছেলেখেলা হইতে থাকিবে এবং লাভের মধ্যে ম্যাক্‌মিলন কোম্পানীর উদরপূরণ হইবে। কিছু না হৌক, এ শিক্ষা আমরা যেমন চাই তেমন হইবে না, বরঞ্চ কতক অংশে বিপরীত হইবে।

অন্যত্র ইহা ত দেখিয়াছি দয়ানন্দের দল আপন সম্প্রদায়ের জন্য স্বচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ চেষ্টা কি করিলে সাধ্য হইতে পারে এবং এই সকল নিম্নতন বিদ্যালয়গুলিতে কি কি বিষয় কি নিয়মে শিক্ষা দিতে হইবে, সুধীগণ 'ভান্ডার' পত্রে তাহার আলোচনা করিলে সম্পাদক কৃতার্থ হইবেন।

সম্পাদক

ইতিহাসকথা

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুইটি সহজ উপায় অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে — একমাত্র পুরাণকথার ভিতর দিয়া সকল প্রকার উপদেশ চালান যায় না। অথচ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।

একেবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনই ঘটিবে না। তা'ছাড়া ইস্কুলে পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।

ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সব চেয়ে বেশী করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কি করিয়া বড় হইয়াছে প্রবল হইয়াছে দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কি করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কি করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিত লোকের অনেক ভাবনা-চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজকর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ কি করিয়াছে ও কি করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের পক্ষে শোচনীয় অজ্ঞতা।

কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখান যাইতে পারে। এমন কি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভাল করিয়াই শেখান যাইতে পারে।

আজকাল য়ুরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাসশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায় — একথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের

সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই চলিত আছে — য়ুরোপ আজ সেই রূপ সরস উপায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে, আর আমরাই কি আমাদের জ্ঞান প্রচারের স্বাভাবিক পথগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনালোকবর্জ্জিত ইস্কুলশিক্ষার শরণ লইব!

আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিযা দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হৌক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্যপ্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি — কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্য দেশের সর্বত্র প্রচাব করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমন কি কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরু গোবিন্দ, শিবাজী, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন? এমন কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন?

সম্পাদক

বহুরাজকতা

সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তুলনা করিতে আমরা ছাড়ি না। সাবেক কাল যখন হাজির নাই, তখন একতর্‌ফা বিচারে যাহা হইতে পারে তাহাই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ বিচারকের মেজাজ অনুসারে কখনো বা সেকালের ভাগ্যে যশ জোটে, কখনো বা একালের জিৎ হয়। কিন্তু এমন বিচারের উপরে ভরসা রাখা যায় না।

আমাদের পক্ষে মোগলের আমল সুখের ছিল কি ইংরেজের আমল সুখের, গোটাকতক মোটা মোটা সাক্ষীর কথা শুনিয়াই তাহার শেষ নিষ্পত্তি হইতে পারে না। নানা সূক্ষ্ম জিনিষের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে—সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়। বিশেষত যে কালটা গেছে সে আপনার অনেক সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া গেছে।

কিন্তু সেকাল-একালের একটা মস্ত প্রভেদ ছোট বড় আর সমস্ত প্রভেদের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। এই প্রভেদটা যেমন সকলের চেয়ে বড়, তেমনি নিশ্চয়ই এই প্রভেদের ফলাফলও আমাদের দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে গুরুতর। আমাদের এই ছোট প্রবন্ধে আমরা সেই প্রভেদটির কথাই সংক্ষেপে পাড়িয়া দেখিতে চাই।

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে অনেক। এ কথাটা এতই সোজা যে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোনো সূক্ষ্মতর্কের প্রয়োজন হয় না।

বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজজাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

খুব সম্ভব বাদশাহের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল—এখন অত্যাচার নাই কিন্তু বোঝা আছে। হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু মাহুতের বদলে যদি আর একটা গোটা হাতিকে সর্ব্বদা বহন করিতে হইত তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

একটি দেবতার পূজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা দেখিতে স্তূপাকার হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয় ত অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। কিন্তু তেত্রিশকোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপ্‌ড়িও যদি দেওয়া যায়, তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্য হউক না কেন তলে তলে ব্যাপারখানা বড় কম হয় না। তবে কি না এই একটা একটা করিয়া পাপ্‌ড়ির হিসাব এক জায়গায় সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করার কথা মনেও উদয় হয় না।

কিন্তু এখানে কাহাকেও বিশেষরূপে দায়ী করিবার কথা হইতেছে না। মোগলের চেয়ে ইংরেজ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। তবে কি না অবস্থাটা জানা চাই, তাহা হইলে অনেক বৃথা আশা ও বিফল চেষ্টার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেও একটা লাভ।

মনে কর,—এই যে আমবা আক্ষেপ করিয়া মরিতেছি দেশের বড় বড় চাক্‌রি প্রায় ইংবেজেব ভাগ্যে পড়িতেছে ইহাব প্রতিকারটা কোন্‌খানে? আমরা মনে করিতেছি বিলাতে গিয়া যদি দ্বাবে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি, তবে একটা সদ্‌গতি হইতে পারে?

কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যাহার বিরুদ্ধে নালিশ, আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।

বাদ্‌শাহের আমলে আমরা উজীর হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি, এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে ইহাব কারণ কি? অন্য গূঢ় বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা মোটা কারণ আছে সে ত স্পষ্টই দেখিতেছি। ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না—ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে জোগাইতে হইতেছে।

যদি সপ্তম এডোয়ার্ড যথার্থই আমাদের দিল্লির সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হুজুর, যদি অন্নের বড় বড় গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের হাতে পড়ে, তবে তোমার রাজ্য টেঁকে কি করিয়া।

তখন সম্রাটও বলিতেন, "তাইত, আমার সাম্রাজ্য হইতে আমার ভোগের জন্য যাহা গ্রহণ করি তাহা শোভা পায়, কিন্তু তাই বলিয়া বারো ভূতে মিলিয়া পাত পাড়িয়া বসিলে চলিবে কেন?"—

তখন আমার রাজ্য বলিয়া তাঁহার দরদ বোধ হইত এবং অন্যের লুব্ধহস্ত ঠেকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে আমার রাজ্য বলিয়া জানে। এ রাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্ব্বতা ঘটিতে গেলেই তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোনো আইনকর্ত্তা এসম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।

এই আমাদের প্রকাণ্ড বহুসহস্রমুখবিশিষ্ট রাজার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইবার জন্য তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিস্ফল, এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

প্রতিকারের একটা উপায় আছে। আমরা যদি নিজেদের অভাব কমাইয়া জীবিকার আর পাঁচটা স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারি, যদি সরকারী চাক্‌রির প্রতি দেশের লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তবে একদিন দায়ে পড়িয়া সরকার তাহার চাক্‌রিবিভাগকে আমাদের পক্ষে লোভনীয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।

ইহা দুঃসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু অসাধ্যের চেয়ে সহজ।

মোটকথা,—একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্ব্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভাল রাজা হইলেও এরকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড় কঠিন। মুখ্যত অন্য দেশের এবং গৌণত আপনার স্বার্থ যে দেশকে এক সঙ্গে সাম্‌লাইতে হয়, তাহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যে দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বহিরে পড়িয়াছে সে মাথ তুলিবে কি করিয়া? না হয় চুরি ডাকাতিই বন্ধ হইল, না হয় আদালতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুবিচারই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বোঝা নামাইব কোথায়?

অতএব কন্‌গ্রেসের যদি কোনো সঙ্গত প্রার্থনা থাকে, তবে তাহা এই যে, সম্রাট্‌ এডোয়ার্ডের পুত্রই হউন্‌, স্বয়ং লর্ড কার্জ্জন বা কিচেনারই হউন্‌, অথবা পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন্‌, ভাল মন্দ বা মাঝারি যে কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট্‌ আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক্‌ না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশশুদ্ধ রাজাকে পারে না।

এ প্রার্থনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশা করা যায় না, অন্য কিছু পূর্ণ হইলেও বিশেষ লাভ আছে বলিয়া মনে করি না।

সম্পাদক

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কি উপায়ে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে পারে?

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত মৌলবী সিরাজল্ ইস্‌লাম খাঁ বাহাদুর

ভারত আমাদের জন্মভূমি। যাহাতে জননী জন্মভূমির হিত সাধিত হয়, তাহা করা ভারতসন্তানগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠ। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক একতা ও সহানুভূতি হইলেই এই হতভাগিনী ভারতজননীর হিত সাধিত হইবে এবং তাহার সন্তানগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও উন্নতি হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ও মমতা ছিল, এখন সর্ব্বত্রই তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলকেই পুত্রের ন্যায় সমভাবে পালন করিতেন। যাহাতে হিন্দুমুসলমানের বৈষম্য দূরীকৃত হয় এবং তাহারা পরস্পর একতাশৃঙ্খলে আকৃষ্ট হয়, তাহারই তিনি সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে বিভিন্নতা অনেক পরিমাণে লাঘব করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দুমুসলমানগণ একত্রে চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এখন সর্ব্বত্রই তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এখন হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ ও মনের মালিন্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতের উন্নতি-অবনতি এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতি নির্ভর করিতেছে। যদি তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় একতা ও সহানুভূতি হয়, তবেই ভারতমাতার উন্নতির আশা করা যায়, নচেৎ অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বকালে হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল, এখন তাহার অভাব কি জন্য লক্ষিত হইতেছে, আদৌ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। যদিচ,

মুসলমান রাজত্বকালে সময় সময় স্থানবিশেষে কোন অনিবার্য্য অত্যাচার হইত, কিন্তু তথাপি সাধারণতঃ মুসলমান সম্রাটের উপর হিন্দুজাতির এত ভক্তি ছিল যে, দিল্লির সম্রাটকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। সকল ভদ্রবংশীয় হিন্দুগণের মধ্যে পার্শীভাষা শিক্ষা প্রচলিত ছিল, মুসলমানদের সাহিত্য ও তাহাদের পুর্ব্বতন ইতিহাস ও তাহাদের মহাপুরুষদের জীবনচরিত পাঠ করিয়া মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদিগের শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আকর্ষণ হইত। এমন কি, মুসলমানদের পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারের নিয়মাদিও হিন্দুগণ অধিকাংশ অনুকরণ করিতেন। মুসলমানগণও হিন্দুদিগকে পরাজিত-জাতি বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিতেন না। একের সুখে, দুঃখে ও উৎসবে অন্যে যোগদান করিতেন। এখনও পাড়াগাঁয়ে তাহার লক্ষণ কিছু কিছু লক্ষিত হয়। হিন্দুগণের পূজা ও বিবাহেতে মুসলমানগণ ও মুসলমানগণের ঐ সকল উৎসবে হিন্দুগণ আত্মীয়ভাবে যোগদান করিয়া থাকেন।

কোন সময় হইতে এবং কি কি কারণবশতঃ এই সদ্ভাবের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই হিন্দুভ্রাতৃগণ তাহার মূল কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, কি কারণবশতঃ ঐ রোগের উদ্ভব হইয়াছে, আদৌ তাহার নিরাকরণ আবশ্যক।

অধিকাংশ ইংরেজি ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের অত্যাচার ও মিশনারিদের লিখিত ধর্ম্মপুস্তক সমূহে মুসলমান চরিত্রের যে বিকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত পাঠে হিন্দুযুবকদের মনে মুসলমানজাতির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ বিকার উপস্থিত হয়, তৎপরে কোন কোন বাংলা পুস্তকেও মুসলমান চরিত্রকে যতদূর হইতে পারে বিকৃত করা হইয়াছে। এমন কি, এখন হিন্দুজাতির নিকট মুসলমানসম্প্রদায় হেয় ও ঘৃণাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানদের ভাষা, মুসলমানদের সাহিত্য, তাহাদের আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি একেবারেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তাহাদের সহিত সংসর্গ রাখাও কোন কোন হিন্দু দূষণীয় বলিয়া মনে করেন। এমন কি, কোন কোন হিন্দুদের মধ্যে "ভদ্রলোক" শব্দে মুসলমান পরিগণিত হয় না।

এ দিকে এসকল অবস্থা দেখিয়া মুসলমানগণ হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী হন না। চতুর্দ্দিকেই মুসলমানদের অবনতি, তাহারা অর্থহীন ও বিদ্যাহীন। পূর্ব্বকালে যে সকল ধনাঢ্য ও সম্পত্তিশালী বংশ ছিল, তাহারাও ক্রমে হ্রাস ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা হিন্দুভ্রাতৃগণের সহিত সমভাবে চলিতে পারে, কি

কোন কার্য্যে সমভাবে যোগদান করে, ইহা অসম্ভব। হিন্দুদের সহানুভূতি ও মমতা ভিন্ন মুসলমানদের একা কিছু করা সম্ভবপর নহে। যদি হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাজ্ঞানে তাহাদের প্রতি সাহায্যের ও সহানুভূতির হস্ত প্রসার করেন, তাহা হইলেই মুসলমানদের একমাত্র উদ্ধারের উপায় এবং উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

আমার বিবেচনায় কয়েকটী বিষয়ের প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ—

১। হিন্দু ও মুসলমান একজাতি (Nation)।

২। হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ (Interest) এক (Identical)।

৩। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ও মনোমালিন্য যাহাতে দূরীকৃত হয়।

৪। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে সহানুভূতি থাকে।

আমার বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের নেতাগণ কয়েকটী বিষয় চেষ্টা করিলে আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পথ পরিষ্কার হইতে পারে।

১। সময় সময় (Party) পার্টি দেওয়া এবং তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা চিন্তাশীল ও স্বদেশহিতৈষী, তাহারা একত্রিত হইয়া যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সহানুভূতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আলোচনা, চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবন করা।

২। ভাষাশিক্ষা, অর্থাৎ হিন্দু যুবকদিগকে মুসলমানদের সাহিত্য ও ইতিহাস ও তাহাদের মহাপুরুষদের জীবনচরিত শিক্ষা দেওয়া এবং মুসলমান যুবকদিগকেও বাংলাভাষা শিক্ষা করা এবং হিন্দুদিগের মহাপুরুষদের জীবনচরিত পাঠ করা।

৩। হিন্দুদের জাতীয় উৎসবে মুসলমানদের যোগদান ও মুসলমানদের জাতীয় উৎসবে হিন্দুদের যোগদান।

৪। দুর্ব্বলদলের (Minorityর) স্বার্থের (Interestএর) প্রতি সবলের (Majorityর) দৃষ্টি রাখা।

২। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেরূপ সদ্ভাব দেখা যাইত, এখন কিয়ৎপরিমাণে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমার মনে হয়, হিন্দুরাই তাহার জন্য দায়ী। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে "নেড়ে" না বলিয়া একটু সহানুভূতির চক্ষে দেখিলে, হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্নতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। এখনও পাড়াগাঁয়ে অনেক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী পরস্পর কাকা, চাচা প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া থাকেন।

নেটিভ ষ্টেটসমূহে হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। মুসলমান হিন্দুদিগকে এবং হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। হাইদ্রাবাদেব বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মহারাজ কৃষ্ণপ্রসাদই তাহার নির্দশন।

হিন্দু ধর্ম্মোৎসবে মুসলমানগণ যোগ দেন এবং মুসলমান ধর্ম্মোৎসব সমূহে হিন্দুগণ যোগদান করেন। কোন কোন মুসলমান উৎসবে হিন্দুরমণীগণ মুসলমানগণকে জলদান করা একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এখনও পল্লীগ্রামে দেখা যায়, হোলি ও দুর্গাপূজাদিতে মুসলমানগণ উৎসবে যোগ দেন এবং হিন্দুগণ মহরম প্রভৃতিতে চাঁদা দিয়া থাকেন। ইহাতে ধর্ম্মের সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকিলেও পরস্পর একটা আভ্যন্তরিক মিলন সংরক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক উৎসব আছে, যাহা হিন্দুমুসলমান উভয়ে একত্রিত হইয়া সম্পন্ন করেন। যেমন বারয়ারী, সত্যপীর ইত্যাদি।

কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমানগণ পবস্পরের ধর্ম্মের সঙ্গে কোনরূপ সংস্রব না রাখিয়া যাহাতে জাতীয় উৎসবে যোগ দিতে পারেন, তাহার জন্য আমাদিগকে একটু যত্ন করিতে হইবে। আজকাল বড় বড় ভোজে সাহেবদেরও তো নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে?

পাড়াগাঁয়ে প্রায়ই দেখা যায়, হিন্দুদের উৎসবে মুসলমানগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র আহারাদি করেন। মুসলমানদিগের বিবাহেও তো হিন্দুরা নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন? তাঁহাদের স্বতন্ত্র খাওয়া সম্বন্ধেও আপত্তি হইলে, বাড়ীতে সিধা লইয়া আসেন। আর হিন্দু ও মুসলমানের বাড়িতে ত পানতামাকের নিমন্ত্রণ প্রায় দেখা যায়। কলিকাতায় এই সমুদয় প্রচলন করিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তাহার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহাদের মিলনের এক প্রধান সুযোগ ছিল। হিন্দুর ছেলেদের যেমন সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষক রাখিয়া শেখান হইত, তেমনি মুন্সী রাখিয়াও পার্শি ও উর্দ্দু শেখান হইত। আমার অভিভাবকগণ আমার জন্য মৌলবী রাখিয়া পার্শি ও উর্দ্দু শিখাইয়াছেন। বালকগণের কোমল প্রাণে, পার্শি শিক্ষকগণের উপদেশে, মুসলমানগণেব প্রতি হিন্দুগণের প্রাণ স্বভাবতই আকৃষ্ট হইত এবং পরস্পর এক প্রবল সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হইত।

আর এখন হিন্দুগণ পার্শি পড়েন না। মুসলমানগণের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এখনও আপামরসাধারণেব মধ্যে বিস্তারলাভ করে নাই। কেবল যাঁহারা ইংরেজি শিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভিতর অভিনিবদ্ধ রহিয়াছে। হিন্দুগণ যদি আবার কিছু কিছু পারসী ও উর্দ্দুর আলোচনা আরম্ভ করেন, আর মুসলমানগণ যদি আপামরসাধারণ বাংলাভাষা শিক্ষা করেন, তবে ত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের এক বিশেষ সুযোগ হইবে বলিয়া মনে হয়।

তখন হিন্দুগণ অনেকটা পোষাকে-পরিচ্ছদে মুসলমানগণের অনুকবণ করিত। জোব্বা, চাপকান তাহার নিদর্শন। ইহাতে দুই জাতির মধ্যে পার্থক্য অনেক কমাইয়া দিয়াছিল।

এখন হিন্দু ও মুসলমানগণ যদি যতদূর সম্ভব একরূপ পোষাকে ভূষিত হন, তবে আপনা হইতেই জাতীয় একতা আসিয়া পড়িবে। তাহা হইলে অনেকটা আমাদিগকে বিলাতি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিলাতি চাল-চলন ত্যাগ করিয়া সেকালের নবাবী চালে চলিতে হইবে। ইহাদ্বারা আপনা হইতেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা আসিয়া পড়িবে।

মুসলমান গ্রাজুয়েট্‌দের সঙ্গে হিন্দুদের কোনও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচালকদের পথে না গিয়া অনেকটা হিন্দুদের পথাবলম্বন করিতেছেন। বিদ্যালয়ে হিন্দুছাত্রের সঙ্গে অধ্যয়নই তাহার একমাত্র কারণ। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান মুসলমান যুবকগণের সহিত হিন্দু যুবকগণের কার্য্যক্ষেত্রেও খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইবে।

বর্ত্তমান মুসলমান যুবকদের মত বৃদ্ধদের সহিত সকল বিষয়ে ঐক্য নাই। অনেক সময় বৃদ্ধেরা মনে করেন, হিন্দুদের সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখাইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট

তাঁহাদের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন, কিন্তু যুবকগণ এই কথা মানেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তরে হিন্দু ও মুসলমান এক। আমি অনেক ধনাঢ্য হিন্দুপরিবার জানি যাঁহারা, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমানদের অনুগ্রহ পাইয়াছেন বলিয়া, এখনও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্গভাষার লেখকগণ যদি মহম্মদের এবং তাঁহার শিষ্যগণের চরিত্রের অংশবিশেষ লইয়া পুস্তকপ্রণয়ন করেন এবং সেই পুস্তক যদি হিন্দুবালকগণকে পড়ান হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং মুসলমানগণকে যদি রামায়ণের এবং অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের সুন্দর সুন্দর অংশ পড়াইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়, আমাদের মিলন অতি সহজেই ঘনীভূত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ হিন্দুগণকে কোরান পড়িতে হইবে, মুসলমানগণকে রামায়ণাদি পড়িতে হইবে।

এমন মুসলমান আছেন যাঁহারা সংস্কৃত বেশ জানেন এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থও পাঠ করেন। প্রোফেসর বিলগ্রামী একজন বেশ সংস্কৃতজ্ঞ। মৌলবী বিলায়েৎ হোসেন সংস্কৃত জানেন এবং হিন্দুশাস্ত্রেরও চর্চ্চা করেন।

কলিকাতায় সাধারণতঃ মুসলমানগণ এক অংশে বাস করেন, হিন্দুগণ এক অংশে বাস করেন, তাহাতে আপনা হইতেই একটা ব্যবধান আসিয়া পড়িতেছে। হিন্দু ও মুসলমান পাড়াগাঁয়ে একই গ্রামে পাশাপাশি বাস করেন। গ্রামের সুখদুঃখ উভয়েরই সমান। তাহাতে আপনা হইতেই উভয়ের মধ্যে একটা ভালবাসার আকর্ষণ জন্মিয়া যায়। যাহাকে প্রতিদিন দেখি, তাহার প্রতি একটী টান না হইয়া থাকিতে পারে না। কলিকাতার হিন্দুমুসলমানগণ যাহাতে এক পাড়ায় থাকেন, তাহার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্মের দিকে কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া জননী জন্মভূমির মন্দিরে আমরা হিন্দু ও মুসলমানগণ যাহাতে পরস্পর ভাই ভাই মিলিতে পারি, সমাজের নেতাগণকে তাহার উপায় নির্দ্ধারিণ করিতে হইবে। কতকগুলি জাতীয় উৎসব করিতে হইবে, যেমন আকবর-উৎসব, শিবাজী-উৎসব, তাহাতে হিন্দুমুসলমানের সমান অধিকার থাকিবে।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পর কাজের সহানুভূতি আছে, তাহা যদি জানা থাকে, তবে একে অন্যের নিকট আপনা হইতেই কাজের সাহায্যের জন্য আসিবেন। আলিপুর-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতায় হিন্দুদিগের সাহায্য প্রার্থনায় আসিয়াছিলেন। হিন্দুগণ স্কুলাদির জন্য অনেক সময় মুসলমান জমিদারদের নিকট চাঁদার খাতা হস্তে উপস্থিত হন, এ ঘটনা ত নিত্যই ঘটিতেছে। আলিগর-কলেজ

যদিও মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্থাপিত কিন্তু তবুও হিন্দুদের তথায় পড়িবার কোনও বাধা নাই। তথায় অনেক হিন্দু অধ্যাপক ও হিন্দুছাত্র রহিয়াছেন।

আমার সঙ্গে মুসলমানগণের খুব ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। তাহারাও আমাদিগকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে। আমি সময় সময় তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি। তাহারা আমাকে তাহাদের কাজে ডাকিয়াছে, তাহাদের অভাবাদির বিরুদ্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে, আমি যথাসাধ্য তাহাদের পরিতুষ্টি সাধনে চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান ভারতের দুই চক্ষ। উভয়ের উন্নতিতেই ভারতের মঙ্গল। তই পরস্পর ভাই ভাই মনে রাখিয়া যাহাতে উভয়ের মঙ্গল হইতে পারে তাহার জন্য সমবেত চেষ্টা করা উভয়েরই কর্ত্তব্য।

৩। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

"ভাণ্ডারে" যে প্রশ্নটি উঠিয়াছে, ঠিক এই প্রশ্ন রঙ্গপুর-মহিগঞ্জনিবাসী খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল মজিদ চৌধুরী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গত গুড্ ফ্রাইডের সময় ত্রিপুরা-লাকসামে যখন মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হয়, তখন আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলাম। খাঁ বাহাদুর সাহেবও প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর সাহেব এই প্রশ্ন লইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন আছেন। জাহাজে-রেলে সর্ব্বদা কেবল এই আলোচনা হইয়াছিল। আমি পরিষদের প্রতিনিধি— পরিষদের হিন্দুমুসলমান সভ্য আছেন, অথচ পরস্পরে মিলনের কোন চেষ্টা করেন না কেন, এই অনুযোগ হইতেই কথাটার বিস্তৃত আলোচনা হয়। কিসে মিলন হয় নির্দ্ধারিণ করিবার পূর্ব্বে, কেন হয় না, তাহা নির্দ্ধারিণ করিতে গিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা হিন্দুমুসলমান সকলেরই অনুধাবনযোগ্য। নর্ম্ম্যাল স্কুল, ছাত্রবৃত্তি স্কুল, মাইনর স্কুল ও এন্ট্র্যান্স স্কুল এবং কলেজে, বাঙ্গালায় এবং সংস্কৃতে, যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার মধ্যে হিন্দুমহত্ত্বের, হিন্দুগৌরবের এবং হিন্দুনীতির অনেক কথা মুসলমান যুবকেরা পড়িয়া হিন্দুর মহানুভবতা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারে, এবং সংস্কৃতশিক্ষার কৃপায় মুসলমানেরা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থেও অল্পবিস্তর প্রবেশলাভ করিতে পারে; কিন্তু মুসলমানের কি আছে, তাহা জানিবার কোন সুবিধা হিন্দুর হয় না। মুসলমানের গৌরবের ইতিহাস, মুসলমানের ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ, মুসলমান

সাধুসন্ন্যাসীর কথা, মুসলমানের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা, মুসলমানের মহত্ত্বের কথা, সমস্তই পারসী ও আরবীতে লিপিবদ্ধ। আরবী-পারসীর চর্চ্চা হিন্দুরা বিশেষতঃ বাঙ্গালী কেহই করেন না, কাজেই হিন্দুরা মুসলমানের গৌরব বা মহিমার কথা কিছুই জানেন না, কাজেই অজ্ঞতাবশতঃ চিরকুসংস্কারে পড়িয়া মুসলমানদিগকে "নেড়ে", "পাতিনেড়ে", দর্জ্জি, বাবুর্চ্চি, খানসামার জাত বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তক যাহা প্রণীত হয় তাহার গ্রন্থকারগণ হিন্দু, ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দু বা ইংরাজ, ইঁহারা স্ব স্ব শিক্ষিত বিদ্যার ভাণ্ডার হইতেই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করেন, কাজেই মুসলমানের কোন কথাই স্কুল কলেজেও শিখিবার সুবিধা নাই। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মকথা, দ্রৌপদীর সতীত্বের কথা, কর্ণের দানের কথা, পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে হিন্দুমুসলমান শিখিতে পারে, কিন্তু মুসলমানের ইতিহাসে ঐরূপ মহাত্মার বা মহিমার বিবরণের অভাব নাই, হিন্দুরা তাহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। হিন্দু বল্‌টিন্‌ জামীরে ডুবাল, জনফ্রেডারিক ওবালিন প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিতে বাধ্য হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইবার অবসর পান, কিন্তু খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির অপূর্ব্ব জীবনীর কোন কথা হিন্দুর মধ্যে প্রকাশ হয় নাই। হিন্দুরা যদি অল্প অল্প পারসী শিক্ষা করিতে প্রলুব্ধ হন, তাহা হইলে মুসলমানের আভ্যন্তরিক বিবরণ জ্ঞাত হইলে এতটা ঘৃণাবহন করিতে সমর্থ হইবেন না। কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পারসী না জানায় আমরা যে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়া থাকি, তাহার প্রমাণ আমাদের ইতিহাস-আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। ভাবত ও বাঙ্গালার ইতিহাস মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দ্বারা যেরূপে বিবৃত তাহার কিছু কিছু তথ্য সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়াতে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের ভুল কতকগুলি যে ধরা পড়িয়াছে, তাহা এক সিরাজউদ্দৌলার বিবরণ হইতেই প্রমাণিত হইবে।

এখন যদি মুসলমানেরা হিন্দুর পুরাণ প্রচারের ন্যায় মুসলমান-ইতিহাস আলোড়ন করিয়া মুসলমান সম্রাট, নবাব ও জমিদারগণ কর্ত্তৃক হিন্দুর উপকারার্থ কি কি আইন, কি কি বিধিব্যবস্থা হইয়াছিল, মুসলমান আমলে মুসলমান-রাজদ্বারে হিন্দুর কিরূপ প্রতিপত্তি ও আদর ছিল, হিন্দুর প্রতি বিশ্বাস ছিল, মুসলমানসম্রাটগণের সভায় হিন্দুপাণ্ডিত্যের কিরূপ আদর ছিল এবং মুসলমানজমীদার হিন্দুপ্রজার দেবস্থানাদি রক্ষার কি ব্যবস্থা করিতেন, দেবালয়, টোল, চতুষ্পাঠী রক্ষার জন্য কি ভাবে ভূসম্পত্তি দান করিতেন, তাহার বিবরণ (পারসী ও আরবী মূলসহ) প্রকাশ করিলে হিন্দু মুসলমানের কৃত উপকারস্মরণে লজ্জিত হইয়া কতকটা ঘৃণা পরিত্যাগ করিতে যে বাধ্য হইবেন না এমন মনে হয় না। পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান-মহত্ত্বের কথা

লিপিবদ্ধ হওয়াও খুব আবশ্যক। এ বিষয়ে মুসলমান লেখকগণের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

মুসলমান ম্লেচ্ছ— উহার ছায়া স্পর্শ করিলে হিন্দুর ধর্ম্মহানি ঘটে, এবং হিন্দু কাফের— উহার হিংসাই ধর্ম্ম— এই উভয়বিধ ভাব অনেক পরিমাণে কমে, যদি উভয়জাতি ধর্মের কোন একটি কার্য্যে একক্রিয় হয়। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মোদ্দেশে গোহত্যা ত্যাগ করিলে এবং মুসলমান হিন্দুর সহিত গোরক্ষায়-গোপালনে যোগ দিলে বোধ হয় সুফল ফলে। গোজাতি উভয়শ্রেণীর উপকারী। গো ভিন্ন অন্য জীবেও যখন কোরবাণি সুসিদ্ধ হয়, তখন গরুকে জাতীয় উন্নতির জন্য মুসলমানভ্রাতারা কোরবাণি হইতে বাদ দিলে ক্ষতি কি? এ সকল ধর্ম্মের সংশ্লিষ্ট কথা, হঠাৎ ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। ফলকথা, খৃষ্টানের সর্ব্বভক্ষিণী ক্ষুধা হইতে গোজাতিকে পরিত্রাণ করিবার জন্য হিন্দুমুসলমানের একত্র হওযা যে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। ঘৃতদুগ্ধের মহার্ঘতা গোজাতিব দ্রুত অন্তর্ধানের জন্যই যে হইতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

হিন্দুমুসলমানের মিলন আবশ্যক, এ কথাটা যে উভয়শ্রেণীর মধ্যেই জাগিয়াছে এই সুলক্ষণ। এখন দেশের মনীষিগণ উপায় চিন্তা করুন।

৪। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী

ভাণ্ডারের ২য় সংখ্যায় প্রশ্ন করা হইয়াছে, কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সুযোগ-অভাব লক্ষিত হয়, কি উপায়ে এই অভাব দূর হইতে পারে? এই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কলিকাতাতে হিন্দু-মুসলমানগণের মিলনের একবারেই সুযোগের অভাব, ইহা আমার মনে হয় না। পরন্তু কলিকাতায় যে আদৌ হিন্দু-মুসলমানে মিলন নাই ইহাও আমি স্বীকার করি না।

মুসলমানগণের প্রখর শাসন সময়েও ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একবারে অমিলন ছিল না। রাজপুতগণের সহিত মুসলমানগণের ভয়ানক বিরোধ হইত আবার আত্মীয়তাও হইত। তখন মুসলমানগণ শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এই শাসন ব্যাপারে তাঁহারা হিন্দুদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতেন। হিন্দুগণই মুসলমানদের রাজকার্য্যে প্রধান প্রধান পদ অধিকার করিতেন। মুসলমানগণের সেই শাসনগৌরবের সময়েই যখন হিন্দু-মুসলমানে একবারে

অমিলন ছিল না, এখনকার দিনে মিলনের পূর্ণ অভাব হওয়ার আদৌ তেমন বলবৎ কারণ দেখা যায় না। এখন ভারতবাসী বলিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিকেই বুঝায়। হিন্দু ও মুসলমান এক রাজার শাসনাধীন, একই বিধিব্যবস্থাতে উভয়জাতি শাসিত, একই ভাষায় উভয়জাতি মনোগত ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ হিন্দুস্থানে হিন্দুগণও যেমন হিন্দুস্থানী ভাষার ব্যবহার করেন, মুসলমানগণও সেই হিন্দুস্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানগণের একই ভাষা। বঙ্গীয় মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকেই মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গভাষাই বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় মুসলমানগণ বঙ্গভাষাতেই আলাপ করেন, বঙ্গভাষাতে লেখাপড়ার কার্য্য করেন— হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপায়ের মধ্যে ভাষার একত্বই এক প্রধান উপায়। কলিকাতায় এই উপায় যথেষ্টই আছে। এইরূপ উপায় আছে নিমিত্তই পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানগণ সাহিত্যচর্চ্চার ব্যপদেশে মিলনের একটা উৎকৃষ্ট উপায় করিতে পারেন। বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমানগণ এখন বঙ্গভাষায় কয়েকখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল পত্রে মুসলমান ও হিন্দুগণ একযোগে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ইহা আমার নিকট অতীব শুভলক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে। সভাসমিতিতেও হিন্দু ও মুসলমানগণ সমপ্রাণে সমভাবে কার্য্য করিতেছেন। এই মিলনের প্রসার-পরিধি আরও বিস্তৃত করিতে হইলে, হিন্দুমুসলমানগণের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতিবর্দ্ধনার্থ সভাসমিতি সংস্থাপন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারা যায়।

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মিলনের সুযোগ সৃষ্টি করার আরও একটি প্রধান উপায় আছে। সে উপায়— প্রীতির আকর্ষণ। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিরোধবিসংবাদের প্রচুরতর প্রবল কারণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রেমের মহামন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানের চিরাগত বিরোধ অনেক পরিমাণে প্রশমিত করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে মিলনের ও সদ্ভাবের এক মহাবীজ রোপন করিয়াছিলেন।

নদীয়ার শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজি হিন্দুদের আচার ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, মানুষ যেরূপই হউক, মানুষ কখনও ঘৃণার পাত্র হইতে পারে না। মানুষমাত্রেই প্রীতির ভাজন— এমন কি,

শ্রদ্ধার ভাজন। মানুষের হৃদয়ে শ্রীভগবানেরই অধিষ্ঠান কোথাও সুপ্রকাশ, কোথাও অপ্রকাশ। গৌড়ের বাদসাহ হোসেন খাঁ শ্রীগৌরাঙ্গের সন্দর্শন লাভ করিতে অধীর হইয়াছিলেন, বিজনী খাঁ প্রভৃতি পাঠানসৈন্যগণ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "পাঠান-গৌরাঙ্গ"। সেই সময়ের হরিসঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যে অভিন্নহৃদয়িক প্রেমালিঙ্গন পরিলক্ষিত হইত, জগতে তাদৃশ দৃশ্য বস্তুতঃ সুদুর্ল্লভ। অথচ তখনও সমাজে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ জাতিভেদ মানিয়া চলিতেন। কিন্তু পারমার্থিক হিসাবে অভেদজ্ঞানে হিন্দুর হৃদয় হইতে মুসলমানের হৃদয়ে, মুসলমানের হৃদয় হইতে হিন্দুর হৃদয়ে প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত হইবে। মুসলমানদের সহিত এক পাত্রে ভোজন না করিলেই যে মিলনের ব্যাঘাত হইবে এবং এক পংক্তিতে আহার করিলেই যে মিলনের পথ প্রসরতর হইয়া উঠিবে, এ যুক্তি কার্য্যকর নয়। তাহা হইলে জগতে স্বজাতীয়দের মধ্যে বিবাদ থাকিত না, ঘরে ঘরে ঘরাও-বিবাদেও দেশ অধঃপাতে যাইত না।

হিন্দুবা যদি মনে প্রাণে মুসলমানদিগকে ভালবাসিতে পারেন, মুসলমানেরাও যদি হিন্দুদের মনে আঘাত না দিয়া, হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত না করিয়া— হিন্দুদের পূজ্যস্থানীয় গোজাতি হত্যাদি না করিয়া, হিন্দু প্রতিবাসীর হৃদয়ের দিকে চাহিয়া বিপদে-সুপদে হিন্দুদের সহিত মিলিতে চেষ্টা করিতে শিক্ষা পান, তাহা হইলেই মিলনের সুব্যবস্থা হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত কবা যাইতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানগণের পরিচালিত সংবাদপত্রদ্বারা এই সদ্ভাবশিক্ষার বীজ চারিদিকে বিস্তৃত করা যাইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে এই কার্য্যসাধনের উপায় হইতে পারে।

মুসলমানভ্রাতৃবৃন্দের একটা কার্য্যে হিন্দুগণের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগে। সে কার্য্যটি গোহত্যা। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে গোমাংস স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণের সুসিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়তঃ, গোজাতি আমাদের পরমউপকারী, উহাদের হত্যা করা অসঙ্গত। তৃতীয়তঃ, মূল্যবান গোহত্যা করিয়া রসনার পরিতৃপ্তিসাধন অর্থনীতিরও বিরুদ্ধ। চতুর্থতঃ, যাহাতে হিন্দুভ্রাতৃগণের হৃদয়ে অসহনীয় যাতনার উদ্রেক হয় সামাজিক কর্ত্তব্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও সেরূপ কার্য্য করা বৈধ নহে। মুসলমানভ্রাতৃগণ যদি এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন, তবে হিন্দু-মুসলমানগণের

অনেক বিবাদের মূলোচ্ছেদ হয়। মুসলমানভ্রাতৃবৃন্দ সম্রাট আকবরের কোন কোন দুর্নীতি [সুনীতি] অনুসরণ করিয়া বসিলে হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে সদ্ভাবসংস্থাপনের প্রচুর সুবিধা হইতে পারে। আবার অপরপক্ষে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানভ্রাতৃবৃন্দের ধর্ম্ম লইয়া কোন প্রকার উপহাস বা বিদ্রূপাদি করিলে সমাজের উচ্চপদস্থ হিন্দুগণের তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের উপযুক্ত শাসন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ে তীব্র লক্ষ্য রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিলে এখনকার দিনে কুত্রাপি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অসদ্ভাবেব সৃষ্টি হইতে পাবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

ভান্ডার ।। শ্রাবণ ১৩১২

উপরনীচের মিলনকথা

বৈশাখের 'ভাণ্ডারে' এই প্রশ্নটা ছিল—'আজ কালকার পব্লিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত সাধারণের যোগ রক্ষার উপায় কি'?

'রক্ষা'—এই শব্দের পরিবর্তে 'স্থাপনের' এই শব্দটী থাকিলেই ঠিক হইত। কারণ, যোগ এখন নাই। বিপিন বাবুও এই কথা বলিয়াছেন।

প্রায় সকল উত্তরদাতাই 'পব্‌লিক উদ্যোগ' বলিতে রাজনৈতিক আন্দোলন বুঝিয়াছেন। বুঝিবার কারণও আছে। আমরা শিক্ষাসম্বন্ধে আন্দোলন করি না, দরিদ্রের কবভারসম্বন্ধে আন্দোলন কবি না, রোগপীড়াসম্বন্ধে আন্দোলন করি না, চাষবাসসম্বন্ধে আন্দোলন করি না, পানীয় জল সম্বন্ধে আন্দোলন করি না, মোটামুটি বলিতে গেলে, কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন করি।

বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং বাবু আশুতোষ চৌধুরী বলেন যে, নীচের লোকদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়ান ভাল নয়। আমিও সেই কথা বলি। আশুবাবু ঠিকই বলিয়াছেন যে, উপরের লোকে যাহার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন করেন, নীচের লোকের তাহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই। ইহা ছাড়া আমি এইরূপ মনে করি যে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে যাহাদের এক মুঠা অন্নের উপায় হয় না, আন্দোলনমাত্রই তাহাদের অনিষ্টকর হইবার সম্ভাবনা, কোন আন্দোলনেই তাহাদিগকে জড়াইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহারা এখনকার মত খাটিতেই থাকুক। তাহাতে তাহাদেরও সুখ-সুবিধা, উপরের লোকদেরও সুখ-সুবিধা। শ্রমজীবীকে সভাসমিতিতে আনিয়া আন্দোলনে মাতাইতে নাই, হুজুগে করিতে নাই। করিলে ঘোর বিপদ ঘটিবে, রাজা এবং প্রজা, উভয়েরই।

উপরের লোকদের রাজনৈতিক আন্দোলনসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহাদেরও উহাতে অনিষ্ট হইতেছে, সুতরাং উহা বন্ধ হইলেই আমাদের মঙ্গল। তাঁহারা এই মনে করিয়া আন্দোলন করেন যে, আমরা ইংরেজের সমান, অতএব ইংরাজের সমস্ত অধিকার আমাদের প্রাপ্য। ইংরাজের আইনে, বক্তৃতায় এবং কাগজপত্রে এইরূপই বটে। কিন্তু কাজে যে অনেক স্থলে ইহার বিপরীত এবং চিরকাল

বিপরীতই থাকিবে, নিশ্চয়ই তাঁহারা এত বোকা নহেন যে, তাহা বুঝেন না। তবে কেন কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া ইংরাজকে চটাইয়া নিজেরই অনিষ্টসাধন করেন? ইংরাজ যে চটিতেছেন এবং চটিয়া শাসনরজ্জু বড় বেশী কসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ত সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন; তবে কেন তাঁহারা আপনারাই আপনাদের অনিষ্ট করিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। আমি ইহার একটা কারণ অনুমান করি। রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহাদের একটা নেশার মত হইয়াছে। তাঁহারা নেশার ঝোঁকে শুধু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নয়, একরকম দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ নেশা দেখিলেই ভয় হয়, ভিতরে কোথাও একটা মারাত্মক দোষ বা দুর্ব্বলতা আছে। তাই বলি, উপরের লোকেদের পক্ষেও রাজনৈতিক আন্দোলন ভাল নয়। তবে রাজা অন্যায় করিলে প্রজা কি কিছুই করিবেন না? করিবেন, কিন্তু এখন যেমন বিরাট সভায় বড় বড় বক্তৃতায় কড়া কড়া কথা এবং বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ শুনাইয়া থাকেন, তেমন শুনাইবেন না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ানসভা আগে যেমন স্থির-ধীর-গম্ভীর-ভাবে এবং একরূপ নীরবে রাজার সহিত কথা কহিতেন, তেমনই করিয়া কথা কহিবেন। তাহা হইলে রাজা পূর্ব্বে যেমন প্রজার অনেক কথা শুনিতেন, পুনরায় তেমনই শুনিবেন—পূর্ব্বে যেমন অনেক স্থলে প্রজার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন, পুনবায় তেমনই করিবেন। তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া উপরের লোকেরা আপনাদের কার্য্যক্ষেত্র বদ্‌লাইয়া ফেলুন—যে সকল কার্য্যে, কি তাঁহাদের কি নীচের লোকেদের, সকল লোকেরই চিরদিনের মঙ্গল, নীচের লোকেদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাতেই নিযুক্ত হউন। বড় আশা ও আহ্লাদের কথা, আশুতোষ বাবু এবং আরও কেহ কেহ যেন এইরূপই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইদানীং যে প্রণালীতে রাজনৈতিক আন্দোলন করা হইতেছে, তাহা যে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এমন আশাও করি না, এমন সম্ভাবনাও নাই, অতএব এরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনসম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সেই কথাটী মনে রাখিয়া এরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন করিলে বোধ হয় উহা এখনকার ন্যায় একেবারে নিষ্ফল হইবে না। জ্যামিতিশাস্ত্রে কতকগুলি axiom বা স্বতঃসিদ্ধ কথা আছে। আমরা বিজিত বাঙ্গালী প্রজা। বিজেতা ইংরেজ আমাদের রাজা। বিজিত যতই দুর্ব্বল হউক, বিজেতাকে তাহাকে অল্পবিস্তর ভয় করিতেই হয়। আর স্বজাতীয়ের প্রতি স্বভাবতঃ সকলেরই টান কিছু বেশী হয়। অতএব রাজনীতি-

ক্ষেত্রে জ্যামিতির axiomএর ন্যায় গুটিকতক axiom করিয়া রাখা আমাদের যেমন আবশ্যক তেমনই শ্রেয়। Axiomগুলি এইরূপ ঃ—

১। একই রাজার প্রজা বলিয়া আমরা ইংরেজের সমান নহি। সুতরাং

২। আমরা ইংরাজের সকল অধিকারে অধিকারী নহি। এবং

৩। ইংরাজের আব্দার করিবার অধিকার আছে, আমাদের নাই।

৪। ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত দেশীয় সভ্য চিরকাল হীনবল থাকিবে।

৫। ব্যবস্থাপক সভায় নবপ্রবর্ত্তিত প্রশ্নপ্রণালী দেশীয়ের পক্ষে কখনই তেমন ফলপ্রদ হইবে না।

৬। কোন বিভাগেই উচ্চতর রাজকার্য্যে দেশীয়ের নিয়োগ কখনই ইউরোপীয়ের নিয়োগের সমান হইবে না।

৭। শাসনবিভাগেব শক্তি ও অধিকার বাড়িতে থাকিবে।

৮। শাসন ও বিচারকার্য্যের পার্থক্য কখনই সাধিত হইবে না।

এই সকল axiom মনে রাখিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিলে দুই একটা রাজনৈতিক সমস্যার সুমীমাংসা হইবারই সম্ভাবনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক কিনা।

উত্তর

১। শ্রীযুক্তা জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত

আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছে? আমি তো দেখি যে যেমন বালকদিগকে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকিতে হয়, বালিকাগণ সম্বন্ধেও সচরাচর সেই ব্যবস্থা। এই স্ত্রীশিক্ষা দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমশ্রেণী— যাঁহারা দুই তিন চার বৎসর অর্থাৎ বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত নিম্ন-প্রাইমারী বা উচ্চ-প্রাইমারী পর্য্যন্ত পাঠ করেন; দ্বিতীয় শ্রেণী— যাঁহারা এন্ট্রান্স পাশ করিতে ও এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলেজে পড়িতে ইচ্ছা করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না।

প্রথম শ্রেণীর স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। বালকদের মত বালিকাগণকেও যে, প্রায় প্রতিদিনই এগারটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠ অভ্যাস করিতে যাইতে হইবে এটা আমার কাছে বড় ভাল ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয় না। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, আমি সে সময়ে একটি ক্ষুদ্র সহরের সদর মডেল ইস্কুলে পড়িতাম। আমাদের ইস্কুলের সময় ছিল এগারটা হইতে চারটা, আর সকাল সাড়ে ছয়টা কি সাতটা হইতে ঐ বাংলা স্কুল গৃহেই বালিকা বিদ্যালয় বসিত, ইস্কুল হইত নয়টা কি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত। এখন সে নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বালিকাগণকে বালকদের ন্যায় এগারটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত ইস্কুলে বদ্ধ থাকিতে হয়। পুরুষের যে যে বিষয় শিক্ষা আবশ্যক, স্ত্রীলোকগণের পক্ষেও যদি ঠিক তাই হইত, তাহা হইলে এ ব্যবস্থায় আপত্তির কোন কারণ ছিল না। আমার বোধ হয় কেহই একথা বলিবেন না যে, সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণের সমকক্ষ, অতএব বালকগণের শিক্ষার যে ব্যবস্থা, বালিকাগণের শিক্ষার অবিকল সেইরকম ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। সন্তানপালন ও ঘরকন্নার শৃঙ্খলাবিধান

করা স্ত্রীলোকদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ যেরূপ ধনশূন্য, তাহাতে আমাদের দেশের সকল স্ত্রীলোকেরই গৃহকর্ম্মে অর্থাৎ রন্ধনাদি বিষয়ে বিশেষ পটু হওয়া দরকার। এবিষয়ে পূর্ব্বেকার স্ত্রীলোকেরা ভাল, যদিও তাঁরা— যাকে বলে লেখা-পড়া তাহা তেমন জানিতেন না। এখন শিক্ষা মানে লোকে বুঝে লিখিতে ও পড়িতে জানা। এখনকার ইস্কুলের ফেরত অনেক বালিকারই রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্ম্মে তেমন পটুতা কি আগ্রহ দেখা যায় না। মেয়েদের ইস্কুলে আজকাল, সেলাই, চিত্রকার্য্য ও রন্ধন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ শিল্প বরং কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, কিন্তু রন্ধনাদি বিষয়সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যালাভ করিলেও তাহা কাজে লাগাইতে সক্ষম হন না।

এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিলে শিখিতে পারা যায় না। হাতে-কলমে করা চাই। তার বড় রকমের নাম টেক্‌নিকেল এডুকেশন। স্ত্রীলোকদিগকে সন্তানপালন, রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য করিতে হয়, এই সকল কাজগুলি কেবলমাত্র পুঁথিতে পড়িলে শিক্ষা হয় না। যাঁহারা ঐ সকল কাজ করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শিখিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছোট ছোট মেয়েরা যদি সকাল হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বালকদের মত, ইস্কুলের পড়া তৈয়ার করে, তারপর ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সেই পঠিত বিদ্যার পরীক্ষা দেয়, তাহা হইলে বাড়িতে ঐ সকল কাজ দেখিবার অবসর কতটুকু থাকে? তার পর দেখুন, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা প্রায়ই বেশী চাকর-চাকরাণী রাখিতে পারেন না, তাঁহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকেই গৃহস্থালীর অনেক কাজ স্বহস্তে করিতে হয়। এমন অবস্থায় বাড়ির ৯/১০ বৎসর বয়সের মেয়েগুলি যদি তাদের মা, খুড়ীমা অথবা পিসিমাদের ছোট খাটো ফায়-ফরমাস খাটিয়া, খোকাখুকীকে দুধ খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, তাঁদের সাহায্য না করিয়া, সকাল হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ইস্কুলের পড়া তৈয়ার করিতে থাকে, তারপর ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ইস্কুলে কাটায়, তাহা হইলে প্রৌঢ়া গৃহিণীদিগকে কিরকম মুস্কিলে পড়িতে হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তার উপর যদি বাড়ির মেয়ে মিশনারীদের ইস্কুলে পড়ে তো সে সোনায় সোহাগা! সে তার ঠাকুরমাকে শিবপূজা করিতে দেখিয়া বলিবে ওমা সেকি! মাটির পুতুল কি পূজা করিতে আছে, উহা পাপ! তা ছাড়া, আনুমানিক ধর্ম্মের সম্পর্কমাত্রশূন্য শিক্ষা অধিকতর ভাবপ্রবণ বালিকাগণের পক্ষে কতদূর উপযোগী তাহাও ভাবিবার বিষয়।

বালকদের মত এগারটা চারটে পর্য্যন্ত ইস্কুলে পড়িয়া বালিকারা নারী-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারে বলিয়া আমার বোধ হয়

না। তবে যিনি যত বেশীদূর পর্য্যন্ত ইস্কুলে পড়েন, তিনি তত বেশী তাত্ত্বিক (theoriser) হইয়া পড়েন। এই এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের পক্ষেও অতিশয় ক্ষতিকর। পুরুষ দায়ে পড়িয়া অন্নের সংস্থানের জন্য, ভাত খাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেহ বা ইস্কুলে কেহ বা অফিসে দৌড়ান; কিন্তু স্ত্রীলোকদের পক্ষে এ "সাদের কাজলের" ব্যবস্থা কেন করা হয় বুঝিতে পারা যায় না।

বালিকারা বালকদের মত এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িয়া শিক্ষালাভ করিলে গৃহকার্য্য কিছুই শিখিতে পারে না। পড়িয়া পড়িয়া তাহারা অলস হইয়া পড়ে এবং ভাত খাওয়ার পরই মানসিক পরিশ্রমের জন্য তাদের স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া যায়। এই সকল কারণে বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া কর্ত্তব্য। বালকদের মত প্রায় প্রত্যহ ইস্কুলে যাওয়া ছাড়া বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার আর একটি ত্রুটি দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের পাঠের উপযোগী তেমন পুস্তক একরকম নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে যে সকল পবিত্র উপাখ্যান বর্ণিত আছে, সেই সকল উপাখ্যান স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী করিয়া এ পর্য্যন্ত প্রচার করা হইয়া উঠে নাই। বালকদের মত বালিকাগণকেও সাপ ব্যাঙ্ ও নেলসেনের গল্পই পড়িতে হয়।

এরূপ অবস্থায় বালিকাগণের পিতা বা ভ্রাতাদের কর্ত্তব্য তাঁহাদের দুহিতা বা ভগিনীদের লেখা পড়া শিক্ষার ভার নিজের হাতে লওয়া। ইহাতে লেখা পড়াও শিক্ষা হইবে, গৃহকার্য্য শিক্ষারও ব্যাখাত জন্মিবে না। যদি নেহায়িতই ইস্কুল যাইতে হয়, তাহা হইলেও যেন মাসে তিন দিনের বেশী না হয় এবং শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যেন বেশ উপযুক্ত হন।

২। শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী

বেথুনস্কুলে বালিকাদিগের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে— হিন্দু বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বোর্ডিং একান্ত আবশ্যক; সেখানে হিন্দুমতে থাকার ব্যবস্থা থাকিবে; কেবল হিন্দু বালিকারাই থাকিবে।

বেথুন স্কুলে যে প্রণালীতে বালিকাদের শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, আমি তাহার ভাল মন্দের আলোচনা করিতেছি না— সে যেমন চলিতেছে চলুক— যাঁহারা নিজ নিজ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দান করিতে চান, তাঁহাদের পথ প্রশস্তই আছে— আমি হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

দেখা যায়, সাধারণ হিন্দু বালিকাগণ ১২/১৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিবাহিতা হয়। ৬/৭ বৎসর বয়সের কম আর কোন বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয় না— তাহা হইলে হিসাব মত সাধারণ হিন্দু বালিকারা বড় জোর ৫ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। পাঁচ বৎসরে প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিক্ষা পাইয়া তাহারা কতটুকু জ্ঞানলাভ করে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মাঝে হইতে বালিকারা ঘরকন্নার কায শিক্ষা করিবার অবসর হারায়।

হিন্দু বালিকাদের জন্য বেথুন বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র একটি বাসস্থান ও হিন্দু আচারে আহারাদির ব্যবস্থামাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, বাস্তবিক হিন্দু-বালিকাদেব উন্নতি হইবে না— বরং বারমাস স্কুলের রাঁধা ভাত খাইয়া মেয়েরা ঘরের কাযকর্ম্মে একেবারে অপটু হইবে, অলসতাও প্রশ্রয় পাইতে থাকিবে। কে কুট্‌নো কোটে, কে বাট্‌না বাটে, কে ভাঁড়ার দেয়, কে জলখাবার গোছায়, তাহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিবে না— আহারের সময় সমস্ত প্রস্তুত হাতের কাছে পাইবে— কোন চিন্তা নাই! ঘরকন্নার কায "হাতে-কলমের" কায। পাঁচখানা 'স্বাস্থ্যরক্ষা' ও দশখানা 'পাকপ্রণালী' পড়াইলেও কিছু হইবে না। অতএব বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুবালিকাদের হাতে কলমে ঘরের কায শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

যে সকল হিন্দু বালিকার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নাই, তাহাদের বাঙ্‌লাভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, শুভঙ্করী মতে অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষাদান করিলে তাহারা সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে পারে। আজকালকার বাজারে ইংরাজী ভাষা একটু জানা থাকা আবশ্যক, অতএব ইংরাজী ভাষা শেখান হোক;

অঙ্ক ইত্যাদি ইংরাজীতে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই। শরীরতত্ত্ব ও অল্প স্বল্প চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত; তাহা হইলে ছেলেপিলে আছাড় খাইয়া হাত-পা ভাঙ্গিলে অথবা রক্তপাত করিলে বা পুড়িয়া যাইলে "বাবা গো, মা গো, কি হল গো, কি সর্ব্বনাশ হল গো, গোপাল কেন অমন করে, ডাক্তার ডাক গো" বলিয়া চেঁচামিচি না করিয়া, স্ত্রীলোকেরা ধীরভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া অথবা ঔষধ লেপন করিয়া, তখনকার মত যথাকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। সেলাই শিক্ষার বন্দোবস্ত ত থাকিবেই। সেলাই শিক্ষার প্রচলন অধিকতর না হওয়াতে আমাদের দেশে, গৃহস্থের ইদানীং ভাত খরচ অপেক্ষা দর্জ্জির খরচ বেশী লাগিতেছে।

তারপর বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঘরকন্নার কায শিক্ষা দিবার সহজ উপায় এই যে, হিন্দুবালিকাদের প্রতি তাহাদের বোর্ডিংএর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা। একজন সুগৃহিণী ধীরপ্রকৃতি মহিলার অধীনে বালিকারা বোর্ডিংএর কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। যেমন বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মহিলারা পালা করিয়া গৃহস্থালীর কায সম্পন্ন করেন, তেমনি করিয়া বোর্ডিংএর কর্ত্রীর সহিত নিজেদের দৈনিক কায করিতে করিতে বালিকারা অতি সহজেই ঘরের কাযে সুনিপুণ হইবে। শিশুকাল হইতে পরস্পরে পরস্পরকে যত্ন সেবা করিতে করিতে সেবা-যত্নের ইচ্ছা ও অভ্যাস দৃঢ়রূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে। আমি জানি, পল্লীগ্রামের ৭/৮ বৎসরের বালিকারা মাতার দক্ষিণহস্ত। মা আঁতুড়ঘরে গেলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকারা কেমন যত্ন করিয়া কনিষ্ঠের লালন-পালন করে, পিতার সেবা করে, মাতার শুশ্রূষা করে— ঘর নিকায়, জল তোলে। বিদ্যালয়ে থাকিলে "দায়ে পড়ে" এসব কাজ শিখিবার ত অবসর হয় না; সুতরাং বোর্ডিংএর ভার বালিকাদের দেওয়া উচিত। রোগে শুশ্রূষা, গৃহমার্জ্জনা, বিছানা করা, আলো সাজান, ভাঁড়ার দেওয়া, তরকারী ও মাছ কোটা, বাট্‌না বাটা, জলখাবার গোছান, লুচি-রুটির ময়দা মাখা ও বেলা, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা, রন্ধন ও পরিবেশনে সক্ষম হওয়া, প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন— 'আমার মেয়েকে জন্মেও হাতা বেড়ী ধরতে হবে না, নাই বা শিখ্‌লে ঘরেব কায!' ধনি-কন্যাদের নিজ হাতে ঘরের কোন কায করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও সকল কাযে ভালরকম অভিজ্ঞতা না থাকিলে দাস-দাসীদের পরিচালন করিবার ক্ষমতারও অভাব হয়। সকলেই জানেন যে, নূতন দাস-দাসী লইয়া কি প্রকার বিব্রত হইতে হয়। নিজেরা সকল কাযে পারক না হইলে, তাহাদের শিক্ষা দিবেন কেমন করিয়া? অতএব সর্ব্বদা দাস-দাসীদের অধীন হইয়া থাকিতে হয়; সদাই ভয় হয়, গোলাপী ছেড়ে গেলে চল্‌বে কেমন করে— বিষণ ঠাকুর বাড়ী

গেলে ত সপরিবারে উপবাস করতে হবে! দাস-দাসীরাও সে ভাবটা বিলক্ষণ বোঝে এবং নানা প্রকারে নিজেদের দর বাড়াইয়া গৃহে অশান্তি উৎপাদন করে। লালন-পালনের ভার মেয়েদের স্বাভাবিক। মাতৃহারা অভিভাবিকাহীন শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, আপনা হইতেই ক্ষুদ্র বালিকা মাতার অভাব পূর্ণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। খেলাঘর পাতিয়া ধুলার ভাত, ইঁটের চচ্চড়ি রাঁধিতে বালিকারা ভালবাসে। ঐ খেলাঘরের পারিপাট্য সাধন করিতে করিতে গৃহিণীপণায় তাহারা সিদ্ধহস্ত হয়; কিন্তু বিদ্যালয়ে বাস করিতে হইলে, অথবা দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতে হইলে 'হাতে-কলমে' ঘরের কায শিক্ষার অভাবে স্বভাবতই ঘরের কাযে অপটু হইয়া পড়ে। তখন অনভ্যাসবশত আগুন-তাতে মাথা ধরে, বাটনা বাটিতে গিয়া নোড়া আয়ত্ত করিতে পারে না, এক ঘটী জল গড়াইতে গিয়া দুইঘটী ফেলিয়া দিয়া শ্বাশুড়ী-ননদের গঞ্জনার পাত্রী হয়।

অনেকের বিশ্বাস যে, যে রকম দিনকাল পড়িয়াছে, বরের দর যেরূপ 'হু হু' করিয়া চড়িয়া যাইতেছে, অনটনে ঘরকন্না যে রকম অশান্তির আকর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ২৫/৩০ বৎসর পরে আর কেহ কন্যাদায় হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারিবেন না, সুতরাং হিন্দুবালিকাদের বিদ্যাবতী করা নিতান্তই দরকার। বিবাহ দেওয়া যখন আয়াসসাধ্য হইতে চলিল, তখন বালিকাদের উচ্চশিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবনোপায় করিয়া দেওয়া পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। তাঁহারা হয়ত বলিতে পারেন যে, বিদ্যালয়ে গৃহস্থালীকায শিক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই; লেখাপড়া শিখুক, মেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা যাহাতে নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার উপায় হোক।

হিন্দুবালিকারাও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, ইহা যদি বিদ্যাশিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়— তবু এমন কেহ বলিতে পারেন না যে, বালিকারা কোন কালেও বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে না; সুতরাং সব হিসাবেই দেখা যায় যে, বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার সহিত গৃহস্থালীকাযে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলাও অবশ্যকর্ত্তব্য— তাহাতে গৃহের মঙ্গল— তাহাতে সমাজের মঙ্গল।

পল্লীগ্রামের কোন পাড়ায় যদি একজন সহৃদয় মহিলা থাকেন, তবে সে পাড়ার প্রত্যেক গৃহস্থের সুখেদুঃখে বিপদেসম্পদে, তিনিই সর্ব্বাগ্রে বুক দিয়া পড়েন। পাড়ার সকলেরই তিনি মাতৃস্থানীয়া। আমার পুত্রকে আমি যেমন স্নেহ করিব, অবশ্য সকলকে তেমনি স্নেহ করিতে পারিব না, কিন্তু ধনী দরিদ্র, আত্মীয় পর,

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে যত্ন করা যাইতে পারে। যাঁহারা অতিথি অভ্যাগত, আশ্রিত অনুগত, আত্মীয় পর, দাস দাসী সকলকে সমানভাবে যত্ন করেন— তাঁহারাই আদর্শগৃহিণী। বালিকাগণ সুশিক্ষিতা হইয়া আদর্শগৃহিণী হইলে সকল দিকে মঙ্গল।

আমাদের দেশের সাধারণের যেমন ধারণা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদেরও বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, তেমনি আবার ইহাও দেখা যায় যে, শিক্ষিতা মেয়েদের উপর সাধারণে তেমন সন্তুষ্টও নহেন। বোধহয়, আজকাল যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা ঠিক সাধারণের উপযোগী নহে। বেথুনের হিন্দু বোর্ডিংএ যদি সর্ব্বপ্রকারে হিন্দু বালিকার উন্নতির ব্যবস্থা হয়, তবে সুশিক্ষিত স্ত্রীলোকের উপর সাধারণের অধিকতর শ্রদ্ধার উদয় হইবে— অসন্তুষ্টভাব দূর হইবে— আর হিন্দু মহিলারা আবশ্যকমত কেরাণীগিরিও করিতে পারিবেন, আবার সুশৃঙ্খলে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া গৃহসংসার শান্তিময় করিয়া রাখিবেন।

স্ত্রীলোকের হৃদয়ে স্নেহ দয়া মায়া প্রভৃতির গভীরতা যেমন অধিক— প্রসারতা তেমন নহে। কোন দিন যদি বাছার ঝোলের দুখানা মাছের এক খানা মাছ অপর কাহাকেও ভাগ দিতে হয়, অমনি মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে 'আহা বাছা আজ আমার উপস্ করে রহিল।' সুশিক্ষায় এই সকল সঙ্কীর্ণভাব যখন দুর হইয়া যাইবে, যখন নারী-হৃদয়ে স্নেহের গভীরতার সহিত উদারতার মিলন হইবে, অলসতা দূর হইয়া পরিপাটি কার্য্যকুশলতায় গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা বিরাজ করিবে— তখন সকলে হাতে হাতে স্ত্রীশিক্ষার সুফল ভোগ করিবেন— গৃহসংসার মধুময় হইবে— সমাজের মঙ্গল হইবে।

কন্যার উদ্দেশ্যে কবি গাহিয়াছেন—

'কভু না বাসনা করি হও তুমি রাজ্যেশ্বরী
সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ
উদাব উন্নত প্রাণে চাহিবে সংসার পানে
এই শিক্ষা হোক্—মনে সাধ।'

ভাণ্ডার ।। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২

বান

(সারিগানের সুর)

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।।

ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি
প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি,
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।।

দিনে দিনে বাড়ল দেনা,
ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাইরে কড়া কড়ি।

ঘাটে বাঁধা দিন গেলরে
মুখ দেখাবি কেমন করে,—
ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে
যাহয় হবে বাঁচি মরি।।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একা

(বাউলের সুর)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে এক্‌লা চলরে!
এক্‌লা চল, এক্‌লা চল,
এক্‌লা চলরে!
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়,
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
এক্‌লা বলরে!
যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা,
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
এক্‌লা দলরে!
যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে
এক্‌লা জ্বলরে!
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে!
এক্‌লা চল, এক্‌লা চল
এক্‌লা চলরে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গব্যবচ্ছেদ

বঙ্গব্যবচ্ছেদের উপলক্ষ্যে আমরা আজকাল বিলাতি জিনিষ ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সংকল্পটি দেখিতে দেখিতে যেন আগুনের মত সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

অথচ বঙ্গব্যবচ্ছেদে আমাদের স্বার্থহানি যে কি ঘটাইতে পারে, সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অতি অল্পলোকেই তাহার পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন।

বস্তুত এই বঙ্গব্যবচ্ছেদে আমাদের যে স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। কারণ ইহা মোটা কথা নহে, ইহাতে অন্নবস্ত্র লইয়া টানাটানি নাই, প্রজাসাধারণে আজও যে ভিটায় আছে কালও সেই ভিটাতেই থাকিবে। বস্তুত ইহাতে আমাদের একমাত্র যথার্থ অনিষ্ট এই যে, সমস্ত বাংলাদেশ এক শাসনাধীনে থাকিলে বাঙালির অন্তঃকরণে যে একটা ঐক্যের অনুভূতি জাগ্রত থাকে, নানাকারণে বাঙালির একত্রে মিলিবার যে বহুতর উপলক্ষ ঘটে, তাহা নষ্ট হইলে আমরা ভিতরে ভিতরে যে বল-লাভের পথে চলিতেছিলাম, তাহাতে বাধা পড়িবে।

সমস্ত বাংলাদেশ এক শাসনাধীনে ছিল বলিযাই কলিকাতা শহর বাংলাদেশের মর্ম্মস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার প্রত্যেক জিলা হইতে প্রত্যেক গ্রাম হইতেই শিক্ষা, বাণিজ্য, বিচার, বিলাসভোগ প্রভৃতি নানা সূত্রে কলিকাতায় অহরহ জনসমাগম হইতেছিল। এই কারণে এই কলিকাতায় সমস্ত বাংলাদেশের হৃদয় গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতা সমস্ত বাংলাদেশের জন্য চিন্তা করিতেছিল, বেদনা বোধ করিতেছিল, সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ খাড়া করিয়া তুলিতেছিল। কলিকাতার ভাষা কোনো বিশেষ জেলার ভাষা নহে— তাহা সমস্ত বাংলাদেশের ভাষা, কলিকাতার রীতিপ্রকৃতি কোন বিশেষ জেলার রীতিপ্রকৃতি নহে— তাহা সমস্ত বাংলাদেশের রীতিপ্রকৃতি। কলিকাতায় বাংলার অংশ-প্রত্যংশগুলি আপনাদের সকল প্রকারে প্রাদেশিক পার্থক্য মিলাইয়া দিয়া একটি সম্পূর্ণ বিশ্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। এইরূপে এক বিপুল হৃৎপিণ্ডের সহিত বাংলাদেশের সমস্ত রক্তবহা নাড়ির যোগসাধন হওয়াতেই এক প্রাণে বাংলার সমস্ত বৃহৎ কলেবর সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল— অক্লান্ত-জাগ্রত কলিকাতার জোরেই সমস্ত বাংলাদেশ বল পাইতেছিল।

এমন সময়ে বাংলার রাষ্ট্রকলেবর দুইখানা করিয়া দিলে দেশের নাড়িজালের মধ্যে

একটা ছেদ পড়িল— রক্তপ্রবাহ চেতনাপ্রবাহ দুই স্বতন্ত্র কেন্দ্র আশ্রয় করিল। ইহাতে যে বাংলাদেশকে দুর্ব্বল করা হইল এবং এককে দুই করিয়া তাহাদের মধ্যে ক্রমশই নানাপ্রকার পার্থক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করার সুযোগ করা হইল ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন?

ইংলিশম্যান কাগজে সেদিন দেখিতেছিলাম যে, বাঙালিরা গবর্ণমেন্টের মৎলবের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করাতে এবং বিলাতি জিনিষ কেনা বন্ধ করার চেষ্টা করাতে বর্ত্তমান ব্যাপারে বাঙালির হৃদয়বেদনা হইতে সাধারণ ইংরেজের সহানুভূতি চলিয়া যাইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এমন ক্ষীণপ্রাণ সহানুভূতি লইয়া আমাদের লাভ কি হইতেছিল! পাখী ফাঁদে ধরা পড়িলে সে ব্যাধের প্রতি শঙ্কা অনুভব এবং ছটফট করে বলিয়াই যদি তাহার পর হইতে দয়া চলিয়া যায়, তবে সে দয়াটুকুর জন্য বিশেষ ক্ষতি বোধ করা যায় না। বস্তুত বাংলাকে দুইখানা করিয়া ফেলিলে তাহাতে বাঙালির যে যথার্থ ক্ষতি কি হয়, তাহা আমাদের গবর্মেন্ট কিম্বা কোনো শিক্ষিত ইংরেজ বোঝেন না একথা বলিলে আমরা সেটাকে নিতান্তই ন্যাকামি বলিয়া গণ্য করিব।

আমরা যে বিলাতি জিনিষ কেনা বন্ধ কবিয়াছি, ইহাতেও সাধারণ ইংরেজের মন আমাদের উপর হইতে বিমুখ হইতেছে এবং গবর্মেণ্টের পক্ষেও বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করা কঠিন হইয়াছে, এমন কথাও ইংরেজি কাগজে দেখিয়াছি।

আমরা কি করিলে যে ইংরেজের মন পাইতাম এবং গবর্মেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের নিজের হুকুম রদ করা সহজ হইত, সে উপায় ত আজ পর্য্যন্ত আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা যদি চুপ করিয়া থাকিতাম, তবে কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতেন— মৌনং সম্মতিলক্ষণং, যদি অ্যাজিটেশন করিতাম, তবে গবর্মেণ্ট বলিতেন— এ কেবল শিক্ষিত লোকদের কলের নাচ। আমরা এ কাজ কি কখন করি নাই, এবং কোনো দিন কি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি?

আজ সমূহ ক্ষতি ও অসুবিধা স্বীকার করিয়াও দেশের আপামর সাধারণে বিলাতি জিনিষ কেনা বন্ধ করিয়াছে বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনটা যে নিতান্তই ফাঁকা নয় এইটেই নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে। ইংলিশম্যান জানেন এবং আমরাও জানি যে এইটে প্রমাণ হওয়ার দরুণই যে পার্টিশন রহিত হওয়ার কোনো সুযোগ হইল তাহা নহে। গবর্মেণ্ট যে কোনো কালে এমন কথা বলিবেন যে, "আচ্ছা ভাল,

না হয় আমাদের শাসনকার্য্যের কিঞ্চিৎ অসুবিধাই ঘটিল; কিন্তু তোমরা যখন এমন যথার্থ বেদনা বোধ করিতেছ, তখন পার্টিশন রহিত করা গেল" ইহা আমরা আশা করিতে পারি না। কারণ, দেখিয়াছি গবর্মেন্টের সে বল নাই। প্রজার প্রবল ইচ্ছায় সায় দিতে গবর্মেন্টের সাহস হয় না— সেখানে গবর্মেন্ট দুর্ব্বল।

এই যদি বুঝিলাম, যদি স্থির জানি আমাদের চাঞ্চল্য গবর্মেন্টকে বিচলিত করিতে পারিবে না,তবে আমাদের এত উৎসাহ কেন? তাহার কারণ, এই চাঞ্চল্যই আমাদের লাভ। এই চাঞ্চল্য আমাদের নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। নিজের প্রাণশক্তিকে অনুভব করাই যে একটা পরম সফলতা। পার্টিশনের প্রস্তাবে আমাদের সকলের মনে যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে, ইহাতেই আমরা বুঝিতেছি পার্টিশন ঘটিলেও আমাদের তেমন ক্ষতি করিবে না। আমাদের অন্তরের মধ্যে যখন এতটা প্রেম প্রচ্ছন্ন আছে, যখন এতটা বেদনাবোধের শক্তি আছে, তখন বাহিরের বিচ্ছেদের উপরে জয়ী হইবার আশা আমাদের দূর হইবে না।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

শোকচিহ্ন

আজকাল দেখিতে পাই আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে বাঙালিরা কেহ কেহ কালাপেড়ে চিঠির কাগজ ও লেফাফা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মৃত্যুশোকের দুইটা দিক আছে। একটা ব্যক্তিগত ও একটা সামাজিক। শোকের যে বেগ আন্তরিক, তাহা কেবল অন্তর্যামীর নিকটই প্রকাশ পায়, তাহাকে সাধারণের নিকট সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন সহৃদয় ব্যক্তির ইচ্ছাই হয় না। শোকের যে দিকটা সামাজিক— সেটা প্রথাপালন মাত্র, তাহার সঙ্গে আন্তরিকতার যোগ না থাকিলেও কেহ নিন্দা করিতে পারে না। লোকসমাজে বিশেষভাবে শোক জ্ঞাপন করিবার জন্য সমাজ আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে।

এসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্নরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এক দেশের প্রথা আর এক দেশে চলে না। কারণ সামাজিক প্রথা পালন করার অর্থই সমাজের নিকট বাধ্যতা স্বীকার করা। আমরা যখন জুতা ছাড়িয়া কাছা পরিয়া শোক জ্ঞাপন করি, তখন সমাজের অনুরোধে শোক প্রকাশ সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন অভিরুচিকে বিসর্জ্জন দিই। হৃদয় সকলের এক ছাঁচে গড়া নয়— শোকের মাত্রা এবং প্রকৃতি সকলের একরূপ হইতেই পারে না। কিন্তু শোকেব সমাজসম্মত প্রকাশসম্বন্ধে আমরা সকলেই সমান— এখানে আমরা সমাজের অধীন।

এই অধীনতার সীমা আছে, অর্থাৎ আমরা কেবল নিজের সমাজের কাছেই অধীন— তাহার বাহিরে আমাদের হৃদয় আর কোনো বন্ধন মানিতে পারে না। ইংরেজ আত্মীয়ের শোকে কালো চিহ্ন ধারণ করে, বাঙালির মাঝখানে বাস করিলেও কাছা পরে না বা হবিষ্যান্ন খায় না। তাহার কারণ, সে বাংলা সমাজের অধীন নহে— তাহার পক্ষে বাংলা সমাজের প্রথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করা অদ্ভুত ও আন্তরিক দাসত্বের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত।

আমাদের মধ্যে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাইতেছে যে, যেখানে আমরা বলের দ্বারা পরাধীন সেখানে ত কথাই নাই; কিন্তু যেখানে আমরা বাধ্য নই, যেখানে আমরা স্বাধীন— সেখানেও আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরবশতার একটা চিহ্ন গ্রহণ করিতে পারিলে যেন খুসি হই। যেখানে শোক জ্ঞাপন করিতে কেহ লোকাচার বা অন্য কারণে বাধ্য নহে, সেখানে গায়ে পড়িয়া শোকজ্ঞাপন করিতে যাওয়া কি হৃদয়ের অবমাননা নহে? কাপড়ে চোপড়ে কাগজে পত্রে মসীলেপন করিয়া, যে

ক্ষতি মর্ম্মান্তিক ভাবে— একান্ত ভাবে আমার— তাহা গায়ে পড়িয়া সকলের কাছে ঘোষণা করিতে যাওয়া কখনই স্বাভাবিক নহে। শোকের মধ্যেও এইরূপ সাহেবিয়ানা খাটাইতে যাওয়া যে কতখানি মজ্জাগত দাসত্বের পরিচায়ক, তাহা সহৃদয় লোকের কাছে প্রমাণ করিতে বসাই বাহুল্য।

বঙ্গবিভাগ লইয়া আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ অঙ্গপ্রান্তে মসীপ্রলেপের দ্বারা শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ বিড়ম্বনা কিসের জন্য? আমরা যে শোক অনুভব করিতেছি এ কথাটা এমন বিজাতীয়রূপে চোখে আঙুল দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে কাহার কাছে? বেদনাটা বাঙালীর পক্ষে এতই আন্তরিক, এতই সত্য, যে এস্থলে একটা বিদেশী চিহ্নধারণের আড়ম্বর নিতান্তই অসঙ্গত এবং সেই জন্যই এরূপ দৃশ্যে আমরা লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না।

সম্পাদক মহাশয়, তোমাদের কাগজ হইতে এই কালিমা মুছিয়া ফেল। আজ স্বদেশ হইতে বিদেশসংসর্গেব অনেকগুলি কালিমা প্রক্ষালন করিবার জন্য তোমরা আহ্বান করিতেছ— দেশেব অঙ্গে বিদেশী কালী দিয়া নূতন কলঙ্ক আর লেপন করিও না! আমাদের শোক আজি শুভ্র হউক্, সংযত হউক, নিরাভরণ হউক;— কঠোব ব্রত দ্বারা তাহা আপনাকে সফল করুক, অনাবশ্যক অনুকরণের দ্বারা তাহা দেশে বিদেশে আপনার কৃষ্ণাশ্রুরেখাকে হাস্যকর করিয়া না তুলুক!

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

পার্টিশনের শিক্ষা

এবারকার পার্টিশনের ব্যাপারে আমাদের যে দুই একটা শিক্ষার বিষয় ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে।

দেশের লোক এক হইয়া প্রার্থনা করিলে গবর্মেন্ট আমাদের সে প্রার্থনা পূরণ করিবেন— দেশের লোক এক হইয়া নিষেধ করিলে গবর্মেন্ট সে নিষেধ মান্য করিবেন— এই বলিয়া আমাদের দেশের উপদেষ্টারা দেশের লোককে এক হইবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সে উপদেশ বারম্বার ব্যর্থ হইয়াছে। স্বার্থসাধনের জন্য দেশের আপামরসাধারণে এক হইতে পারিল না। বস্তুত এমন আবেগহীন সুবুদ্ধির আকর্ষণে কোনো দেশের লোক এক হয় নাই। লাভের হাটে হিসাবের খাতার উপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

এবারকার আন্দোলনের একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, লাভ-লোকসানের কথা সকলে স্থির হইয়া ভাবিতেছে না। বঙ্গবিভাগে কি অনিষ্ট হইবে, তাহা অনেকেই জানে না; কিন্তু এক প্রকার গভীরভাবে অন্ধভাবে আমরা সকলে মিলিয়া বেদনা বোধ করিতেছি। কোথায় আমাদের নাড়িতে টান পড়িয়াছে, তাহা আমরা ভাল করিয়া জানিই না; কিন্তু ব্যথাটা স্পষ্টই বুঝিতেছি। এই বেদনাটা তর্কবিতর্কের বিষয় নহে বলিয়াই— ইহা অনুভবের বিষয় বলিয়াই দেশের স্ত্রী-পুরুষ; শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই ইহা অধিকার করিয়াছে। বাংলাকে দুইভাগ করা হইতেছে, ইহাই আমাদের পরম ক্ষতি— ইহার মধ্যে আর কি লাভ ক্ষতি আছে, তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়ই হয় নাই।

ইহা হইতে দেশের উদ্যোগী পুরুষদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের ঐক্যের উপায় দেশের হৃদয়ের মধ্যে আছে— সেই হৃদয়কে টানিতে না পারিলে সুবিধা অসুবিধার আশা আশঙ্কায় সমস্ত দেশকে কোনোদিন টলাইতে পারিবে না।

ইহা নিঃসন্দেহ— প্রেমই মানুষের চরম ধন, সুবিধা নহে। তাই যদি না হইবে, তবে মানুষ প্রাণ দেয় কেন? তাই যদি না হইবে, তবে মানুষ পরের সুবিধাকে আপন সুবিধার চেয়ে বড় করে কেন?

নীতি-উপদেশকেরা বলেন যে, যে মাতা সন্তানকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া কতই না কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাঁহাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দশমাস গর্ভধারণের কথা আলোচনা করিয়া কোনো সন্তান মাকে ভক্তি করে নাই। মা

বলিতেই সন্তানের চিত্ত যে উদ্বেল হইয়া উঠে, সে নির্ব্বিচারে, সে নিগূঢ়ভাবে— তা যদি না হয় ত কিছুই হইল না।

তেমনি স্বদেশের প্রতি আমাদের মনের টান যখন অহেতুক হইবে, যখন আমরা হিসাব করিব না, বিচার করিব না, যখন আমাদের স্বদেশপ্রীতিকে মুখ্যভাবে কোনো একটা লক্ষ্যসাধনের উপায় বলিয়া গণ্য করিব না— তখনি আমরা যথার্থভাবে দেশের কাজ করিতে পারিব। তখনি দেশের জন্য ক্ষতি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইবে।

এই প্রেম জিনিষটা অন্যের মনে সঞ্চার করিবার উপায়, ভাষায়, আচরণে ও সেবায় এই প্রেম অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা। দেশকে ভালবাসিলে যে আমাদের কোনো সুবিধা আছে একথা বলিয়া ভালবাসা পাওয়া যায় না। ভালবাসা নিজেই নিজের লক্ষ্য— আর কোনো লক্ষ্যকে সে স্বীকার করে না।

অশিক্ষিত চাষার মনেও দেশকে ভালবাসিবার একটা ভাব আছে। সেই ভাবটা নিগূঢ়রূপে আছে, সেইটেকে তাহার চেতনার এলাকার মধ্যে একবার বাহির করিয়া আনিতে পারিলেই হইল। একবার তাহার মূঢ় মনকে মুখ ফুটিয়া বলাইতে পারিলেই হইল— আমার দেশ, আমার বাংলা, আমার হিন্দুস্থান। এইটেই আমাদের সকলের প্রথম কাজ, এইটেই আমাদের সকলের বড় কাজ।

ইংরাজি পড়িয়া কেবল আমরাই দেশকে যে ভালবাসি এমন নহে, দেশকে যে প্রাকৃতসাধারণেও একরকম করিয়া ভালবাসে এবারে সেই শিক্ষা আমাদের হইয়াছে; সুতরাং এখন হইতে এ জিনিষটাকে আমাদের আর উপেক্ষা করা চলিবে না। দেশ যে আমাদের ভালবাসার ধন, এই কথাটাকেই সমস্ত দেশের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে,— তাহার পরে দেশের ক্ষতিকে আমাদের নিজের ক্ষতি বলিয়া, এমন কি, আমাদের নিজের ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি বলিয়া বুঝিতে কোনই বাধা হইবে না।

আমাদের মধ্যে যদি কয়েকজনও এমন লোক থাকেন, যাঁহারা বড় হইয়াও দেশের প্রেমে নিজেকে দেশের চাষাভুষার সহিত এক পংক্তিতে টানিয়া আনিতে পারেন, যাহারা নানা সুবিধা সত্ত্বেও দেশের প্রেমে প্রাকৃত সাধারণের সমস্ত অসুবিধা নিজে গ্রহণ করিতে পারেন, তবে সাধারণলোকে দেশের প্রেম যে একটা বাস্তবিক জিনিষ, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে।

আমাদের এবারকার আন্দোলনে আমরা বিলাতি জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশি

জিনিষ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে ইংরেজ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে কি না জানি না; কিন্তু এই ব্যাপারে— দেশ যে আমার— এই কথাটা আমাদের সাধারণ লোকের কাছে বিনা ভাষায় এক মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এক যুগ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেও এমনটা ঘটিতে পারিত না। আমরা আমাদের দেশি জিনিষ ব্যবহার করিব এই সংকল্পের মধ্যে রাগ আছে বা জেদ্ আছে বলিয়াই যে ইহা এমন ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে— ইহার মধ্যে প্রেম আছে। দেশের জিনিষই দেশের সকলে ব্যবহার করিব, ইহা আমাদের হৃদয়ে লাগিয়া গেছে— ইহা আমাদের নিগূঢ় প্রীতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, সেই জন্যই ইহা এত বল পাইয়াছে। সেই জন্য বঙ্গ বিভাগ যাহাদিকে আঘাত করিতেছে না, তাহারাও ইহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য আমরা জানি, দোকানদাররাও ক্ষতি স্বীকার করিয়া বলিতেছে, বাবু আপনারা বিলাতি জিনিষ আর কিনিবেন না। সেই জন্য বালকেরাও বিলাতি জিনিষের প্রলোভন ত্যাগ করিতেছে এবং স্ত্রীলোকেরাও সাজ-সজ্জার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতেছে।

এতদিন যে দেশ বিলাতি জিনিষের মোহে আপাদমস্তক মজিয়া ছিল, সেই দেশ যখন বহুদিনের অবজ্ঞাভাজন দেশি জিনিষের জন্য দোকান বাজার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তখন স্বদেশীয়ের কাছে স্বদেশীর যে মূল্য কত বড়, পরস্পরের কাছে আমরা পরস্পর যে কতখানি, তাহা কি আর বুঝিতে বাকি থাকিতেছে? দেশের লোকের কাছে দেশের এই যে গৌরব বাড়িয়া উঠিল ইহাতে সমস্ত দেশে কি একটা আনন্দের জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে! এই জোয়ারের বেগ আজ কাহাকে না স্পর্শ করিতেছে! বঙ্গবিভাগ ব্যাপারটা যত বড়ই হউক, স্বদেশের দিকে, মোটা কাপড়ের দিকে, বিলাস পরিহারের দিকে এই যে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন— ইহা তাহার চেয়ে বড় হইয়া উঠিল। এখন এই জোয়ারের বেগকে বাংলাদেশ কেবল নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না— ইহা সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা "বয়কটিং" নহে, ইহা ফাঁকা আওয়াজ নহে, ইহা সত্যকার সামগ্রী, ইহা দেশের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

স্বদেশসত্তানুভূতি

দেশ বলিতে যথার্থভাবে কতখানি বুঝায়, যে কোন দেশের খুব কম লোকেই তাহা জানে। আমাদের পক্ষে জানা আরও শক্ত, কারণ আমাদের দেশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস নহে। কবে কোন্ বিদেশী রাজা আমাদের দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম তারিখ ও কীর্ত্তিকলাপকেই আমরা আমাদের ইতিহাস বলিয়া জানি— আমাদের দেশের চিন্তা, সাধনা ও তাহার প্রবর্ত্তক আদর্শ পুরুষদিগের সহিত আমাদের কোন যোগই ঘটে না। তাই বাস্তবিক পক্ষে ইংরাজিতে যাহাকে race consciousness অর্থাৎ স্বজাতি-সত্তানুভূতি বলে, আমরা তাহার কিছুই জানি না।

ইহার কারণ স্বদেশ জিনিষটা বুঝিয়া উঠিবার সুবিধা পূর্ব্বে কখনও আমাদের সামনে ধরা দেয় নাই। আমাদের দেশে চিন্তার একটা ঐক্য, এমন কি সমাজবিধানের মধ্যে নানাবিধিব্যবস্থার বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ঐক্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, আমাদের দর্শন-সাহিত্যে ও সমাজ-গঠনের মধ্যে আংশিকভাবে তাহাকে ধরা যায়। কিন্তু দেশের মাটির প্রতি নূতনতর টান— বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি, এ দুয়ের মধ্যে অভেদরূপে দেশের চিরন্তন মূর্ত্তিদর্শন, এবং তাহার মধ্যে বিশ্বমানবের সার্থকতার অনুভূতি, এব্যাপার আমাদের পক্ষে অভিনব সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটা নিত্যকালের অক্ষয় পুরুষ আছেন, তাঁহাকে দেখিবার দিন আজও আসিয়াছে কি না জানি না। কিন্তু তাঁহাকে একজন লোকও যদি যথার্থভাবে দেখিতে পান; তবেই সেই পুরুষ দেব-মন্দিরে চিরন্তন আসন পাইবেন, তাঁহার তপোমূর্ত্তি সকলের চর্ম্মচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন দেখিব যে আমাদের দেশের তত্ত্বাদিতে যে সমন্বয় বিধানের চেষ্টা বিদ্যমান, গীতা যাহার সার দৃষ্টান্ত, যে সমন্বয় সমাজের বিভিন্ন শক্তির প্রতিও প্রয়োগ করা হইয়াছে,— কত আচার, কত অনুষ্ঠান, কত ক্রিয়াকাণ্ড নিয়মপদ্ধতি যে তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, অথচ সকলি ঐক্যকে প্রতীয়মান করিতে ব্যস্ত— সে সমন্বয়ের মূলে তাঁহার চিরন্তন মানসমূর্ত্তি বিরাজমান। আমাদের রসবোধ, আমাদের ভাব উচ্ছাস, আমাদের বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি একান্ত মোহ আমাদের সাহিত্যে যে নব লীলা রসের সঞ্চার করিয়াছে, সেই রসের মধ্যে তাঁহার রসামৃতমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহার বিলম্ব যথেষ্ট, কারণ বলিতেছিলাম যে race consciousness

জিনিষটা আমাদের কাহারো মধ্যে সর্ব্বতোভবে উদিত হয় নাই, যেদিন হইবে সেদিনই আমরা ধন্য হইব।

জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে গীতোক্ত "পরিত্রাণায় সাধুনাং" এর ন্যায় একটি বৃহৎ ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া ইতিহাসের সেই নিত্যপুরুষ বিশ্বরঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হন। তিনিই বুদ্ধ, তিনিই অশোক, তিনিই কৃষ্ণ এবং তিনিই চৈতন্য, রামদাস, গুরুগোবিন্দ ও রামানুজ। বৌদ্ধ ইতিহাস আশ্চর্য্য কিন্তু কে তাহার মূলে? বুদ্ধ। তেমনি শিখ মারাঠা রাজপুত ও বাঙালী যে কোন দিনই বড় হৌক না কেন— একটি মহাপুরুষের চারিদিকেই সেই বড়দিনের উৎসব বসিয়াছিল।

আমি এই মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবকে আকস্মিক বলি না। আমি জানি যে যদি বৃহৎ জনমণ্ডলীর ভিতরে ভিতরে নানা অদৃশ্য কারণের জন্য একটি নিগূঢ় ভাবাবেগ তৈরি না হইত— যদি তাহার জন্য তাহারা এক মুক মূঢ় অন্ধ টান না অনুভব করিত, ইহুদীরা যেমন Messiahর জন্য, মারাঠা যেমন শিবাজীর জন্য, শিখ যেমন গুরুগোবিন্দের জন্য এবং ইসলাম যেমন মোহম্মদের জন্য অনুভব করিয়াছিল, তবে কখনই মহাপুরুষ সম্ভব হইতেন না। ইতিহাস-বিজ্ঞানে দেখা যায় যে শক্তি আকাশ হইতে নামে না, জনমণ্ডলীর পুঞ্জীভূত শক্তি আপনাকে বিশেষ একটি ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করে।

রসের ঐক্যসাধনে ভারতবর্ষের এই মহাপুরুষেরা যে কতদূর তৎপর, ইহাদের ব্যক্তিত্বের ও যুগের যেদিন প্রকৃত ইতিহাস আমাদের চোখে পড়িবে, সেই দিনই জানিব। তাই জন্য "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটা বিশ্বাস করি। আমাদের মধ্যে যে স্বদেশানুরাগ জাগিতেছে, তাহা যেদিন বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ গোচর হইবে, সেদিনই দেখিতে পাইব ভারতবর্ষের ইতিহাস কি এবং যে ইতিহাস আম্‌াদেরই ঐক্যসাধনে কতটা সহায়তা করিয়াছে। তাহা কেবল বিরোধই বপন করে নাই।

আমরা সেই মহাপুরুষের অপেক্ষায় আছি ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি বিশেষভাবে সেই স্বদেশসত্তা অনুভব করা, আমাদের উত্তরোত্তর বিকাশমান ভাব ও চিন্তার মধ্যে সেই নিত্যপুরুষের লীলা সন্দর্শন করা, সমস্ত সভ্যতার মধ্যে যিনি বিদ্যমান এবং সকলকে যিনি নানাপথে একের মধ্যেই উত্তীর্ণ করিতেছেন ইহার জন্য আমাদিগকে যৎস্বল্প আয়োজন করিতে হইবে। কেবল অন্ধভাবে টান অনুভব করাই যথেষ্ট হইবে না। ভয় পাইয়া শিশু যেমন মাকে আঁকড়িয়া ধরে, তেমনিভাবে বাহিরের বিদেশীর আঘাতে স্বদেশকে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না— আপাতত ইহাই

যথেষ্ট— কিন্তু ইহারও উর্দ্ধে যাইতে হইবে— যথার্থভাবে সেবায় কর্ম্মে ও পূজায় স্বদেশের সত্তাবোধ ও অনুভব করিতে হইবে।

মূঢ় টান মানুষের নিজের পরিজনমণ্ডলী ও বাপ মায়ের উপর থাকে, সে ভালবাসা কেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখে না। কিন্তু স্বদেশসত্তার অনুভূতি সকলের হয় না, তাহা গুটি কতক লোকের মধ্যেই হয়, তাঁহারাই গীতোক্ত "পরিত্রাণায় সাধুনাং" মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষদিগের সমন্বয় চেষ্টায় তিলে তিলে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, পল্লী হইতে সমাজ, সমাজ হইতে স্বদেশ, স্বদেশ হইতে বিশ্ব মানব, এককাল হইতে অন্যকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি সম্প্রসারণ করিবার শক্তি আমরা পাই। ভারতের মহাপুরুষগণ এই কথাটি প্রমাণ করিয়া গেছেন। তাঁহাদেরই যথার্থ ঐতিহাসিক আলোকে দেখিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁহাদের সার্ব্বভৌমিকত্বের যোগ এক্ষণে স্থাপিত করিতে হইবে।

মূর্ত্তি পূজা আমাদের দেশের idealisation এর ফল। ভাবকে ভার রূপে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নহে, হৃদয়ের মধ্যে মূর্ত্তিরূপে অনুভবের দ্বারা তাহাকে পাইবার জন্য আমাদের দেশের ব্যাকুলতা আছে। আমাদের এরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে যাহাতে কেবল মূর্ত্তিকেই আমরা না গ্রহণ করিয়া বসি, ভাবকে ও মূর্ত্তিকে অভেদরূপে এক নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখি।

এই স্থলেই আমাদের মিলন ক্ষেত্র বলিয়া আমি মনে করি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

মাতৃমূর্ত্তি

বিভাস— একতালা

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হলে জননী!

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
ডান হাতে তোব খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।

ওগো মা—
তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে,
রৌদ্র-বসনী!

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।
যখন অনাদরে চাইনি মুখে
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙাঘরে এক্‌লা পড়ে
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।

কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ
কোথা সে তোর মলিন হাসি,
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
ওগো মা
তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে!
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী
তোমাব অভয় বাজে হৃদযমাঝে
হৃদয়-হরণী!
ওগো মা
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমাব দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনাব মন্দিরে।।

মাতৃগৃহ

(বাউলের সুর)

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা
ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।।
করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি করে ফিরব ওরে
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে।।

কিছু মোর নেই ক্ষমতা
সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি
চরণে তোর দেব মেলে।।
নেব গো মেগে পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে
দেগো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান সেইখেনে প্রাণ
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে।।

প্রয়াস

(বাউল)

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা কর' চল্‌বে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফল্‌বে না-
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।।
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে
তাই বলেই কি রইবি থেমে
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি
হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।।
শুনে তোমার মুখের বাণী
আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয় ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।।
বন্ধ দুয়ার দেখ্‌বি বলে
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে,
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয় ত দুয়ার টল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।।

বিলাপী

(বাউলের সুর)

ছিছি, চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্‌না ওরে
বক্ষ দুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষ দুয়ার আঁটি।।

পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে
দিস্‌নেরে ভাই পথেই ঢেলে
মিথ্যে অকাজে!
ওরে নিয়ে তারে চল্‌বি পারে
কতই বাধা কাটি
পথের কতই বাধা কাটি।।

দেখ্‌লে ওতোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাস্‌বে যারা
তারা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্‌
যায় নাকি বুক ফাটি
লাজে যায় না কি বুক ফাটি।।

দিনের বেলায় জগৎ মাঝে
সবাই যখন চল্‌ছে কাজে
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি
কেবল করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি।।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করতালি

গল্প আছে একজন লোক তাহার জন্মস্থানের পরিচয় দিত না। অবশেষে একজন কৌশলী লোক তাহাকে হঠাৎ প্রহার করাতে ভয়ের চোটে তাহার জন্মস্থানের ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তি পরের নকল করিতে পারে, ছদ্মবেশে নিজেকে ঢাকিতে পারে; কিন্তু হৃদয়বৃত্তি জন্মস্থানের পরিচয় দিয়া ফেলে, সে পুরাতন সংস্কারকে আশ্রয় না করিলে পীড়িত হয়।

কিন্তু যখন দেখা যায় হৃদয়ের ভাবও পরের নকল করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত, তখন হয় বলিতে হয় যে, হৃদয়ের ভাবটা তেমন খাঁটি নয়, নয় বলিতে হয় লোকটা একেবারে অন্তরে বাহিরে পরের কাছে আপনাকে বিকাইয়াছে।

আমাদের দেশে কতকগুলি ছোটখাটো বিষয়ে ইহার যে সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহা উপেক্ষা করিবার বিষয় বলিয়া আমি মনে করি না। অন্তত এসকল বিষয়ে সতর্ক থাকিলে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্বকে জাগ্রত রাখা হয়।

সভাস্থলে করতালি দেওয়াটা আমাদের দেশে আজকাল প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু এই প্রথা কি আমাদের সকলের কাছেই এমন অভ্যস্ত হইয়া গেছে যে, ইহা আমাদের কাহাকেও আর পীড়া দেয় না? অন্তত আমি এমন কাহাকেও জানি সভাস্থলে এই করতালির চটপটা যাঁহার কাছে প্রত্যেক বারেই একটা উৎকট ব্যাঘাতের স্বরূপ ঠেকে।

এই করতালি দ্বারা বক্তাকে উৎসাহ দেওয়া বা সম্মানিত করা আমাদের দেশের প্রথা নহে বলিয়াই যে ইহা পীড়াজনক, তাহা নহে— সভাস্থলে অকস্মাৎ অসংযম আমাদের প্রাচ্য প্রকৃতির পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। এরূপ উৎকট উপায়ে মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করা হয় না— কারণ, সম্মান করিবার উপায় কখনই অসংযত হইতে পারে না। আমাদের দেশে করতালি চিরকাল অপমানের উদ্দেশেই ব্যবহার করা হইয়াছে— বস্তুত তাহাই সঙ্গত— কারণ, অসংযমের দ্বারাই অপমান করা যায়। তাই চিৎকার-রব দুয়ো বা সশব্দে করতালি দেওয়া অপমানের উপায়। অপর পক্ষে যিনি আমাদের সম্মানের যোগ্য, তাঁহার কাছে আমরা আত্মসম্বরণ করিয়া থাকি, কোনো প্রকার প্রগল্‌ভতা করি না।

কিন্তু ইংরেজের অনুকরণে আমাদের হৃদয় যদি এইরূপ উদ্দাম বর্ব্বরতায় সঙ্কোচ বোধ না করে, যদি তাহার বহুদিনের প্রাচ্য সংস্কার পরিহার করিতে পারে, তবে তাহা আমাদের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে আমাদের ভাবস্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিব কি করিয়া? ভাবস্ফূর্ত্তি যে সর্ব্বত্র উগ্র আকারে প্রকাশ করিতেই হইবে এমন কোন কথাই নাই। ভাবস্ফূর্ত্তিকে অন্তরের মধ্যে গভীররূপে ধারণ করিবার একটা সফলতা আছে। আনন্দ হইবা মাত্র উন্মত্তভাবে নৃত্য করাকে আমরা শিষ্টতার লক্ষণ বলি না—কিন্তু ইংরেজ অনেক স্থলেই তাহা করে। ইংরেজ অনেক সময় উৎসাহের উদ্দীপনায় তাহাদের জনপ্রিয় লোককে কাঁধে করিয়া লইয়া যায়, অনেক সময় তাহার গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া তাহার গাড়ি টানিতে থাকে—আমরাও ইংরেজের নকল করিয়া অনেক সময়ে এইরূপ লজ্জাকর হাস্যকর অশোভনতায় প্রবৃত্ত হই — তখন আমাদের দেশলক্ষ্মীর মুখ লজ্জায় নত হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি বেলোয়ে ষ্টেশনে ভিড়েব মধ্যে স্ত্রীর অথবা শিশু সন্তান ব্যতীত অপর কোনো আত্মীয়ের মুখচুম্বন কবিতে পারি? এরূপ ভাবস্ফূর্ত্তি সকলের সমক্ষে প্রকাশ কবিতে আমাদের অন্তকরণ লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ ত লজ্জা বোধ করে না।

জাপানে সৈন্যগণ যখন যুদ্ধ করিবার জন্য দেশ হইতে বিদায় লইয়া যায়, তখন রেলোয়ে ষ্টেশনে অথবা জাহাজের ঘাটে নিদারুণ আত্মীয় বিচ্ছেদের যে দৃশ্য দেখা গেছে, তাহা এমনই আশ্চর্য্য সংযত ও শান্ত যে, য়ুরোপীয় দর্শকগণ বিস্মিত হইযাছে। এমন কি, তাহাদের অনেকে মনে করিয়াছে যে, জাপানীদের মধ্যে গার্হস্থ্য-প্রেমের গাঢ়তা নাই। বস্তুত প্রাচ্যদেশে আত্মসংবরণ ও সংযমই পৌরুষের আদর্শ—আমরা স্তব্ধতার দ্বাবাই কেবল পরেব প্রতি নহে, নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি।

ম্যাফেকিঙ অবরোধের অবসানে ইংরেজ কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। রুশিয়ার সহিত বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ কবিয়া জাপান একদিনের জন্যও আত্মবিস্মৃত হয় নাই। যে জাপান য়ুরোপের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা এবং আরো নানা শাস্ত্র অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে, সেই জাপান এখানে বুদ্ধের শিষ্যত্ব ভুলিতে পারে নাই। আর আমরা ইংরেজের কাছ হইতে তাহার শক্তি কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতে পারিতেছি না, কেবল কি তাহার চাপল্যই গ্রহণ করিতে থাকিব?

ছাত্রদিগকে তাঁহাদের চালকগণ করতালি অপেক্ষা আরো একটা উগ্রতর বিদেশী বর্ব্বরতায় দীক্ষিত করিয়াছেন—তাহা "চীয়ার্স" দেওয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই অর্থবিহীন উন্মাদ চীৎকারধ্বনি করিতে ছাত্রগণ এখনো অন্তরের মধ্যে লজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। অন্তত করা উচিত। যে ব্যক্তির মাথা মুড়াইয়া ঘোল

ঢালিবার প্রয়োজন, তাহারই পশ্চাতে যদি আমরা এইরূপ পাশব চীৎকার করিতে থাকি, তবেই তাহা শোভা পায়; মান্য ব্যক্তিদের পক্ষে এমন অপমান আর কিছু হইতে পারে না।

জয়ধ্বনি কি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না এবং এখনো কি তাহা প্রচলিত নাই? মান্য ব্যক্তি সভাস্থলে আগমন কবিলে আমরা কি করতালির পরিবর্ত্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি না? বক্তৃতা শ্রবণকালে উৎসাহ অনুভব করিলে আমরা যদি "সাধু সাধু" শব্দে বক্তাকে সাধুবাদ দিই তবেই কি তাহা শোভন এবং সম্মানজনক হয় না?

লিভারপুলের লবণ এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র আমাদের তেমন ক্ষতি করে না; কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল বিদেশীয় প্রথাব বন্ধন স্বীকার করিলে আমাদেব অন্তঃকরণে বিকাব উপস্থিত হয়। উপদ্রব উপস্থিত হইলে যেমন অন্তঃপুবকে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষের ব্যাকুলতা জন্মে, তেমনি বাহিরের আক্রমণে যখন আব সমস্ত নষ্ট হইতে বসে, তখন হৃদয়টাকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচাইবাব জন্য যেন আমাদের চেষ্টা লেশমাত্র শিথিল না হয়; কারণ হৃদয়ের মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতাব শেষ দুর্গ— সেখানকার চাবি আমাদের নিজের হাতে, — রাজাব সাধ্য নাই সেখানে প্রবেশ কবেন। সেখানে যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদেশী নিয়ম চালাইতে থাকি, তবে ভিক্ষুকতার পরম দুর্গতি দাসত্বের চরম লাঞ্ছনা আমরা লাভ করিব।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

হাতের তাঁত

হেবেল সাহেবের চিঠি

হাতের তাঁতের কারখানা সুরু করিবার জন্য সব চেয়ে ভাল তাঁতের সন্ধান সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তদুত্তরে যতদূর খোঁজ খবর এসম্বন্ধে আমি জানি লিখিয়া জানাইতেছি কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা না ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার স্পষ্ট জবাব দেওয়া চলে না।

নূতন প্রণালীতে চালিত হাতের তাঁত সম্বন্ধে যতদূর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে মনে হয়, যে ৬০ নম্বর কি তদূর্দ্ধের সূক্ষ্ম সূতার বস্ত্র বয়নের জন্য সাবেকি ফ্লাইশাটল তাঁতই ভাল। শ্রীরামপুরে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে, দেশী তন্তুবায়দের দ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং ১২০ নম্বরের সূতার সাড়ী ধুতি প্রভৃতি তৈরি করিবার পক্ষে ইহা রীতিমত উপযোগী।

হাতের তাঁতের কারবার এই সকল তাঁত লইয়া আরম্ভ করিয়া দিলে লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই— অবশ্য 'টানা'টি তৈয়ার করিবার জন্য নূতন প্রণালী অবলম্বন কবিতে হইবে। হাতের তাঁতে ভারতবর্ষের বস্ত্রবয়নের উপর আমার প্যাম্ফলেটে এ সকল প্রণালীর আলোচনা করা আছে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, টানার তৈরির জন্য নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন একেবারে প্রয়োজনীয়— যদি নূতন হাতের তাঁত হইতে কোন ফলের আশা করা যায়।

পায়ে খাটান নূতন তাঁতগুলি শ্রীরামপুরের তাঁত অপেক্ষা দ্রুততর কাজ করিতে পারে। একটু মোটা সূতা লইয়া তাহাদের কাজ করিতে হয় এবং কাপড়ের বহরও একটু খাটো হয়। হ্যাটারস্লির ৯৬ নম্বরের কল দিনে আটঘণ্টা কাজ করিয়া ২৮ ইঞ্চি পাশে আট নম্বরী সূতার পঞ্চাশ গজ মোটা কাপড় তৈরি করিয়াছে। এই কাপড় ঝাড়ন, কি মোটা শাটিংএর জন্য ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না। কিন্তু এখানকার মজুরি দ্বারা কতখানি সূক্ষ্ম বুনানির কাজ ইহা হইতে আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা এখনও পরীক্ষা করা হয় নাই— শ্রীরামপুরের তাঁতের সহিত সূক্ষ্মবুনানির কাজ লইয়া ইহার পরীক্ষা চলিতেছে।

আমার পরামর্শ এই যে, হাতের তাঁতের কারবার খুলিয়া দেওয়া হৌক। শ্রীরামপুরের তাঁত ধুতি শাড়ীর জন্য ব্যবহৃত হৌক এবং তার সঙ্গে জাপানী

হ্যাট্যার্সলি ও অন্যান্য পায়ে খাটান তাঁত অল্প বহরের মোটা কাপড়ের জন্য লওয়া হৌক।

দুয়ের কাজ এক সঙ্গেই চলুক এবং টানার নূতন প্রণালীর যন্ত্রও সেই সঙ্গে গৃহীত হউক— আমার প্যাম্ফলেটের পাঁচ নম্বরের প্লেটে তাহার একটা ছবি আছে। ইহা এমন জটিল কিছুই নয়— ভারতবর্ষে ইহা তৈরি করা চলিবে। মাকু দেবার প্রণালী শ্রীরামপুরে যেমন চলিতেছে, তেমনই চলুক, কিম্বা মিঃ কেলকারের কলের প্রণালীও দেখা যাইতে পারে! তাঁর বর্ত্তমান ঠিকানা হচ্চে— চসুরাজ পট, বাঙ্গলোর।

আমার না বলিলেও চলিবে যে, এ প্রকারের সমস্ত কার্য্যই ব্যবসাবুদ্ধি, রীতিমত বিচক্ষণতা এবং মিতব্যযিতার সঙ্গে পরিচালনা করিতে হইবে। একয়টি জিনিষ না থাকিলে ব্যবসা যত বেশিই ফাঁদাল হৌক না কেন, অকৃতকার্য্য হইতেই হইবে।

এই প্ল্যানে হাতেব তাঁতের কারবার খুলিলে শীঘ্রই দেখা যাইবে— শ্রীরামপুরে তঁ'তের সংখ্যা বাড়ান প্রয়োজন হইবে, না পাযে খাটান নূতন তাঁতের সংখ্যা বাড়ান প্রযোজন হইবে এবং কি পরিমাণ দুই প্রকার তাঁত হইলে বেশী কাজ পাইবার সম্ভাবনা। ইতি—

ভবদীয়
ই. বি. হেভেল

সরকারী আর্ট স্কুল,
২৮নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

বাউল

(১)

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না মা!

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর
হৃদয়ে তোর রতন রাশি,
জানি গো তার মূল্য জানি
পরের আদর কাড়ব না মা!
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
ধনে মানে লোকের টানে
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ভয় যে জাগে শিয়র বাগে—
কারো কাছেই হারব না মা—
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!

(২)

যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিস্‌নে কিছু!
আজ্‌কে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধূলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে রে তোর পিছু পিছু।

আজকে আপন মানের ভরে
থাক্‌ সে বসে গদির পরে
কালকে প্রেমে আস্‌বে নেমে
করবে সে তার মাথা নীচু।।

(৩)

ওরে তোরা
নেইবা কথা বল্লি ।।
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যি খানে
নেই জাগালি পল্লী ।।

মরিস্ মিথ্যে বকে ঝকে
দেখে কেবল হাসে লোকে,
না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন
মনে মনেই জ্বল্লি—
নেই জাগালি পল্লী ।।

অন্তরে তোর আছে কি যে
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে
চুপে চাপেই চল্লি—
নেই জাগালি পল্লী ।।

কাজ থাকে ত করগে না কাজ,
লাজ থাকে ত ঘুচাগে লাজ,
ওরে কে যে তোবে কি বলেছে
নেইবা তাতে টল্লি ।
নেই জাগালি পল্লী ।।

(৪)

যদি তোর ভাবনা থাকে
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না!
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা ।

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো
সবায় করবি কানা।।

যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন
কবিস্‌ ভারী বোঝা আপন
তবে তুই সইতে কভু পাববিনেরে
বিষম পথের টানা।।
যদি তোর আপন হতে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল তর্ক কবে সকল কথা
কর্ব্বি নানা খানা।।

(৫)

আপনি অপশ হলি তবে
বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্‌ নারে।।
করিস্‌নে লাজ করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই করেনে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি যারে।।
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস্‌নে আর কোনো মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে।।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,

অভয় চরণ শরণ করে
বাহির হয়ে যারে।।

(৬)

জোনাকি,
কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ!
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে,
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ।।

তুমি নও ত সূর্য্য, নও ত চন্দ্র,
তাই বলেই কি কম আনন্দ!
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে
আপন আলো জ্বেলেছ।।

তোমার যা আছে তা তোমার আছে,
তুমি নওগো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে
তারি আদেশ পেলেছ।।

তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,
তুমি ছোট হয়ে নও গো ছোট,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন করে ফেলেছ।।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে আমাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তদনুসারে "কনষ্টিট্যুশনল" আন্দোলনের প্রণালী আমাদের দেশে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক কি না? অথবা আমাদিগকে অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করিতে হইবে কি না?

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল

আমাদের দেশে এতকাল ধরিয়া যে প্রণালীতে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া আসিয়াছি তাহাকে ঠিক "কনষ্টিট্যুশনল" বলা যায় কি না, আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। কনষ্টিট্যুশন কথাটা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে কোনো বস্তুর যে কোনো মূলগঠন ও প্রকৃতি তাহাকেই কনষ্টিট্যুশন বলা যায়। এই অর্থে মানুষের দেহেরও একটা কনষ্টিট্যুশন, তাহার মনেরও একটা কনষ্টিট্যুশন, তাহার সমাজের, তাহার রাজকীয় ব্যবস্থার, সমুদায়েরই একটা কনষ্টিট্যুশন আছে। এই অর্থে কনষ্টিট্যুশন কথাকে বোধ হয় সংস্কৃত ধর্ম্ম কথাদ্বারা ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু কনষ্টিট্যুশনল কথাটা, রাজনীতিক্ষেত্রে একটু বিশেষ অর্থেই সর্ব্বদা যেন ব্যবহৃত হয় বলিয়া মনে হয়।

কনষ্টিট্যুশন একটা না একটা প্রত্যেক রাজনীতিতেই বিদ্যমান আছে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল রাজনীতিকে কনষ্টিট্যুশনল বিশেষণে বিশিষ্ট করা যায় না। রুশেরও একটা কনষ্টিট্যুশন আছে, কিন্তু তাই বলিয়া রুশের রাজশক্তিকে কনষ্টিট্যুশনল রাজত্ব বলা যায় না। ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে প্রজামণ্ডলীর স্বাভিমতের দ্বারা রাজকীয় শক্তি সংযত ও পরিচালিত হয়, সেই সকল স্থানেই রাজশক্তি কনষ্টিট্যুশনল উপাধি পাইয়া থাকে, সর্ব্বত্র নহে। রুশের রাজগ স্বেচ্ছাচারী, কন.ষ্টিট্যুশনল নহে; ব্রিটিশ রাজগ স্বেচ্ছাচারী নহে, কনষ্টিট্যুশনল।

যেখানে রাজগ কনষ্টিট্যুশনল কেবল সেইখানেই সত্যভাবে কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনের অবসর আছে, অন্যত্র নাই।

আমরা এতকাল যাহাকে এদেশে কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন বলিয়া আসিয়াছি, তাহা ঠিক কনষ্টিট্যুশনল নহে, কিন্তু লিগেল বা বিধিগর্ভ মাত্র। আইনের গণ্ডীর ভিতরে

থাকিয়া রাজকীয় বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিবাদ করাকেই আমরা এযাবৎকাল কনষ্টিট্যুশনল নামে গৌরবান্বিত করিয়াছি। ফলত আমাদের আন্দোলন কখনো এ গৌরবের অধিকারী হয় নাই।

কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন আইনসঙ্গত আন্দোলন, কিন্তু তাই বলিয়া আইনসঙ্গত আন্দোলন মাত্রেই কনষ্টিট্যুশনল নহে। আইন ভাঙ্গিলে কনষ্টিট্যুশন অমান্য করা হয়, এই জন্য কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন মাত্রেই আইনের গণ্ডী মানিয়া চলে; কিন্তু তাই বলিয়া যে কোনো আন্দোলন আইন মানিয়া চলে তাহাই কনষ্টিট্যুশনল হয় না।

যে রাজগতে প্রজার স্বস্ব স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রজাশক্তি দ্বারা রাজশক্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাকেই যেমন কনষ্টিট্যুশনল রাজগ বলে, সেইরূপ যে আন্দোলন দ্বারা প্রজাশক্তি যথাবিহিত রূপে রাজশক্তির উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাকেই কেবল কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন বলা যায়। যেখানে রাজগতে প্রজাশক্তি কোনো প্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, প্রজার মতামত গ্রাহ্য করা বা অগ্রাহ্য করা যেখানে রাজার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, যেখানে রাজকীয় ব্যাপারে প্রজার অভিমত প্রতিষ্ঠার কোনো যন্ত্র বা উপায় রাজকীয় কনষ্টিট্যুশনে নাই, সেখানে প্রজার আন্দোলনাদি আইন সম্মত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কদাপি কনষ্টিট্যুশনল হয় না।

কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনে রাজকীয় বিষয়ে কেবল প্রজার মতামত ব্যক্ত করিবার অবসর বোঝায় না, সে সকল মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার যথাযোগ্য অধিকারও বোঝাইয়া থাকে। মত প্রকাশের অবসর মাত্র আমাদের আছে, মত প্রতিষ্ঠার অধিকার কিছুই নাই। আর এই মত প্রকাশের অবসরও রাজকীয় অনুগ্রহের উপরে একান্তই নির্ভর করিতেছে। ইংরেজরাজ আজ যদি আমাদের সভাসমিতি ও সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া আইন পাশ করেন, সভা করিয়া তাহাদের নিকটে আমাদের দরখাস্ত পেশ করিবার ক্ষমতাও আর থাকিবে না। একে কনষ্টিট্যুশনল অধিকার বলে না। যেখানে কনষ্টিট্যুশনল অধিকার নাই, সেখানে কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনও অলীক কথা মাত্র।

কোনো রাজকীয় ব্যাপারের প্রতিবাদ মাত্রেই কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন নামে অভিহিত হইতে পারে না, হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী রাজ্যে ড্রাইফাস*

* ১৮৯৪ সালে ফরাসি সামরিক বাহিনীতে উচ্চপদস্থ অ্যালফ্রেড ড্রেফুস। জার্মান গুপ্তচর সন্দেহে নিগৃহীত ও নির্বাসিত, কেননা জন্মসূত্রে ইহুদি। ইহুদিবিদ্বেষজনিত এই অবিচারের প্রথম প্রতিবাদ করেন সাহিত্যিক এমিল জোলা — সংকলন সম্পাদক

[Dreyfus] সংঘটিত ব্যাপারে সমগ্র য়ুরোপ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাতে, মার্কিনে, লোকে ফরাসীর রাজপুরুষগণের ব্যবহারের প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এ আন্দোলনকে কখনো কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন বলা যায় নাই, বলা যাইতে পারিত না। কারণ ফরাসীর রাজব্যবস্থার উপরে আত্মমত প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার ও উপায় ইংলন্ডের বা মার্কিনের লোকের হাতে ছিল না। কিন্তু ফরাসীদেশে ড্রাইফাসব্যাপার লইয়া যে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন, কারণ আন্দোলনকারীগণের স্বমতপ্রতিষ্ঠার অধিকার ও উপায় উভয়ই তাঁহাদের হস্তে বিদ্যমান ছিল।

যেখানে প্রচার-আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া চীৎকার ও আবেদন করিবার অবসর আছে, কিন্তু আইন কানুনের দ্বারা যাহাদের উপর এমন কোনো অধিকার প্রদত্ত হয় নাই যে তাহারা রাজ্যশাসন বিষয়ে আপনাদের অভিমতকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, সেখানে প্রজার প্রকৃতপক্ষে কনষ্টিট্যুশনল অধিকার কিছুই নাই, কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনও সম্ভব নহে।

বিলাতে এই আন্দোলন সফল হয়, কারণ সেখানে এই আন্দোলনের গুণে যদি কোনো মত [মতে] প্রজাসাধারণের মতামত কোনো বিষয় সম্বন্ধে এক করিতে পারা যায়, তবে তাহারা তাহাদের প্রতিনিধিবর্গকে সেই মতানুযায়ী রাজকীয় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে বাধ্য করিতে পারে। রাজা সেখানে সাক্ষীগোপাল মাত্র। রাজমন্ত্রীগণই প্রকৃতপক্ষে সমুদায় রাজকীয় কার্য্য পরিচালনা করেন। এই সকল রাজমন্ত্রি প্রজাগণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া চলেন, না চলিলে তাঁহাদের মন্ত্রীপদ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। প্রজাবর্গকে কোনো বিষয়ে প্ররোচিত করিতে পারিলেই সে দেশে রাজাকে তত্তৎবিষয়ে উপনীত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়।

এখানে আমাদের মধ্যে সেরূপ কোনো অধিকার ও ব্যবস্থা নাই। আমাদিগকে যাঁহারা শাসন করেন, তাঁহারা বিলাতের রাজমন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়েন। তাঁদের পদ আমাদের শুভদৃষ্টির উপর নির্ভর করে না, বিলাতের প্রজাসাধারণের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে। আমরা কোনো বিষয়ে একান্ত একমত হইয়াও, আমাদিগের রাজকর্ম্মচারিদিগকে সে বিষয়ে নিয়োজিত করিতে পারি না। আমাদের মতামত কোনো প্রকারেই আমরা তাঁহাদের উপরে চালাইতে পারি না। সে অধিকার আমাদের নাই, সেরূপ প্রজামত প্রতিষ্ঠার কোনো যন্ত্র বা উপায় ব্রিটিশ ভারতের কনষ্টিট্যুশনের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। এ অবস্থায় আমরা আন্দোলন করিতে পারি, কিন্তু আইন সঙ্গত আন্দোলন হইতে পারে, কনষ্টিট্যুশন আন্দোলন হয় না।

আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যাহা, তাহাতে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনেও সফলতা আমাদের উপরে নির্ভর করে না, শুদ্ধ ইংরাজের অনুকম্পার উপরে নির্ভর করে। যে কার্য্যের সফলতা কর্ত্তার অধিকার বহির্ভূত, যাহা কর্ত্তার অধিকার ইচ্ছা বা শক্তির উপরে নির্ভর করে না, কিন্তু অপর কোনো ব্যক্তির সদাশয়তার উপরে নির্ভর করে, তাহাকে মানুষ সচরাচর প্রার্থনা বা ভিক্ষা নাম দিয়া থাকে। আমাদিগের রাজনৈতিক আন্দোলনকে কনষ্টিট্যুশনলই বলি বা লিগেলই বলি তাহা যে ভিক্ষা পর্য্যায়ভুক্ত ইহা কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না।

যাঁহারা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের এই আন্তরিক ভিক্ষাচর্য্য বহুদিন হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, বঙ্গব্যবচ্ছেদের ইতিহাস তাঁহাদের নিকটে কোনো নূতন তথ্য প্রকাশ করে নাই। এ আন্দোলনের নিস্ফলতা পূর্ব্বেই তাহারা অনুভব করিয়াছেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের আন্দোলনের বিফলতায় যদি দেশের লোকের চক্ষু ফোটে, তাহা হইলেই ইঁহারা কৃতার্থ হইবেন।

কনষ্টিট্যুশনল কথাটা ইংরেজী। ইহাতে যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করে তাহা আমাদের দেশে নাই, বিলাতের মাটিতেই কেবল তাহা পাওয়া যায়। আমরা ইংরেজের ভাষাতে ও ইংরেজের ইতিহাসে কথাটা শিখিয়া তাহা মনে মনে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছি। এতকাল ধরিয়া আমরা আপনাদিগকে ইংরেজের প্রজা জানিয়া ইংরেজ-প্রজার সর্ব্ববিধ স্বত্বস্বাধীনতার অধিকারী বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি। ইংরেজের প্রজা এক কথা আর ইংরেজপ্রজা যে অন্য কথা ইহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই জন্য ইংরেজপ্রজার স্বত্বস্বাধীনতা দাবী করিয়া ইংরেজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি। এই জন্যই ইংরেজপ্রজাগণ যে ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন করে, আমরাও সেইভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া সফলকাম হইব ভাবিয়াছিলাম। ইংরেজপ্রজার আন্দোলন আবেদনের পশ্চাতে একটা বিপুল রাজনৈতিক শক্তি আছে, আমাদের যে তাহা আদোপেই নাই, একথা আমাদের মনে পড়ে নাই।

ফলত আন্দোলন কেবল কথায় হয় না। আন্দোলনের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রত করা। ইংরেজ প্রজারা আন্দোলন করিয়া আপনাদিগের প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। সেই শক্তি যতক্ষণ না উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ততক্ষণ আন্দোলন সফল হয় না। ব্রাইট [Bright] কবডনের [Cobden] সময়ে শস্য-আইন লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল, কিন্তু যতক্ষণ না প্রজাসাধারণে উন্মত্তের ন্যায় এই অসঙ্গত বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, ততক্ষণ এই আন্দোলন সফল হয় নাই।

প্রজাশক্তিকে উপেক্ষা করা যখন অসাধ্য হইয়া পড়িল তখনই এন্টিকরণ লীগের [Anti-Corn Law League] চেষ্টা সম্যকরূপে ফলবতী হইয়া উঠিল। যদি তখনো ইংরাজ রাজমন্ত্রিগণ ঐ অসঙ্গত বিধান একেবারে বর্জ্জন না করিতেন, ইংরেজ প্রজাসাধারণে বক্তৃতা ছাড়িয়া বন্দুক ধরিত। এই বন্দুকের ভয়েই ফলত তাহাদের ঐ আন্দোলনকে সফলকাম করিয়া তুলিয়াছিল।

কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনের শক্তি বস্তুত সর্ব্বত্রই কনষ্টিট্যুশনের গণ্ডীর বাহিরে যত ভিতরে তত নহে। বিশেষতঃ যেখানে রাজকীয় কনষ্টিট্যুশনে প্রজাশক্তি সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, যেখানে রাজকীয় ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোনো যন্ত্র বা উপায় নাই যদ্দারা প্রজাসাধারণের অভিমত নির্ব্বিবাদে পরিপূর্ণ মাত্রায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, সেখানে কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনের মূল শক্তি কনষ্টিট্যুশন বহির্ভূত কার্য্য করিবার সম্ভাবনা হইতেই উৎপন্ন হয়। ভারতে ইংরেজশাসনের প্রথম যুগে, প্রজাগণ যখনো নূতন রাজশক্তির অনিষ্টসাধনে [একেবারে অক্ষম] হইয়া পড়ে নাই, তখন কনষ্টিট্যুশনল অধিকার না থাকিলেও, প্রজাগণের আন্দোলন আবেদনের একটা বল ছিল, যাহা এখন আর নাই। সিপাহীবিপ্লবের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরে যদি আমাদের কন্‌গ্রেসের দলের মত একটা দল দেশে থাকিত তবে ইংরেজ নতজানু হইয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে নিযুক্ত হইত। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে তাঁহার মতামত জানিবার জন্য ইংরেজরাজ সে সময়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে প্রতি সোমবারে বড়লাট ক্যানিং সাহেব প্রাতঃকালে হিন্দু পেট্রিয়ট না দেখিয়া নিরুদ্বেগে প্রাতরাশে বসিতে পারিতেন না। আজ ইংরেজ দেশীয় সংবাদপত্রের মতামতকে নিয়ত উপেক্ষা করিয়া চলে।

ইহার কারণ এই সে সময়ে রাজকীয় কনষ্টিট্যুশনে ভারতের প্রজামণ্ডলীর আত্মমত প্রতিষ্ঠার কোনো উপায় না থাকিলেও, কনষ্টিট্যুশনকে ভাঙ্গিয়া দিবার শক্তি তাহাদের ছিল। এই জন্যই ইংরেজ তখন প্রজার মতামতের প্রতি এমন দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন।

আমাদিগকে যে, দেশের রাজনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য আইনী কাজ করিতেই হইবে, এমন কোনো কথা নাই। এমন উপদেশও দেই নাই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনাদিকে পূর্ব্বে যেমন এখনো সেইরূপ যথাসাধ্য আইনের গণ্ডীর মধ্যেই রাখিতে হইবে। ইহাকে যদি কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলন বলিতে ইচ্ছা হয় বল, কথা লইয়া কাটাকাটী করাতে কোনো ফল নাই। কিন্তু এইটি বড় করিয়া বুঝিতে হইবে

যে আন্দোলনের কার্য্য আইনের সীমার ভিতরে হইলেও, আন্দোলনের শক্তিটা এমন হওয়া চাই, যাহাতে তাহাকে আইন পর্য্যন্ত ভর [ভয] করিয়া চলিতে বাধ্য হইবে।

যে আন্দোলনে লোকের প্রাণে ভয় হয় না, রাজনীতি ক্ষেত্রে সে আন্দোলনে কোনো ফল হয় না। রাজনীতির প্রধান ভাবই ভয়। রাজা যেখানে প্রজাকে ভয় করে, সেখানে সে প্রজার অভিমতে চলে, প্রজার স্বত্ব-স্বার্থরক্ষণে প্রাণপণ যত্নশীল হয়। প্রজা যেখানে রাজাকে ভয় করে, সেখানে সে রাজবিধি মান্য করিয়া চলে;—সেখানে জনগণ মধ্যে অরাজকতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ ও ধর্ম্মবন্ধকে শিথিল করিতে পারে না। রাজা প্রজাকে ভয় করিবে, প্রজা রাজাকে ভয় করিবে, ইহাই রাজনীতির মূল কথা।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যাহারা রাজগী পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রজামণ্ডলী হইতে আর কোনো বিপদ আশঙ্কা করেন না। প্রজাগণ নির্ব্বীর্য্য, নিশ্চেষ্ট, নিরস্ত্র, বিচ্ছিন্ন ও জড়তাপন্ন হইয়া আছে সুতরাং রাজাও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে আন্দোলনের দ্বারা কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাংলাদেশে প্রজাশক্তি বলিয়া কোনো শক্তি বিদ্যমান থাকিলে, ইংরেজ এমন কবিয়া দেশশুদ্ধ লোকের সকরুণ আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া এমনিভাবে বাংলাদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে কখনো সাহসী হইত না। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে একথা ইংরেজ কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রবিধি প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালেও ইংরেজরাজ এমন কথা ভাবিতে সাহস পাইত না। এখন যে প্রজামণ্ডলীর মতামতকে এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়া চলিয়াছে, ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এই যে ইংরেজ আর এখন এদেশের প্রজাশক্তিকে ভয় করে না।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ যদি আমাদিগকে কোনো শিক্ষা দিয়া থাকে তাহা এই যে দেশমধ্যে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

এইজন্য এখনকার আন্দোলন পূর্ব্বকার আন্দোলনের মত রাজার অনুকম্পা প্রার্থনা করিবে না, কিন্তু প্রজার আত্মশক্তির সাধনা করিবে।

প্রাচীন আন্দোলনে প্রজাশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া রাজ-অধিকার বাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন রাজ-অধিকার যথাসাধ্য সংকীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে [রাখিয়া] প্রজাশক্তির প্রসার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কর্ম্মেই শক্তি বৃদ্ধি হয়, ভিক্ষায় বা প্রার্থনায় নহে। আমাদিগকে এই জন্য এখন ভিক্ষার পথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কর্ম্মে শক্তি জাগিবে। শক্তি জাগিলে

শক্তিশালী ও অনিষ্টসাধনক্ষম প্রজামণ্ডলী যাহা চাহিবে, আত্মরক্ষার জন্য রাজাকে তাহাই করিতে হইবে। তখন আমাদের আন্দোলন কনষ্টিট্যুশনল না হইলেও শক্তিশালী হইবে। আর রাজকীয় ব্যবস্থায় ব্রিটিশভারতের কনষ্টিট্যুশনে, তখন আমাদের স্বমত প্রতিষ্ঠা করিবার উপযোগী যন্ত্র এবং উপায়ই স্বতঃ ফুড়িয়া উঠিবে। তখন পূর্ণমাত্রায় আমাদের এই আন্দোলনই প্রকৃত অর্থে কনষ্টিট্যুশনল হইয়া উঠিবে।

২। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

কনষ্টিট্যুশন কথাটা আমাদের সংস্কৃত "ধর্ম্ম" কথাটার মত ব্যাপক। সুতরাং ইহার প্রতিশব্দ পাওয়া দুষ্কর।

একটা জিনিষের প্রকৃতি, গঠন প্রভৃতি লইয়া তাহার যে সাম্য— শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্রাদির যেমন সাম্য, মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও বৃত্তির যেরূপ সাম্য— সেই সাম্যটিকে এক কথায় শরীর অথবা মনের কনষ্টিট্যুশন বলা চলে। কথাটা ক্রমে সমাজ ও রাজ্যতন্ত্রসম্বন্ধেও খাটিতেছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার অর্থ কিন্তু একটু পৃথক হইয়া আসিতেছে। ইংলন্ডের কনষ্টিট্যুশন আছে, রুশের নাই। কারণ ইংলন্ডে প্রজাশক্তি রাজশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, প্রজার স্বাভিমতের উপর রাজা দণ্ডায়মান। রুশে রাজা স্বেচ্ছাধীন, প্রজার তাঁহার উপর কোন হাত নাই, সুতরাং কনষ্টিট্যুশন কথাটা সেখানে খাটে না।

ইংলন্ডের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ম্যাগ্‌নাকার্টা হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি বৃহৎ ব্যাপার ইংলন্ডে ঘটিয়াছে— যাহাতে প্রজা নিজের স্বত্ব ও স্বাধীনতা রাজার সম্মুখে দাবী করিয়াছে এবং লাভ করিয়াছে— সে সমস্তই তাহার কনষ্টিট্যুশনগঠনে এক একটি ইষ্টকের ন্যায় এবং বহুযুগ ধরিয়া এই গঠনপ্রণালী চলার জন্য রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বোঝাপড়া ইংরাজ করিয়া লইয়াছে। এখন তাহার প্রজাশক্তিকে স্বীকার না করিয়া রাজশক্তির উপায় নাই।

ইংরাজী ইতিহাস পড়িয়া এইটুকু আমরা শিখিয়াছি। তাই আমরাও মনে মনে নিজেদের ইংরাজপ্রজা ভাবিয়া লইয়াছি এবং কংগ্রেসকে পার্লামেন্ট সভা মনে

করিয়াছি। কথাটা সত্য। কিন্তু ইংরাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আর একটু পরিষ্কার করিয়া বোঝা প্রয়োজন।

বিজেতা বলিয়া ইংরাজ আমাদের প্রথম হইতেই তাড়না করে নাই— "Humanitarianism" অর্থাৎ মনুষ্যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বিস্তার ইংলন্ডের সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল। এই মন্ত্রের জন্যই লক্ষকোটী টাকা তুলিয়া কৃতদাস ক্রয় প্রথা ইংরাজ উঠাইয়াছিল; গ্রীসের প্রতি সম্মানের জন্য Ionian Island ছাড়িয়া দিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতায় বড় বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পাকে চক্রে দেশটি আত্মসাৎ করিলেও ইংরাজের হাতে আমাদের প্রথমতঃ সম্মান ছিল, ইতিহাসে সে কথা সাক্ষ্য দেয়। কারণ তখনও ইংরাজের শক্তি সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ন নিরুপদ্রব ও নিরুদ্বেগে বসিয়া যায় নাই, প্রজার দিকে তাহাকে তাকাইতে হইত। ইংরাজ তাই শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার জন্য উৎসুকই ছিল।

সাম্রাজ্যলোলুপতা ও পরপীড়ন আজ তাহার চিত্তকে একান্ত গ্রাস করিয়াছে এবং বলিতে কি, সমস্ত সভ্য ইয়োরোপকেই তাহা গ্রাস করিয়াছে এবং এশিয়া ও অসভ্য আফ্রিকাই তাহাদের ভক্ষ্য সামগ্রী। আফ্রিকা ত তাহারা বাঁটিয়া লইয়াছেই, এশিয়াকে আজও পারে নাই। সুতরাং কঠিন সংগ্রাম বাধিয়াছে। ভারতবর্ষের সে সংগ্রামে কিছু করিবার নাই বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের সংগ্রাম নিজের সঙ্গে— অস্ত্রশস্ত্র দিয়া না হোক— আপনার মধ্যে আপনি এক ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য যতটুকু সংগ্রাম তাহা তাহাকে করিতেই হইবে।

কথাটা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটি না বুঝিলে কনষ্টিট্যুশনল আন্দোলনের প্রয়োজন আছে কি না বিচার করা চলিবে না। কনষ্টিট্যুশন ব্যাপারটা কি আমাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় লাঞ্ছিত— অষ্ট্রেলিয়ায় poll-tax পীড়িত আমরা কেন এবং ভারতবর্ষে কুকুর বিড়ালের ন্যায় পদদলিত ও অত্যাচারিত কেন?

কনষ্টিট্যুশনে আমরা কেহ নই। আমাদের ইংরাজ প্রজা বলিয়া স্বীকার করিবে না— দাস বলিয়া মানিবে। সুতরাং সে আন্দোলনের নাম ভিক্ষাবৃত্তি—ন্যায্য অধিকার যাচ্ঞা নহে।

ইংলন্ডের প্রজার নিকটে ইংরাজরাজ যদি বঙ্গব্যবচ্ছেদের ন্যায় একটি প্রস্তাবও আনিতেন— সমস্ত ইংলন্ড লাঠিসোটা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হইত এবং ইংলন্ডের কনষ্টিট্যুশনও তাহা পারে না। কারণ তাহার মন্ত্রিসভা প্রজারাই নির্ব্বাচন

করে এবং তাহারা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য প্রজার নিকট দায়ী। আমরা কাহাকে নির্ব্বাচন করি— আমাদের কিসের অধিকার? আমরা কি British subject? তবে Daily News লিখিতেন না যে তরবারি দিয়া জয় করিয়া তরবারি দিয়া শাসন করিব— একটু বিনয় খরচ করিতেন।

আমাদের অবস্থাটা বঙ্গব্যবচ্ছেদে ইংরেজ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। ম্যাগ্‌নাকার্টা বলিয়া কোন দলিল আমাদের নাই— আমরা চার্লস দি ফার্স্টের মাথা পড়িয়া ফেলি নাই— আমরা চিরকাল দাসজাতি— নিগ্রোদের চাইতে একধাপও উচ্চে নয়।

সুতরাং কনষ্টিট্যুশনল কথাটা ছাড়িয়া এখন ভাবা যাক্‌ যে আমরা কি করিতে পারি। আন্দোলন চেষ্টা ত ব্যর্থ হইল। আমরা কি করিব তবে?

ইংরাজের দিক হইতে ফিরাইয়া সমস্ত কর্ম্মভার যদি আমরা নিজের স্কন্ধে লইতে পারি— তবে সেই কর্ম্মে আমরা ঐক্য কাহাকে বলে শিখিব— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও আত্মাভিমান ছাড়িতে পারিব। কর্ম্মেই বল দেয় এবং আর একটা জিনিষ দেয় সেটি আরও বড়। সেটি হচ্ছে, পরকে নিজের মত সম্মান করিতে শিখা। ইংলণ্ডে পলিটিক্স কত বিরোধকে কত বিভিন্ন স্বার্থকে ঐক্যপাশে বাঁধিয়া টিকিয়া আছে। আমাদেরও সমাজে, ধর্ম্মে, বিধিব্যবস্থায় ও দর্শনে আমরাও যে সামঞ্জস্যকে স্বীকার করিয়াছি— কর্ম্মক্ষেত্রে স্বীকার না করিব কেন? দেশের চিন্তাশীল ও কর্ম্মঠ ব্যক্তিগণ কর্ম্ম কি ভাবে করিলে ভাল হইবে, তাহা যদি ভাল করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লন, তবেই ভাল হয় এবং সেই বোঝাপড়ার কালে যদি রীতিমত একটি বৃহৎ স্বদেশীসভা সংস্থাপিত হয়, যাহাতে রিজোল্যুশন আর গভর্ণমেন্টে না গিয়া নিজের দেশের লোকের কাছেই ফিরিয়া আসে, তবেই জানিব যে জগতে কোনদিন আমাদের স্থান হইবে। বিশ্বমানব আমাদের ঠেলিয়া দূরে রাখিবে না— নচেৎ কেবল ভিক্ষাদ্বারা কোন জাতি কোনকালে এক হয় নাই ও শক্তিশালী হয় নাই ইহা স্বীকার করিবই।

৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী

Constitutional agitation আমাদের পক্ষে রাখা উচিত কিম্বা ছাড়া উচিত এ প্রশ্নের দুকথায় উত্তর দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে যখন আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর মতভেদ উপস্থিত হয়েছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক বল্‌বার কথ' আছে এবং উভয় পক্ষেই যখন বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান লোক আছেন তখন দুপাতায় এর নিষ্পত্তি করে দেবার আশা করাটা শধু পাগলামি হবে। মত এক কথায় দেওয়া যায, কিন্তু নিজের মত যুক্তিদ্বারা প্রমাণ কর্‌তে হলে অন্ততঃ তিনটি [...] আবশ্যক। আমি এ প্রবন্ধে উপস্থিত প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা কব্‌তে যাচ্ছি নে, আমাব ইচ্ছা শুধু তর্কের খেঁই ধরিযে দেওয়া। সময়ান্তরে যদি কেহ অ'মাকে বিচারে আহ্বান করেন,তা হলে আমি তাঁর নিমন্ত্রণ আদরে রক্ষা কর্‌ব।

যে জিনিষটা চলে আস্‌ছে, য' আমাদের অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাব চলন যদি কেউ বন্ধ কর্‌বাব উপদেশ দেন তা হলে আমরা তাঁর কাজেই [কাছেই] কৈফিয়ৎ চাই। যিনি আপত্তি করেন, আপত্তি সমর্থন কর্‌বার ভার তাঁব উপব। Constitutional agitation কতদিন থেকে আমাদের দেশে চলে আস্‌ছে ঠিক বল্‌তে পারি নে, আমি ত আমার জ্ঞান হয়ে অবধি ব্যাপারটা চল্‌ছে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং বিপক্ষবাদীরা কি বলেন সেই কথাই হচ্ছে প্রথম বিবেচ্য। রাজনৈতিক আন্দোলনের নিন্দাবাদও শিশুকাল থেকে শুনে আস্‌ছি। অনেকের এইরূপ ধারণা যে "হুজুগ" এই শব্দটি ব্যবহার করলেই রাজনৈতিক দলের চরম সমালোচনা হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে যাঁরা শুধু নিজের চরকায় তেল দেন তাঁদের জ্ঞান এবং বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়ে গেল। "ভারত উদ্ধার" ও ত অনেকদিন থেকে বাঙ্গালীর সমাজে একটি বিদ্রুপের [বিদ্রূপের] বাক্য হয়ে উঠেছে। যাঁর অন্য কোন রসিকতা যোটে না তিনি "ভারত উদ্ধার কর্‌ছ" এই কথা কটি বলেই হাস্য করেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ঐ কথা কটি বলেই তিনি নিজেকে সুরসিক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ কর্‌তেন। ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারক দলও আমাদের দেশের লোকের politics নিয়ে নাড়াচাড়ার বিরুদ্ধে। তাঁদের বিশ্বাস আমাদের নিজের এত দোষ আছে যে তার সংশোধন না করে রাজার কার্য্যের দোষ সংশোধন কর্‌তে যাওয়াটা হচ্ছে ছেলেমি। সমাজ হতে আমাদের অবনতির কারণ সব দূর কর, তারপরে

রাজনীতি চর্চ্চা কর্‌বার দিন আস্‌বে। আগে নীতি পরে রাজনীতি। রাজপুরুষরা এই দলের খুব পক্ষপাতী এবং এই শ্রেণীর লোকদের তাঁরা যথার্থ স্বদেশহিতৈষী বলে গণ্য করেন এবং প্রশংসা করেন। কিন্তু উপরোক্ত প্রকারের ওজর আপত্তি সত্ত্বেও রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের দেশে অনেকটা চারিয়ে গেছে এবং অনেকটা পুষ্টিলাভ করেছে। এবং কোন বুদ্ধিমান্ লোক একথাও অস্বীকার করবেন না যে উপরোক্ত সমালোচকদের কথার ভিতর কতকটা সত্য নিহিত আছে। তবে সে সমালোচনা সত্ত্বেও রাজনৈতিক আন্দোলন কেন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে? উত্তর হচ্ছে, যে সমাজের প্রাণ আছে, সে সমাজের অবস্থানুসারে কতকগুলি কর্ত্তব্য বুদ্ধি জেগে ওঠে। আমাদের কারও সাধ্য নেই যে, সমাজের অবস্থোপযোগী মনের গতি একেবারে ফিরিয়ে দেই। সমালোচনার উদ্দেশ্য যাই হোক, কার্য্য হচ্ছে সেই গতিকে বিক্ষিপ্ত না হতে দেওয়া এবং ঠিক পথে চালান।

আমি পূর্ব্বে যা বল্‌লুম তার উত্তরে অপর পক্ষ হেসে বল্‌বেন "আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু Constitutional agitation এর বিরুদ্ধে।" রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে Constitutional agitation এর পার্থক্য কোথায় সেটা সকলে সকল সময়ে ধরতে পারে না। পলিটিক্স যাদের ব্যবসা নয়, তারা সহজেই একের সঙ্গে আর ঘুলিয়ে ফেলে। বক্তারা এক ভাবে বলেন শ্রোতারা আর এক ভাবে বোঝে এবং তাতে তাদের দোষও দেওয়া যায় না, কারণ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে Constitutional agitation এর তফাৎটা কোথায় তা তাঁরাও বড় স্পষ্ট করে বোঝান না। তাঁরা যখন বলেন যে, এ দুই এক নয়, তখন তাঁরা কি বলতে চান আমার বিশ্বাস আমি তা বুঝি। তাঁদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক আন্দোলন আজ পর্য্যন্ত যে পদ্ধতিতে চলে আস্‌ছে সেটি মনোনীত নয়। Method নিয়েই পূর্বপক্ষের সঙ্গে উত্তর পক্ষের মতভেদ।— আপত্তিকারকেরা কোথায়ও যে বেশ বিচার করে চারিদিক দেখিয়ে যুক্তিদ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন করেছেন বলে আমি জানিনে কিন্তু তাঁরা যে গোটা কতক ধুয়া ধরিয়ে দেবার চেষ্টায় আছেন সেইটিই আমার জানা আছে। ধুয়ার মাহাত্ম্য আমি অস্বীকার করি নে। সমাজের মধ্যে নতুন মনোভাব আন্‌তে হলে নতুন কথা চাই। ধুয়ার দ্বারা সমাজের যেমন উপকার হয় আবার তেমনি অপকারও হয়— সুতরাং দুচারিটি নতুন ধুয়া করে নেওয়াতে আশা করি কারও আপত্তি হবে না।

যাদের Constitution নেই তাদের আবার Constitutional agitation কি? এই কথাটি প্রায়ই শোনা যায় এবং হটাৎ [হঠাৎ] শুনতে সত্য বলে মনে হয়। "যার

মাথা নেই তার মাথাব্যথা" এই কথাটা যতটা সত্য ঠিক ততটা সত্য বলেই বোধ হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে কথাটা মোটেই সত্য নয়।— Constitutional agitation এর অর্থ Constitutional উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলন। বৈধ অর্থাৎ আইনসঙ্গত উপায়ে রাজ কার্য্যের বিচার প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা। রুসিয়া ব্যতীত ইউরোপের অপর সকল দেশে এ বিষয়ে প্রজার যে অধিকার যে স্বাধীনতা আছে আমাদেরও ঠিক সেই অধিকার ঠিক সেই পরিমাণে আছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভা সমিতি কর্‌বার এবং বক্তৃতা কর্‌বার অধিকার অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও সম্পূর্ণ আছে। এবং ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের কিছু মাত্র পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে ইউরোপের লোক এই অধিকার কতটা বহুমূল্য মনে করে। ফরাসী বিপ্লবের পর যখন প্রজা রাজা হয়ে আইন গড়্‌তে বস্‌লেন তখন প্রথম কথা তাঁরা এই লিখলেন যে "মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন" "সভা সমিতি করে বক্তৃতা করা বৈধ", প্রজার এই অধিকার তাঁরা সর্ব্বোচ্চ মনে করেছিলেন। কারণ ইউরোপের লোকের এই ধারণা যে, রাজার অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যত প্রকার উপায় আছে, রাজ কার্য্যের সমালোচনা সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। বাহুবল মনের বলের কাছে পরাজিত। আর এও ইউরোপের ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান যে, সে দেশের রাজারা স্বাধীন চিন্তাকে যতদূর ভয় করে এসেছেন— এমন আর কিছুতেই ভয় করেন নি। ইউরোপে অনেক মেধাবী দার্শনিক বৈজ্ঞানিককে জেলে যেতে হয়েছে, অনেককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আজও রুশিয়ায় যদি কেউ Mill এর Political Economy র তরজমা করেন তাহলে তাঁকে সাইবেরিয়া যেতে হয়। রাজার প্রজার ভেদ ভগবানকৃত, রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত, এবিশ্বাস সাধারণের মনে যতদিন থাকে, ততদিন প্রজা যা মনে নেয় যা সহ্য করে, রাজা ও রাজ্য মানুষের হাতে গড়া, এবং কেবল মাত্র একটি সামাজিক জিনিষ, এ ধারণা মনে উদয় হলে তা মানতে পারে না এবং সহ্যও করে না। অপরের মনের বদল শুধু নিজের মন দিয়ে করা যায়। সুতরাং রাজনীতি সম্বন্ধে চিন্তা এবং বিচার কর্‌বার স্বাধীনতা মনুষ্যসমাজ নিজের একটা প্রধান অধিকার মনে করে। এ ছাড়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে তর্কবিচার বাক্ বিতণ্ডা করবার আরও একটি উপকার আছে। সে উপকার যে কি সে সম্বন্ধে Walter Bagehot এর Physics এবং Politics নামক গ্রন্থে Age of discussion নামক অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁদের আমি অনুরোধ করি যে Bagehot এর বক্তব্য কথাগুলির একবার বিচার করে দেখেন। তিনি এই কথাটি সমাজকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে অসভ্য অবস্থা হতে সভ্য অবস্থার এই একটি

প্রধান পার্থক্য যে শেষোক্ত অবস্থায় মানুষের হটকারীতা [হঠকারিতা] অনেকটা কমে আসে। অসভ্য অবস্থায় মানুষ যা মনে উদয় হয় তখনি তা মুখে প্রকাশ করে, মনে একটি প্রবৃত্তির উদয় হলে তখনি তা কার্য্যে পরিণত করে। কিন্তু সভ্য অবস্থায় মানুষ অনেকটা আত্মসংযত হয়। কর্ত্তব্য বুদ্ধি এবং স্বার্থবুদ্ধি দুয়ে জড়িয়ে মানুষকে কোন একটা কার্য্য করবার পূর্ব্বে ভবিষ্যতের ফলাফল সম্বন্ধে বিচার করে দেখতে বাধ্য করে। ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী না হয়ে মানবসমাজ স্থায়ী মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে কাজ করে।— প্রকৃতি-অনুসারে কাজ করা অল্প বিস্তর স্থগিত রাখে। সভ্য জগতে রাজা প্রজা মানসিক ধর্ম্মের অধীন। একথা যদি সত্য হয় তাহলে রাজকার্য্যের কেবল কথায় প্রতিবাদের যে যে ফল আছে তা মানতেই হবে। কেন না তর্ক বিচার হটকারীতায় [হঠকারিতায়] বাধা দেবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যেখানে রাজার মতের সঙ্গে প্রজার মতের বিরোধ উপস্থিত হয় সে ক্ষেত্রে যে সকল সময়ে প্রজায় মত সম্পূর্ণ বজায় থাকে তাও নয় এবং সকল সময়ে যে রাজার মত বজায় থাকে তাও নয়, অধিকাংশ সময়ে একটা মাঝামাঝি রফা হয়। যখন পৃথিবীতে মানুষে মানুষে শুধু মতের নয়, স্বার্থের বিরোধ আছে, তখন সমগ্র সমাজের উন্নতি রফার দ্বারায় সাধিত হয়। এই সকল যুক্তির উত্তরে অনেকে বল্‌বেন যে স্বাধীন দেশের পক্ষে যা সত্য, অধীনদেশের পক্ষে তা সত্য নয়। আমি এ সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বীকার করতে রাজি আছি, যদি তার অর্থ হয় যে স্বাধীনদেশের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যে পরিমানে সত্য, অধীনদেশের পক্ষে সে পরিমাণে সত্য নয়। যদি কেউ বলেন যে, স্বাধীনদেশে Constitutional agitation-এ পনেরো আনা ফল পাওয়া যায়, আর অধীনদেশে এক আনা ফল পাওয়া যায়, তাতেও আমি প্রতিবাদ করব না। যদিও আমার বিশ্বাস যে, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা— পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজও রাজকার্য্য শুধু প্রজার স্বার্থ, প্রজার মঙ্গল দেখেই করা হয় না। যে শ্রেণীর লোক সে সকল দেশে রাজকার্য্য চালান, তাঁরা স্বল্পসংখ্যক, তাঁদের স্বার্থ এবং অধিকাংশ প্রজার স্বার্থবিরোধী; কিন্তু তাঁরা বিদ্যাবুদ্ধি ধনের বলে বলী হয়ে ক্রমাগত প্রজামণ্ডলীকে বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনা করে আস্‌ছেন এবং তাঁদের স্বশ্রেণীর কোন লোক যথা Tolstoy তাঁদের যদি সত্য কথা শোনান্ তাহলে যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক তাঁকে পাগল বলে উপহাস করে। আমরা বিদেশীর অধীন এবং সেই সঙ্গে ধনীরও অধীন, তারা উচ্চশ্রেণীর লোক এবং শুধু ধনীর অধীন; কিন্তু ধনের অধীনতা সামান্য অধীনতা নয়। সুতরাং Constitutional agitation এ তারা পনেরো আনার চেয়ে ঢের কম ফল পায়। সে যাই হোক, আমরা যদি শুধু এক আনা ফল পাই সেই এক আনা কেন ছাড়্‌ব, তা বুঝতে পারি নে। তবে যদি কেহ

বলেন যে ওতে এক কড়ারও ফয়দা নেই, তাহলে তার সঙ্গে তর্ক বৃথা। ইংরেজিতে যাকে facts বলে সেই বিষয়ে কতকটা ধারণার মিল না থাকলে যুক্তি কিসের উপর খাড়া করা যাবে?

আর একটি বিষয় বিবেচ্য। যদি কোন বিষয়ে এক আনা লাভ কর্‌তে গিয়ে বারো আনা লোকসান হয় তাহলে অবশ্য সে এক আনা লাভের পন্থা ছেড়ে দিতে হবে। Constitutional agitation কে যাঁরা ছেরেপ্‌ ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে করেন তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটা নিস্ফল প্রমাণ কর্‌বার কোন দরকার নেই। তাঁরা বল্‌বেন, স্বীকার কর্‌লুম তোমরা ভিক্ষা করে কিছু পেতে পার কিম্বা পেয়ে থাক, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে অনেক বহুমূল্য জিনিষ হারাও, যেমন আত্মসম্মান, চরিত্রের বল, স্বাবলম্বন ইত্যাদি। বিশেষতঃ ভিক্ষাবৃত্তিতে তোমাদের যখন পেট ভরে না, তখন জাতি যাওয়াটা নিতান্তই দুঃখের এবং আপশোষের বিষয়। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষুধা ভাল করে মেটে না বলেই আমরা রাগে দুঃখে নৈরাশ্যে অধীর হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির উপর বীতরাগ হই এবং কড়া কথা বলি। ভিক্ষাবৃত্তি যে কারও পক্ষে শ্রেয়ঃ নয়, এবিষয়ে বোধ হয় কারও মতভেদ নেই। ইউরোপ থেকে অনেক ভালমন্দ জিনিষ আমরা লাভ করেছি, আমাদের আধুনিক শিক্ষা আমাদের মনে জাতীয় জীবনের উন্নতির প্রতিকূল এবং অনুকূল অনেক নূতন ভাব এনে দিয়েছে অনেক নূতন শক্তি জাগিয়ে তুলেছে। ইউরোপীয় শিক্ষার বলে আমাদের মনে যে ভিক্ষা জিনিষটের প্রতি ঘৃণা এবং যা চাই তা অর্জ্জন করবার স্পৃহা জন্মে দিয়েছে এটা আমি খাঁটি লাভ মনে করি। যে সমাজে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কিম্বা জাতি বিশেষের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ, সে সমাজে অনুনয় বিনয় তোষামোদ কান্নাকাটির নিজের অবস্থার একটা মহৎ উপায় বলে পরিগণিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য প্রবলের স্তুতিবাদ এবং প্রসাদ ভিক্ষায় পরিপূর্ণ। মনুপ্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রজাকে রাজার নিকট ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন অধিকার দেয় নি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পৃথিবীর অনেক আপদ জঞ্জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেল্‌ছে, তাঁদের যুক্তির মুখে সাধারণতঃ লোকে যা শ্রদ্ধেয় বলে মনে করে এমন অনেক রীতিনীতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কখনও রাজনীতিতে ভাল করে প্রযুক্ত হয়নি। মহাভারতাদি গ্রন্থে এখানে ওখানে রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ ছড়ান আছে, কিন্তু প্রজার অধিকার সম্বন্ধে কোনও কথা নেই। ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করা না করা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। প্রজাশক্তিদ্বারা রাজশক্তি নিয়মিত সংযত কর্‌বার কোনও উপায় ব্রাহ্মণেরা আবিষ্কার করেননি। বরং ইউরোপের মধ্য যুগে church যেমন state এর প্রধান সহায় ছিল তেমনি সাহিত্য থেকে যতটা অনুমান করা যেতে পারে

পুরাকালে ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় রাজাদের তেমনি সহায় ছিলেন। উভয় শ্রেণীর পুরোহিতে রাজাকে ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে কর্ত্তব্যপথে চালাতে চেষ্টা কর্তেন, কিন্তু যাতে করে রাজার পক্ষে স্বেচ্ছাচার অসম্ভব হয়, এমন ক্ষমতা প্রজার হাতে তাঁরা কখনই দেননি। পরস্পরের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করে দিলেই সমাজ গঠিত হয়ে ওঠে না, পরস্পরকে যাতে তাদের কর্ত্তব্য পালন করাতে পারে, তার উপায় যতদিন উদ্ভাবিত না হয় ততদিন সমাজের স্থিতি এবং উন্নতির কোন স্থিরতা থাকে না। এই কারণেই রাজদ্বারে শুধু প্রসাদ ভিক্ষার জন্যই আমরা উপস্থিত হতুম। রাজকার্য্যের সমালোচনা প্রতিবাদ রাজনিন্দা প্রভৃতি আমরা সেই দেশ থেকে আমদানি করেছি যে দেশে প্রজার অধিকার আছে; যতদিন Rights of man এর ধারণা জন্মে, যেন ততদিন পৃথিবীর সকল দেশেই সকল জাতির প্রজার মনে রাজার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ কেবলমাত্র দাতা ও গৃহীতার [গ্রহীতার] সম্বন্ধ ছিল। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী পক্ষ ছিলেন তাঁদের মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে ঐ ভিক্ষুকের ভাবটাই বর্ত্তমান ছিল। রাজকার্য্যের নিন্দাবাদ রাজার সঙ্গে তক্‌রার তাঁদের মোটেই পছন্দ ছিল না। অনুগ্রহ চাও ত সন্তুষ্ট করো, এইটিই তাঁরা সুযুক্তি বিবেচনা করতেন। রাজার অনুগ্রহের উপর যাঁরা জাতীয় জীবনের আশা ভরসা ন্যস্ত করেছেন তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ সে আন্দোলনের মূলে এই বিশ্বাস নিহিত থাকা চাই যে, আমরা [যা] চাচ্ছি তা আমাদের প্রাপ্য। ভিক্ষা করা এক এবং নিজের প্রাপ্য অধিকার দাবি করা আর।

আমি আমার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছি, এই জ্ঞানটি প্রথমে জন্মান দরকার, তারপরে যে প্রবল পক্ষদ্বারা বঞ্চিত হচ্ছি তাকে স্পষ্ট করে নিজের মনোভাব জানাবার মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে। হয়ত অনেকে সন্দেহ করেন যে আমাদের কোনই অধিকার নেই। সুতরাং সে সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক। মানুষের কি অধিকার আছে কি নেই, এই নিয়ে ইউরোপে আজ দু শ বৎসর ধরে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মহা তর্ক বিতর্ক চলে আস্‌ছে। এক দলের মতে মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকার আছে, যা থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারও নেই। অপর পক্ষের মত, যে অধিকার আইন কানুনে বিধিবদ্ধ নয়, সে অধিকার শুধু কাল্পনিক পদার্থ। যে সমাজে যে বাস করে, সেই সমাজের বিধিব্যবস্থায় মানুষ যে অধিকার পায়, তাই তার অধিকারের সীমা, তার বাইরে, স্বাভাবিক অধিকার বলে কোন পদার্থ নেই। অনেক তর্কের পর দুচারজন এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন। আইনসঙ্গত অধিকার ত মানুষের আছেই, তা ছাড়াও অন্য অধিকার আছে, সে অধিকারকে

মানবের স্বাভাবিক অধিকার বলা ভুল, কারণ সমাজের বাইরে মানুষের কোনই অধিকার নেই। এমন যদি কতকগুলি লোক পাওয়া যায়, যারা পরস্পরের কাছাকাছি বাস করে কিন্তু যারা সকলে মিলে একটি সমাজ ভুক্ত নয়, তাহলে তাদের কারও কোন অধিকার নেই। কিন্তু সমাজভুক্ত লোক যখনি এমন কোন বিষয়ের কল্পনা করেন, যার প্রবর্ত্তনে সমাজের উপকার এবং উন্নতি হবার সম্ভাবনা, তখন আইনে থাকুক আর নাই থাকুক, সমাজের সেই বিষয় পাবার অধিকার জন্মায়। আমাদের আইনসঙ্গত কতকগুলি অধিকার আছে যা রক্ষা আমাদের কর্ত্তব্য, এবং আরও কতকগুলি অধিকার আছে, যা লাভ করলে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির কারণ হবে, সুতরাং সে অধিকার লাভ কর্‌বার চেষ্টা করাও আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ লর্ড কর্জ্জনের শাসন প্রণালি [প্রণালী] আমরা reaction নামে অভিহিত করেছি, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বে যা অধিকার ছিল লর্ড কর্জ্জন আমাদের তা হতে বঞ্চিত করেছেন, এই তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ। আমাদের যদি কোন অধিকার না থাক্‌ত তা হলে reaction কথার কোনই সার্থকতা থাক্‌ত না। অপর পক্ষে আমরা অনেক বিষয়ে স্বায়ত্বশাসনের [স্বায়ত্তশাসনের] দাবি করি। আমাদের বর্ত্তমানে সে অধিকাব আইনে লেখা নেই, কিন্তু সমাজের উপকারি [উপকারী] বলে আইনে না থাক্‌লেও আমাদের তা পাবার অধিকাব জন্মেছে। স্বত্ব সাব্যস্ত করা Constitutional agitation এর উদ্দেশ্য, সুতরাং ভিক্ষার ভাব তার ভিতর থাকাও উচিত নয় এবং হিসাব মাফিক খাপেও খায় না।— কিন্তু একথা আমি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে আজ পর্য্যন্ত আমরা যে পদ্ধতিতে এই রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে এসেছি তার ভিতর কমবেশি ভিক্ষার ভাব রয়ে গেছে। বিশেষতঃ গত বৎসর জনকতক congress এর নেতারা যে ভাবে বক্তৃতা করেছেন, তাতে মনে হয় তাঁরা পূর্ব্বের অপেক্ষায় যেন আরও বেশি অনুগ্রহের আকাঙক্ষী হচ্ছেন। তা ছাড়া তাঁদের কথার ভাবে এইরূপ মনে হয় যে তাঁদের ধারণা যে, বৎসরে তিনদিন একত্র হয়ে গোটাকতক বক্তৃতা করলেই যেন স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি তাঁদের সমস্ত কর্ত্তব্যের শেষ হয়ে গেল। বৎসরে তিনদিনে জীবনের কোনই কর্ত্তব্য সাধন করা যায় না, জাতীয় জীবনের বড় বড় কর্ত্তব্যের কথাত স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক আন্দোলন একেবারে নিস্ফল না হলেও, তার আবশ্যকতা থাকলেও, আমাদের আসল কাজ যে জাতীয় জীবন গঠন করে তোলা, এ কথা তাঁরা যেন সব ভুলে গেছেন। তবে আমরা যতই ঠাট্টা বিদ্রুপ [বিদ্রূপ] করি

না কেন যারা নিজেদের অক্ষমতা অনুভব করেন এবং যতদিন বাস্তবিকই আমরা একটি সক্ষম জাতি না হয়ে উঠি ততদিন অনেকেই নিজেদের অক্ষমতা অনুভব কর্‌বেন। তারা নিজেদের অধিকার প্রতিপন্ন কর্‌তে নিশ্চয় তার ভিতর ভিক্ষার ঢং এনে ফেল্‌বেই। আমাদের দেশের লোকের মন থেকে ভিক্ষা প্রবৃত্তি একেবারে দূর করতে হলে তাদের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি কর্‌তে হবে। আমাদের এখন প্রধান দরকার, শিক্ষার বিস্তার এবং অবস্থার উন্নতি। একথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে, সুশাসনে শুধু লোকের আত্মোন্নতির সুবিধা করে দিতে পারে তার বেশি আর কিছু নয়। সে সুযোগ কাজে লাগান কিম্বা না লাগান সে লোকের হাতে। কুশাসনে জাতির আত্মোন্নতির বাধা সৃষ্টি করে, সুতরাং যে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে তাকে কুশাসনের বাধা দূর করবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা পেতে হবে। কিন্তু সেই চেষ্টার ফল কি এবং কতদূর পেতে পারি সেটা বিস্মৃত হলে চল্‌বে না। শেষ কথা এই, সকল সমাজেই নানা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে, দেশের কাজ সুতরাং নানা লোক নিজের নিজের প্রকৃতি, সুযোগ এবং ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে কর্‌বেন। কারও দ্বারা এক পয়সার সাহায্য হবে কারও দ্বারা এক আনার সাহায্য হবে। উদ্দেশ্য যখন সকলের এক, তখন কারও উদ্যম চেপে দেবার পক্ষপাতী আমি নই। অনেকের ছোট ছোট চেষ্টার সমষ্টিতে একটা বড় ফল পাওয়া যায়— Constitutional agitation ছাড়, এ বুলি ধরাতে একটা বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধিমান লোকেও কথাটা ভুল বুঝতে পারেন। প্রমাণ শ্রাবণের ভাণ্ডারে চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ।*

* চন্দ্রনাথ বসুর ওই প্রবন্ধের নাম 'উপরনীচের মিলনকথা' — সংকলন-সম্পাদক

মাতৃপূজা

দুর্গা-প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গ যদি আমরা অভিনিবেশ-পূর্ব্বক আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, উহার মধ্যে একটি গূঢ় তাৎপর্য্য বিহিত আছে। কেন্দ্রস্থলে, মহাশক্তি— অর্থাৎ দেশের সমবেত শক্তি, শত্রুর দুরধিগম্যা দুর্গারূপে,— সিংহের উপর, অর্থাৎ আত্মবলেব উপর— দৃঢ়সঙ্কল্পের উপব— অধিষ্ঠিতা হইয়া অসুররূপ সমস্ত অশুভকে বিনাশ কবিতেছেন। এই মহাশক্তিব একদিকে লক্ষ্মী ও গণেশ— অর্থাৎ, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিবল। এই ঋদ্ধির মূলে কৃষি ও বাণিজ্য। এই গণেশ, গজমুণ্ডধারী। হস্তীজাতি স্বভাবতই গম্ভীরবুদ্ধি, ধীরগতি ও সাবধান। সিদ্ধির উপযোগী এইসব গুণ থাকাতেই গণেশ, গজ মুণ্ড ধাবণ কবিয়াছেন। গণেশ— কিনা, গণের পতি অর্থাৎ দলপতি। কোন বৃহৎ ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, যেমন গণ চাই, তেমনি গণপতিও চাই;— যেমন সমাজ চাই, তেমনি সমাজপতিও চাই। এই গণপতি উপবীতধাবী দ্বিজ,— অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। যিনি সমাজপতি হইবেন, তাঁহার বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্য উভয়ই চাই। এই গণপতি, মূষিক-বাহন। মূষিক গোপনে নিঃশব্দে কাজ করে। সিদ্ধিলাভ, মন্ত্রগুপ্তিব উপর নির্ভব কবে। সিদ্ধিবল সুমন্ত্রণার উপব প্রতিষ্ঠিত, সমাজপতি, কতকগুলি বিচক্ষণ মন্ত্রী লইয়া গূঢ়ভাবে কাজ করেন। মন্ত্রগুপ্তির দ্বারা কিরূপ শক্তিলাভ হয়, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জাপান। একদিকে যেমন ঋদ্ধি ও সিদ্ধিবল,— অর্থাৎ লক্ষ্মী ও গণেশ; তেমনি অপরদিকে, সরস্বতী ও কার্ত্তিক— অর্থাৎ বিদ্যা ও শৌর্য্যবীর্য্য। দুর্গাপ্রতিমার শীর্ষদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত;— এই দেবদেবী ধর্ম্মের প্রতিরূপ।

অতএব আমরা যদি, ধর্ম্মকে মাথায় রাখিয়া, ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিদ্যাবুদ্ধি, শৌর্য্যবীর্য্যের অর্চ্চনা করিয়া মহাশক্তির পূজা করি— এই স্বদেশরূপিণী মহাশক্তি-প্রতিমাকে আমরা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই ইহার বাস্তবিক "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" হয়— তাহা হইলে এই প্রতিমাকে আর "বিসর্জ্জন" করিতে হয না। শ্রীরামচন্দ্র এই মহাশক্তির আরাধনা করিয়াই রাবণের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ-দর্শী অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন ঃ—

"ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী, বিদ্যাদায়িণী
নমামি ত্বাং"
বন্দে মাতরম্।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব

রাখী সঙ্গীত

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভঘবান।।
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক, হে ভগবান।।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান।।১ ।।

বেহাগ।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
তততই বাঁধন টুট্‌বে
মোদের ততই বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে,
ততই মোদের আঁখি ফুট্‌বে।।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময়ত নাই,
এখন ওরা যতই গর্জ্জাবে ভাই
তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে
মোদের তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে।।
ওরা ভাংতে যতই চাবে জোরে
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,

ওরা যতই রাগে মার্‌বেরে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে
ওরে ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে।।

তোরা ভরসা না ছাড়িস্ কভু
জে'গে আছেন জগৎপ্রভু,
ওবা ধর্ম্ম যতই দল্‌বে, ততই
ধুলায় ধ্বজা লুট্‌বে
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুট্‌বে ।।২।।

খাম্বাজ।

বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি
এমন শক্তিমান
তুমি কি এমন [এম্‌নি] শক্তিমান!
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান,
তোমাদের এম্‌নি অভিমান!
চিরদিন টান্‌বে পিছে,
চিরদিন রাখ্‌বে নীচে
এত বল নাইরে তোমার
সবেনা সেই টান।।
শাসনে যতই ঘেবো
আছে বল দুর্ব্বলেবো,
হওনা যতই বড়
আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবিনেরে,
বোঝা তোর ভারি হলেই
ডুববে তরীখান।।৩।।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাণ্ডার ।। কার্ত্তিক ১৩১২

উপরনীচের মিলনকথা

(২)*

রাজনৈতিক আন্দোলনের তত আবশ্যকতা না থাকিলেও আমাদের উপরের ও নীচের লোকদের মিলিত না হইলে আর চলিতেছে না। জীবন রক্ষার্থ, জীবিকানির্ব্বাহার্থ, জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ আমাদিগকে অনেক কাজ করিতে হইবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উপরের লোক এবং নীচের লোক, একত্র না হইলে সে সকল কাজ সম্পন্ন হইতে পারিবে না। কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের, উপরের লোকের এবং নীচের লোকের মিলন হয় কেমন করিয়া? মিলন এখন নাই। থাকিলে, এ প্রশ্ন উঠিত না।

কেহ কেহ মনে করেন, ইস্কুলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, স্ত্রী পুরুষ উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সেইরূপ শিক্ষার বহুল বিস্তারে এই মিলনের উপায় হইবে। সকলে লিখিতে পড়িতে শিখিলে তবে সকলে মিলিত হইবে। বৈশাখের 'ভাণ্ডারে' পৃথ্বীশ বাবু** যেন এইরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সকলকে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে হইলে অনেক ইস্কুলের প্রয়োজন। তত ইস্কুল স্থাপিত হওয়া এক রূপ অসম্ভব। তত টাকা দিবে কে, তত খাটুনি খাটিবে কে? গবর্ণমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত যে কয়টা ইস্কুল এখন আছে, সে কয়টা ইস্কুল কত কষ্টে চলে আর তাহাদের চলিবার প্রণালী কত অসন্তোষজনক, তাহা বোধহয় সকলেই জানেন। আর গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত নয় এমন ইস্কুলের সংখ্যা কত কম, তাহাও বোধ হয় কাহারও জানিতে বাকী নাই। অতএব পৃথ্বীশ বাবুর কথিত উপায়ে উপর নীচের মিলন ঘটিবে, এরূপ আশা করিতে পারি না। আবার ইস্কুল হইলেই যে সকলে সেখানে ছেলে পাঠায় তাহাও নয়। পৃথ্বীশ বাবু তাহাও জানেন। সেই জন্যই বলিয়াছেন যে, 'দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলকেই বিদ্যাভ্যাস করাইতে হইবে, স্বদেশীয় ভাষার অক্ষর শিখাইতে হইবে, লিখিতে শিখাইতে হইবে, পড়িতে শিখাইতে হইবে। এই সকলের একমাত্র উপায়

---

* এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ শ্রাবণ-সংখ্যায় বেরিয়েছিল — সংকলন-সম্পাদক

** 'আজকালকার পব্লিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত-সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি'? —১৩১২র বৈশাখে এই প্রশ্নের উত্তরে পৃথ্বীশচন্দ্র রায়-এর নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। — সংকলন-সম্পাদক

গ্রামে গ্রামে স্কুলস্থাপন ও সহজ সুখপাঠ্য সাহিত্যের সম্যক বিস্তার এবং শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে সহানুভূতি ও সমবেদনা।' স্পষ্টই বলা হইল যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বহুল বিস্তার করিতে হইলে অগ্রে উপরনীচের অর্থাৎ শিক্ষিত অশিক্ষিতের মিলন করিতে হইবে। অতএব পৃথ্বীশ বাবুকেও স্বীকার করিতে হইতেছে যে তাঁহার বহু বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে উপর নীচের মিলনকথার সুমীমাংসা নাই।

আরও এক কথা আছে। বিদ্যালয়ে বই পড়িতে হয়, সেখানে বইই, শিক্ষালাভেব একমাত্র উপায় না হইলেও প্রধান উপায় বটে। কিন্তু বই না পড়িয়াও পার্থিব উন্নতি করা যায়। পৃথিবীতে বই অধিক দিন হয় নাই, বেশী বই পড়া আরও কম দিন হইয়াছে। বই পড়িবার পূর্ব্বে মানুষ দেখিয়া শুনিয়া শিখিত। তাহাতে বিলক্ষণ শিক্ষা হইত— সে শিক্ষাতে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পাদির বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। এদেশেও হইয়াছিল। ভারতেব অতুলনীয় প্রাচীন শিল্প বই পড়িবার ফল নহে। এখনও বই না পড়িয়া আমাদের মৃত শিল্পাদি পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। শিল্পী কৃষকদিকে মুখে মুখে কাজে কর্ম্মে শিখাইলেই যথেষ্ট হইবে— বোধ হয় বই পড়াইয়া শিখাইবার অপেক্ষা ভালই হইবে। বই জিনিষটাকে আমার কিছু ভয় করে। বই হাতে করিয়া আমরা কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভাল হইয়া থাকিতে পারি— কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে যে অযোগ্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাকে বলে 'ষাঁড়ের গোবর' বই পড়িয়া আমরা তাহাই হইয়াছি। বই পড়িয়া আমরা পারি কেবল চেঁচাইতে আর চাকরী করিতে। তাই নীচের লোকদিগের হাতে বই দিতে আমার ভয় হয়— পাছে তাহারাও ষাঁড়ের গোবর হইয়া পড়ে। বইয়ের মতন বই পড়িলে বিগড়াইবার সম্ভাবনা কম ঘটে। কিন্তু বাঙলায় বইয়ের মতন বই বড়ই কম। কিন্তু আমাদের শ্রমজীবীদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক, তাহাদের জ্ঞানের সীমা একটু বাড়াইতেও হইবে, বুদ্ধিও একটু ফুটাইতে হইবে। আমার বিবেচনায়, মৌখিক উপদেশে এবং দেখাইয়া শুনাইয়া এইরূপ করাই সহজ ও সুপদ্ধতি। উপরের লোক ভিন্ন এ কাজ করিবার অন্য লোক নাই। কিন্তু নীচের লোকের সহিত মিলিত না হইলে, নীচের লোক অনুগত না হইলে উপরের লোকে একাজ করিতে পারিবে না। সেই মিলন, সেই আনুগত্য কেমন করিয়া হয়?

জ্যোতিরিন্দ্র বাবু (বৈশাখের ভাণ্ডারে)* ঠিকই বলিয়াছেন— 'আমাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জন সমূহের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে।' কিন্তু

* দ্রষ্টব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবন্ধ 'লোকশিক্ষার উপায়' — সংকলন-সম্পাদক

যেরূপ ব্যবধানের কথা তিনি বলিয়াছেন, অর্থাৎ মনের ভাব গতিকের ব্যবধান, তাহা সত্ত্বেও শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয়ের মিলন, নীচের লোকের উপরের লোকের আনুগত্য অসম্ভব নয়। আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, মনের ভাবগতিক, ভাষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে ভিন্ন হইয়াও যদি বীটসন বেল বা এলেন সাহেব উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল বাঙালীরই প্রীতি ও ভক্তির পাত্র হইতে পারেন, তাহা হইলে শুধু মনের ভাবগতিকে ভিন্ন বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী অশিক্ষিত বাঙালীর ভক্তি প্রীতি ও অনুরাগের পাত্র হইতে পারিবেন না কেন? অতএব উপরনীচের মিলন সাধন করিবার জন্য জ্যোতিবাবুর বর্ণিত ব্যবধান বিনষ্ট করিবার তত আবশ্যকতা দেখি না, অন্তত এখন দেখি না। সুতরাং ঐরূপ ব্যবধান বিনষ্ট হইবে মনে করিয়া জ্যোতিবাবু পল্লীতে পল্লীতে যেরূপ 'জনসভা' এবং 'প্রাদেশিক পরামর্শ-সভার' অধীনে যেরূপ 'বিশেষ সমিতি' গড়িতে বলিতেছেন, তাহা গড়িবারও তেমন আবশ্যকতা দেখি না। আর এক কথা, আমরা সভা-সমিতি করিতে পারি খুব, কিন্তু রাখিতে পারি কৈ? আবার বিনাব্যয়ে এবং অতি অল্প আয়াসে যে সভা সমিতি ডাকা যায় উপর নীচের মিলন রূপ মহৎ কার্য্য তাহা দ্বারা হইবে না। বড় কাজ কখন কোন দেশে অত সহজে হয় নাই, হইবেও না। বড় কাজ করিতে বড় প্রাণ চাই, বড় শ্রম চাই, বড় আয়াস চাই, বড় ত্যাগ চাই। আবার নীচের লোককে উপরের লোকের অনুগত না করিয়া তাহাদিগকে ঐরূপ সভা সমিতিতে ডাকিলে তাহারা আসিবেই বা কেন? যদিও অনেক বলাকহাতে একবার আসে, আরবার আসিবে কেন? আমরা তাহাদের কে যে আমাদের কথায় বার বার আসিবে? তাহাদের আগে বুঝা চাই, উপরের লোকেরা তাহাদের আপনার লোক— বিপদে সম্পদে তাহাদের আত্মীয়, তাহাদের বল বুদ্ধি ভরসা, তবে ত তাহারা উপরের লোকের ডাক শুনিয়া দৌড়িয়া আসিবে, উপরের লোক যাহা করিতে বলিবে বুক্ দিয়া মহোল্লাসে তাহাই করিবে।

(বৈশাখের ভাণ্ডারে) বিপিন বাবু* এই প্রশ্নের মীমাংসার দিকে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু মীমাংসায় উপনীত হন নাই। তিনি দুইটী বড় ঠিক কথা বলিয়াছেনঃ—

(১) 'চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের ভদ্র সাধারণের সঙ্গে আপামর সাধারণের একটা যোগ ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে গিয়া দাঁড়াইতেন, তাঁহাদের গ্রামের শত শত লোক সেখানে গিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইত।'

---

* 'পব্লিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত-সাধারণের যোগরক্ষা'- সংক্রান্ত প্রশ্নে বিপিনচন্দ্র পালের উত্তর দ্রষ্টব্য। — সংকলন-সম্পাদক

(২) 'শিক্ষিত লোকদিগকে ক্রমে এখন সহর ছাড়িয়া গ্রামের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।'

বিপিনবাবু আর একটী কথা বলিলেই উপরনীচের মিলন কথার মীমাংসা হইয়া যাইত। সে কথাটী সংক্ষেপে এই— শিক্ষিতেরা বা উপরের লোকেরা আবার আপন আপন গ্রামে গিয়া এমন কাজ করিতে থাকুন, যেন তাঁহারা যেখানে গিয়া দাঁড়াইবেন, তাঁহাদের গ্রামের শত শত লোক সেখানে গিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়ায়।

কিরূপ কাজ করিলে এই অমৃত ফল ফলিবে তাহার একটু আভাস দিব।

প্রায় ষাট বৎসব পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন সর্ব্বদাই আমরা গ্রামে গিয়া থাকিতাম। সেখানে থাকিতে বড় ভাল বাসিতাম। দেখিতাম, গ্রামের উপরনীচের লোকের মধ্যে বড় সদ্ভাব, বড় আত্মীয়তা। সকলে এক জায়গায় বসিয়া তামাকু সেবন করিত, গল্পগুজব করিত, রামায়ণ মহাভারত শুনিত, চাষবাষের কথা কহিত, দুঃখ কষ্ট আপদবিপদের সংবাদ দিত এবং লইত, নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ করিত। তাহাদের কথায়বার্ত্তায় মনে প্রাণে কোন ব্যবধান দেখিতাম না, ব্যবধান দেখিতাম কেবল তাহাদের দুই পক্ষের বসিবার আসনের মধ্যে। তাহাও সকল স্থলে নয়। এক বৃদ্ধ তেজস্বী কর্ম্মকার, নাম রামধন, পূজার মজলিসে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, জমিদার তালুকদার সকলের মধ্যস্থলে সর্ব্বাগ্রে বাঁধাহুঁকা পাইত। এক বাগ্‌দিনী কালীপূজা করিত— কর্ত্তারা নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইতেন। এক বৃদ্ধা বাগ্‌দিনী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে ঠাকুরপো বলিত এবং ঠাকুরপোর কাছে যেমন করিয়া বসিয়া যেমন মিষ্টালাপ করিতে হয়, তাঁহার কাছে তেমনই করিয়া বসিয়া তেমনই মিষ্টালাপ করিত। আমরা বুড়ীকে বাগ্‌দী জেঠাই বলিতাম, আর বুড়ীর কাছে জেঠাইয়ের আদর পাইতাম। খুঁজিলে বোধ হয় বুড়ীর রসকরা খইচুরের দুই এক কণা আমাদের উদরে এখনও পাওয়া যায়। কর্ত্তারা সৎগোপ, কৈবর্ত্ত, বাগ্‌দী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া 'ধানবাড়ী' দেখিতে যাইতেন— কাহার ক্ষেতে কিরূপ ধান হইল তাহা না জানিয়া তাঁহারা থাকিতে পারিতেন না। ক্রিয়াকর্ম্মে, পূজাপার্ব্বণে তাহারা তাঁহাদের কাছে 'জন খাটিয়া' পয়সা এবং তেল জলপান পাইত, সপরিবারে পেট ভরিয়া খাইত, দুই এক খানা করিয়া বস্ত্র না পাইত এমনও নয়, যাত্রাগান শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইত, আর দুই হাত তুলিয়া কর্ত্তাদের আশীর্ব্বাদ করিত। দেখিতাম, বেলা দুই প্রহরে কত কাঙালিনী অন্দরে আসিয়া রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইত, আর খোরা খোরা ভাত লইয়া গিয়া জ্বলন্তউদর শান্ত করিত—কর্ত্তার

আদেশ ছিল, পাড়ার অভুক্ত অভুক্তার মুখে ভাত না দিয়া, গৃহিণী যেন ভোজন না করেন। এই সকল কারণে গ্রামের নীচের লোকেরা উপরের লোককে বুঝিত, বিশ্বাস করিত, মান্য করিত, ভক্তি করিত, ভালবাসিত। তাহ আপনাদের মধ্যে জমি-জমা, পথঘাট, সীমাসহদ্দ লইয়া বিবাদ ঘটিলে আদালতে ছুটিত না, বড় মোশাই, ছোট মোশাই, দাদাঠাকুরকে বলিয়া মিটাইয়া লইত। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহারা সমস্ত বৎসরের বিবাদ তুলিয়া রাখিত, পূজার সময় বড়কর্ত্তা, মেজকর্ত্তা, ছোট কর্ত্তা, সকল কর্ত্তা বাড়ি আসিয়া চুকাইয়া দিবেন বলিয়া। দস্যু দুর্ব্বৃত্ত পর্য্যন্ত তখনকার উপরের লোকের কাছে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত। আমার এক স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত একদিন অপরাহ্নে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিতে সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য মাঠের বড় তালপুকুরে প্রবেশ করিলেন। যেমন প্রবেশ করা অমনি পায়ের কাছে এক বাঁশের খেঁটে আসিয়া পড়িল। নির্ভীক পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন— 'কে এমন কাজ কল্লে রে?' উত্তর হইল— 'বড় মোশাই, আপনি এমন সময় হেথা এসেছ কেন'। দস্যুর সর্দ্দার আপনার এক লোককে সঙ্গে দিয়া 'বড় মোশাইকে' বাড়ী পহুঁছাইয়া দিল। বিপিন বাবু যে বলিয়াছেন, 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে গিয়া দাঁড়াইতেন, তাঁহাদের গ্রামের শত শত লোক সেখানে গিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইত,' ইহা সম্পূর্ণ সত্য এবং এই সকল কারণেই সত্য। আমরাও যদি গ্রামে থাকিয়া নীচের লোকদিগের সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় ব্যবহার করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদিগকেও তেমনই মান্য করিবে, তেমনই ভালবাসিবে, তেমনই ভক্তি করিবে, তেমনই বিশ্বাস করিবে, তেমনই করিয়া আমাদেরও পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইবে, আমাদেরও তেমনই করিয়া অনুগমন করিবে, আমরাও যাহা করিতে বলিব তেমনই করিয়া তাহা করিবে। এরূপ করিতে ব্যয় কিছু লাগে বটে, কিন্তু তত বেশী নয়, একটু শ্রমও আবশ্যক কিছু ত্যাগ স্বীকারও চাই। তা কাজের মতন কাজ বিনা আয়াসে করা যায় না, সভা-সমিতিতে দুটো ফাঁকা কথা কহিয়া করিতে পারা অসম্ভব। তুমি বলিবে, গ্রামে পানীয় জল নাই, কেমন করিয়া সেখানে গিয়া থাকি? দিনকতক একটু কষ্ট করিয়া থাকিলে তুমি নিজেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবে। কেহ কেহ তাহা করিয়াছেন। আর জল শোধন করিয়া পান করিলেও পীড়ার ভয় কমিবে। তুমি বলিবে, গ্রাম সকল ম্যালেরিয়াক্রান্ত। আমি বলি, পানীয় জলের ব্যবস্থা করিলে, সুপ্রণালীতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলে, সকল রকমে সাবধানে থাকিলে, ম্যালেরিয়ার ভয় কমিবে। আর ম্যালেরিয়া জ্বর বারমাস

হয় না। যে কয় মাস ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না অন্তত সেই কয় মাস গ্রামে থাকিয়া নীচের লোকের সহিত সেই পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিলে, তাহারা তোমাকে বুঝিবে, বিশ্বাস করিবে, ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, তোমাব কথায় উঠিবে, তোমার কথায় বসিবে, তোমার জন্য মাথা দিবে। আর কিছু না করিতে পার, এক বাক্স হোমিওপেথি ঔষধ এবং কিছু বার্লি, কিছু সাগু, কিছু আরারুট, কিছু খই বাতাসা দুই চারি খানা নূতন বা পুরাতন বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া গিয়া রোগপীড়ায় নীচের লোকদিগকে দিয়া দেখিও, কেমন না তাহারা তোমার অনুগত হইয়া পড়ে। নীচের লোক অনুগত হইলে, তাহাদের সাহায্যে অতি সহজে অতি অল্প ব্যয়ে অনেক কাজ করিয়া লইতে পারা যাইবে, তাহাদিগকে যাহা শিখান আবশ্যক, গ্রামে গ্রামে ইস্কুল পাঠশালা না খুলিযা বা সভাসমিতি না করিয়া আপন আপন আটচালায় বসিয়া একটি পয়সা ব্যয় না করিয়া অতি উৎকৃষ্ট যে মৌখিক প্রণালী সেই প্রণালীতে তাহা শিখান যাইতে পারিবে, গ্রামের কাজ করিবার জন্য 'স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে' না, গ্রামের বিবাদ মিটাইবার জন্য 'পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিতে'ও হইবে না। আমরা নীচের লোককে একটু হৃদয় দিলে নীচের লোকেরা আমাদিগের কাছে ষোল আনা হৃদয় আনিয়া দিবে। বঙ্গের নীচের লোক সোণার মানুষ। সভাসমিতিতে আমাদের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে, সভাসমিতির কথা ছাড়িযা দিয়া, যে কাজ না করিলে উপরনীচের মিলন অসম্ভব, করিলে অতি সহজ ও অনিবার্য্য, সেই কাজে নিযুক্ত হইলেই ভাল হয়।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

১। মফস্বল স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি গবর্ণমেন্ট যে পরোয়ানা জারি করিতেছেন তৎসম্বন্ধে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ছাত্র ও ছাত্রগণের অভিভাবকদের কি কর্ত্তব্য?

২। জাতীয় ধন ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে কিরূপে তাহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য?

উত্তর

১। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[সংক্ষেপিত]

[প্রথম] প্রশ্নটী বড়ই গুরুতর। কারণ আমরা এক্ষণে আমাদিগের জাতীয় জীবনের এক সন্ধিস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের নেতৃবৃন্দের মতামতের ও কার্য্যের সহিত আমাদিগের জাতীয় উন্নতি বা অবনতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ঘনিষ্ঠতরভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর আমাদিগের নেতাদিগের মত জনসাধারণের মতামত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত নহে। বিশেষত এই স্বদেশী ব্যাপারে। জনসাধারণ এক্ষণে এক মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসাহিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে। নেতৃগণ এই স্বদেশী ব্যাপারে জনসাধারণকে যেরূপে পরিচালিত করিবেন, তাহারা সেইরূপে পরিচালিত হইবার জন্য অনেকটা ব্যগ্র হইয়া আছে। পক্ষান্তরে নেতাদিগের হস্তে বহুলভাবে এই পরিচালন-ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগেরও মনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবলভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞান আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে নেতাদিগের মধ্যে কেহই কেবল কাগজ পত্রে বিশ্লিষ্ট ভাবে স্বমত প্রচার করিয়া দেশের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি দেখিতেছেন যে, মতের সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ কার্য্য করা চাই। আবার তদনুরূপ কার্য্য করিতে যাইলে যথাসম্ভব সকলে একমত হইয়াও কার্য্য করা চাই; এবং একমত হইয়া কার্য্য করিতে যাইলে নিজ নিজ মনোভাব সংযত করিয়া কার্য্যের গতি যুক্তিদ্বারা পরিচালিত করা চাই। আবার সকলেই দেখিতেছেন যে, জনসাধারণ

এক্ষণে কথা অপেক্ষা কার্য্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া কেবল তদুদ্দেশ্যেই তাহারা নেতাদিগের মতামত জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

এরূপ সন্ধিক্ষণে প্রশ্ন উঠিলে প্রশ্নের উত্তর অতি সাবধানে ও ভাবিয়া চিন্তিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য কোনও সময় এ প্রশ্ন উঠিলে হয়ত কেহ উত্তর দিতেন— কেন মহাশয়! ইহার উত্তর ত পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে অর্থাৎ বালক বৃদ্ধ শিক্ষক অধ্যাপক ও অভিভাবক প্রভৃতি মিলিয়া এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট সার্‌কুলার* প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করুন। এরূপ কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত লোকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিণ উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু এসময় এপ্রকারের উত্তর, সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। লাটসভার বেসরকারী সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে সরকারি সভ্যের উত্তরের ন্যায়, ইহাতে যাহা জানিতে চাহিতেছি তাহা কথার ছলনায় চাপা পড়িয়া যাইতেছে। প্রশ্নের মর্ম্ম যত্নসহকারে পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত হইতেছে। উপস্থিত প্রশ্নের সার মর্ম্ম আমার নিকট এইরূপ বোধ হয়—

আমরা অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থিত বর্ষীয়ান্‌গণ ও স্কুল কলেজের ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবক ও অধ্যাপকগণ এই সার্‌কুলারের প্রকোপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য একত্র ও একমত হইয়া কি কি কার্য্য করিব বা করিবেন।

অবশ্য যে সার্‌কুলার জারি হইয়াছে তদ্দ্বারা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য কতদূর সংসাধিত হইবে তাহা বলা কঠিন। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ তাহাদিগের সমাজ বা দেশস্থ অপরাপর লোকদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করে না। তাহাদিগের মতামত উহাদিগের মতামতের সহিত বিশেষরূপে জড়িত। আবার মানুষের মনের গতি এইরূপ, যে, যদি তাহাকে কোনও বিষয়ে অযথা দমন করার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সে নিজ উদ্দেশ্যাভিমুখে দ্বিগুণবেগে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। তাহার উপর আজকাল জনসাধারণের দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট এই সকল সার্‌কুলার বা পরোয়াণা জারি প্রভৃতি কার্য্য আমাদের উপকারার্থে করিতেছেন না। অধীন জাতিকে চিরকাল অধীন রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে বালক বা য্‌বকগণের হৃদয়ে জাতীয় ভাব সর্ব্বতোভাবে স্ফুর্ত্তি না পায়, তদুদ্দেশ্যে

১৩১২-র কার্তিক মাসের সূচনায় বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব Carlyle এবং পরে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ-ও-আসাম প্রদেশের মুখ্যসচিব Lyon যে-পরোয়ানা বা Circular জারি করেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত ছাত্র-শিক্ষকদের শায়েস্তা করা। — **সংকলন-সম্পাদক**

করিতেছেন। সুতরাং এস্থলে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক হৃদয়ের ভাব বাহ্য কার্য্যে পরিদৃষ্ট না হইতে দিলেই যে তদ্দ্বারা ভাবের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইবে তাহা সম্ভব নহে, বরং দ্বিগুণভাবে বর্দ্ধিত হইবে। আবার যদি এরূপ মনে করা যায় যে যাহাতে ছাত্রগণকর্ত্তৃক কেবল কোনওরূপ বে-আইনি কার্য্য না হইতে পারে প্রধানত তদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট এই সার্‌কুলার জারি করিয়াছেন, তাহা হইলে বলা বাহুল্য যে এদেশে যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তৎসাহায্যে বে-আইনী কার্য্য সমূহ সর্ব্বপ্রকারে স্থগিত রাখা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ভাবে দেখিলে সার্‌কুলারের কোনও উপযোগিতা নাই। সার্‌কুলার দ্বারা ছাত্রগণকে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনে public action লইতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং নিষেধ অগ্রাহ্য করিলে নানা প্রকারের বৈধ ও অবৈধ উপায়ে শাস্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, গবর্ণমেন্ট ছাত্রদিগের ঐ প্রকারের public action নিবারণ করা ব্যতীত, আরও দুই একটি উদ্দেশ্যে সার্‌কুলার প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন। তন্মধ্যে একটী এই যে, এদেশবাসী ও বিলাতবাসী ইংরাজদিগের নিকট গবর্ণমেন্টের আত্মসম্মান রক্ষা ও আর একটী এই যে, সার্‌কুলার প্রচারিত শাস্তি প্রদানে গবর্ণমেন্টর আপাতত ইচ্ছা না থাকিলেও ইহার জলদ-গম্ভীর অথচ প্রহেলিকাময়স্বরে জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া এই স্বদেশী উৎসাহ কতকাংশে প্রশমিত করা।

কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ছাত্রগণ এবং স্কুল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপকগণ একমত হইয়া প্রকাশ্যভাবে সার্‌কুলারের সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ করিলে গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া অন্তত আত্মসম্মান রক্ষার্থে বল বা শাস্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিবেন। এক্ষণে দেখা যাউক, সার্‌কুলার দ্বারা ঠিক কি কি কার্য্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। দুইটি নিষিদ্ধ কার্য্যের অর্থাৎ Boycotting ও Picketing এর নাম করা হইয়াছে। এবং অন্যান্য যাহা কিছু তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। অনেকটা অন্ধকারে রাখা হইয়াছে।

১। Boycotting ও Picketing শব্দ দ্বয়ের অর্থ যাহা অভিধানে পাওয়া যায় তাহাতে নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন-সহযোগে সকল প্রকার আদান প্রদান ইত্যাদি বন্ধ করিয়া একদল লোক অপরকে নিজ দলের মতানুসারে কার্য্য করাইতে প্রয়াস পাইবার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এরূপ কার্য্য এদেশে প্রচলিত আইনানুসারে নিষিদ্ধ। বোধ হয় সভ্য জগতের অপরাপর দেশেও নিষিদ্ধ, এবং এরূপ কার্য্যে সমাজেরও মঙ্গল নাই; সুতরাং

আমার মতে স্বদেশী আন্দোলন কার্য্যে যদ্যপি কেহ কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া অথবা অবৈধ উপায়ে ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিজ মতানুযায়ী কার্য্য করাইতে চেষ্টা করে, তবে তাহাকে সে কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে; সুতরাং বালকগণকেও এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা শিক্ষক ও অভিভাবক এবং স্কুল কলেজের অধ্যক্ষ্যগণের কর্ত্তব্য।

২। আমার মনে এরূপ ধারণাই হয় না যে গবর্ণমেন্ট কোনও সূত্রে কাহাকেও কখন আহার্য্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদিসম্বন্ধে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিতে পারেন। বালকগণ এবং শিক্ষক, অধ্যক্ষ ও অভিভাবকগণের কাহারও স্বয়ং বা পরিজনাদি সম্বন্ধে স্বদেশের হিতার্থে স্বদেশী বস্তু অর্জ্জনে বিরত বা নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে।

এরূপ কার্য্যে কোনও বাধা নাই এবং ইহাও আমাদিগের পরিষ্কাররূপে বুঝা উচিত যে এ সম্বন্ধে সহজভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিতে বা অপরের প্রতি যুক্তি বা সহজ উপায়ে ভাবোদ্দীপনার সাহায্যে নিজ মত বুঝাইতে ও তদনুসারে কার্য্য করাইতে সকল ছাত্রই সক্ষম। কেহই তাহাদের এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

৩। গবর্ণমেন্ট public action কাহাকে বলেন, তাহা বুঝাইয়া দেন নাই, এবং ইহাও বুঝাইয়া দেন নাই যে, কাহাকে political question বলেন। এ বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের সহিত পদে পদে আমাদের মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজনৈতিক ব্যাপার অর্থাৎ political question তৎসম্বন্ধে ছাত্রগণের প্রকাশ্যভাবে সাধারণসভায় যোগদান পূর্ব্বক কার্য্য না করিলেও চলে। কিন্তু আবশ্যক হইলে এদেশে গবর্ণমেন্ট অনেক ব্যাপারকে রাজনৈতিক নামে ভূষিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন ও করিবেন যাহা অন্য দেশে কস্মিন্‌কালেও তদ্রূপ অভিধান প্রাপ্ত হয় নাই। নেল্‌সন্ যদি ইংরাজ না হইয়া একজন "নেটীভ" হইতেন, আর আমরা এদেশে নেল্‌সনের শতবার্ষিক উৎসব করিতাম, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই তাহাতে রাজনীতির গন্ধ পাইতেন। ইংলণ্ডে এ উৎসব কি একটা রাজনৈতিক ব্যাপার? কিন্তু এদেশে যদি কেহ নেল্‌সনের ন্যায় বীরের পূজা করে, গবর্ণমেন্ট তখনই (প্রকাশ্যে নহে) আপোষে বলিতে থাকিবেন এ পরাধীন জাতির মধ্যে বীরভাবের আদর কেন? এরূপ আদর থাকিলে হয়ত ভবিষ্যতে কোন কালে ইহারা বীর সাজিয়া বসিবে। অতএব সূতিকা গৃহেই এভাবের গলদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক ইহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির আয়োজন করা ভাল। গবর্ণমেন্টের এরূপ সদভিপ্রায়স্রোতে

ভাসিয়া চলিলে আমাদিগের জাতীয় জীবন আত্মহত্যায় শেষ করিতে হইবে। সুতরাং গবর্ণমেন্টের এরূপ মতের আমরা স্বয়ং কখনও অনুমোদন করিতে পারিব না; এবং ছাত্রগণও করিবে না।

৪। বন্দে মাতরং বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া যে সকল সম্প্রদায় দেশ-হিতার্থে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক সময় কতক কতক স্কুল কলেজের ছাত্র থাকেন। তাঁহাদিগের এরূপ কার্য্যকে রাজনৈতিক ব্যাপারের প্রকাশ্য কার্য্য (publicacetod [Public action] in connection with political questions) বলা যাইতে পারে না এবং এরূপ কার্য্যের দ্বাবা গবর্ণমেন্টেব প্রতিও কোনরূপ অবমাননা করা হয় না। এরূপ কার্য্যে দেশেবও যথেষ্ট মঙ্গল। গবর্ণমেন্ট যদি এরূপ কার্য্যে বাধা দেন, তাহা হইলে কোনও সম্প্রদায়ের দোষে নহে, নিজের দোষেই গোলযোগ বাধাইযা তুলিবেন।

৫। এক কথা উঠিয়াছে যে, গবর্ণমেন্টের পরোয়াণার অন্যথাচরণ করিয়া এবং এসময়কার আন্দোলনে গবর্ণমেন্টের বিরক্তিকর যে কিছু কার্য্য হইতেছে তৎসমস্ত হইতে স্কুল কলেজেব ছাত্র, শিক্ষক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণকে এবং ছাত্রগণের অভিভাবককে যথাসম্ভব নিরস্ত না কবিয়া, গবর্ণমেন্টকর্ত্তৃক শিক্ষাবিভাগ দ্বারা যে শাস্তি দিবার কথা হইতেছে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমাদিগের এক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন কবা উচিত। যদি আমরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে তদপেক্ষা সুখেব বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। এবং আমরা কার্য্যক্ষম হইলে শিক্ষাকার্য্যও যে আমাদের হস্তে বহুল পরিমাণে আসিয়া পড়িবে তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। তখন আমাদিগেব দ্বারা গঠিত ও চালিত শিক্ষা-সমিতিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অপর কোনও উপাধি প্রদান করিয়া চালাইবারও সুবিধা হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে আমরা এখনই অনেক স্কুল কলেজ চালাইতেছি। এখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজন করা হউক না কেন? এ বিষয়ে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি প্রধানত এই এক আপত্তি উঠিতে পারে যে আমরা ইয়ুরোপীয় ও অন্যান্য অনেক জাতি অপেক্ষা নিঃস্ব। আমাদের মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতাও কম। আবার ধনবানদিগের মধ্যেও যে অনেকে লক্ষ দুই লক্ষ টাকা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ অগ্রসর হইবেন, তাহাও বড় সম্ভবপর নহে।

জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য যে প্রণালীতে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, হয়ত সেইরূপ উপায়েই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকগণের নিকট হইতে অর্থ

সংগ্রহ কবিযা চালাইতে হইবে। অধিক অর্থেরও প্রয়োজন হইবে। সুতরাং এসময় যখন আমরা শিল্প শিক্ষা ও তাহার উন্নতির দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়াছি, তখন আমাদিগের এসময়কার মিলিতশক্তি খণ্ডীভূত করা উচিত নহে। আমাদিগের জাতীয় শিল্পোন্নতি ও বাণিজ্যবিস্তারের উপব সমস্তই নির্ভর করিতেছে। ইহাই ধনাগমের উপায়। ধনাগম হইলে বল হইবে। বল হইলে কার্য্য হইবে। নতুবা আমরা এখন যেমন দেখিতেছি "উথায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" ভবিষ্যতেও সেইরূপ দেখিতে থাকিব। মিলিতশক্তি স্থায়ীভাবে সঞ্চিত হইবে না। ইংরাজিতে একটী বচন আছে "এক সময় একটা কার্য্য লইয়াই নিযুক্ত থাকা ভাল" (one thing at a time) তাহার প্রকৃত অর্থ কার্য্যক্ষম জাতি বা ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, গবর্ণমেন্টের সহিত এই প্রবল বিবাদেব সময জাতীয বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবাব চেষ্টা করিলে গবর্ণমেন্ট আমাদেব উদ্দেশ্য, দ্বেষ বা অভক্তিপ্রসূত মনে কবিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বল কৌশল বা আইন প্রয়োগদ্বারা আমাদিগের চেষ্টা বিফল করিবার প্রয়াস পাইবেন। ইহাতে যে দ্বন্দ্ব উঠিবে সেই দ্বন্দ্বে আমাদিগের যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হইবে, তাহাতে আমাদিগের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে প্রযুক্ত শক্তি ক্ষয় হইবে। উপরেই বলিয়াছি বাণিজ্য এবং শিল্পশিক্ষা ও তাহার বিস্তাবই আমাদিগেব এখনকাব প্রধান কার্য্য।

সুতবাং আমার মতে সাধারণ শিক্ষা আপাতত যে ভাবে চলিতেছে অন্তত দুই চাবি বৎসর সেইরূপ ভাবেই চলিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে যদি কোন ছাত্র বা শিক্ষক ন্যায়-সঙ্গতভাবে নিজমতানুসারে কার্য্য করিবার জন্য অন্যায়রূপে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক শাসিত বা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের মিলিত হইয়া তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করা কর্ত্তব্য।

এমন কি যাহাতে তাঁহাদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তি পার, সেরূপ কার্য্যেরও সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

গবর্ণমেন্ট যে যে স্থলে পরোয়ানায় নিজ মনোগত ভাব অস্ফুট রাখিয়াছেন, সেই সেই স্থলে অনুমান করিয়াই আমাদিগের জাতীয় গতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে পারা যায়, এবং আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও দেশে এক্ষণে যে দিক্ লক্ষ্য করিয়া কার্য্য চলিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দু একটি কথা বলা যায়। আমাদিগের গতির মুখে যখন যে প্রশ্ন উঠিবে তাহার মীমাংসা তখনই হওয়া সম্ভব। তৎপূর্ব্বে নহে। তবে স্থূলত এই বলা যাইতে পারে যে আমাদের হৃদয়ে যে জাতীয়ভাব

পরিস্ফুট হইতেছে এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য যে আগ্রহ আমাদের হইয়াছে, তাহার রক্ষা ও বৃদ্ধিই আমাদিগের মূল মন্ত্র হওয়া চাই। এতদূর লিখিবার পর এইমাত্র সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে, কলিকাতায় পাঁচ হাজার ছাত্র দৃঢ়সংকল্প হইয়া এই পণ করিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট-প্রচারিত পরোয়ানা তাঁহারা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন না। যাহাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মিত হয়, তদ্বিষয়েও তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে বিশ লক্ষ টাকা এক কালীন দান, ও তৎসহ বাৎসরিক দান দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দিবার জন্য কয়েকজন লোক প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এত টাকা এত অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিবার আয়োজন হইয়াছে। ইহাতে যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে আমার আনন্দ দ্বিগুণ হইবে; কিন্তু তখন আমি বলিব যে এই টাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হইবে তাহাতে শিল্প ও বাণিজ্য-চর্চ্চা ও শিক্ষা যাহাতে বহুল পরিমাণে হয়, তাহা কর্ত্তব্য। আমাদিগের যে জাতীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা কি আজকালকার স্কুল কলেজ হইতে লব্ধ সাহিত্য-চর্চ্চার দ্বারা হয় নাই? এবং ইহা কি সম্ভব যে, প্রচলিত স্কুল কলেজে যাহা পড়িতেছি তাহা দুই চারি কি দশ বৎসর কাল চলিলে আমরা আমাদের জাতীয় ভাব যাহা পাইয়াছি তাহা হারাইব? আবার দেখা যাউক, আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র শিক্ষা লাভ করিবে, তাহারা কোনও সরকারি চাকরি পাইবেন না। ওকালতি করিতেও পারিবে না। তখন তাহাদিগের জন্য আমরা কি কার্য্য দেখাইয়া দিব? উত্তর শিল্প কৃষি বা বাণিজ্য; সুতরাং যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, আমাদিগের আপাতত মুখ্য উদ্দেশ্য শিল্প কৃষিকার্য্য বা বাণিজ্যের উন্নতিসাধন।

আবার এইমাত্র কাগজে আলোচ্য পরোয়ানা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুর যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাও দেখিলাম। কিন্তু দেখিয়াও যাহা লিখিয়াছি তাহার কোনও অংশ পরিবর্ত্তন করা যুক্তিসংগত মনে করিলাম না। ছোটলাট বাহাদুর লিখিয়াছেন যে কেবল বলপ্রয়োগ বা অযথা ভীতিপ্রদর্শন নিবারণার্থেই তিনি উক্ত পরোয়ানা কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়াছেন, আমাদিগের স্বদেশী ভাব দমনার্থ নহে। তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ রহিলাম।

[...] জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে তদ্দ্বারা কোনও ব্যবসার কার্য্য অর্থাৎ business স্থাপন করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। ব্যবসা কার্য্য চালাইতে হইলে দৃঢ়ভাবে ব্যবসায়ের নিয়ম আশ্রয় করিয়া চালান উচিত। দান বা

অর্থসাহায্যের নিয়ম স্বতন্ত্র। ইহাতে দাতা কোনও প্রকারে লাভের বা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করেন না। [...]

আমার মতে এই টাকা কোনও ব্যাঙ্কে রাখিয়া বা তদ্দ্বারা কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া তাহা হইতে যে উপসত্ত্ব লাভ হইবে, তদ্দ্বারা যেখানে আপাতত দেশী তাঁতের কার্য্যের অভাব আছে তথায় দেশী ঠকঠকী তাঁতের (fly shuttle loom) প্রচলন যাহাতে হয় তাহা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমত ঠকঠকী তাঁত চালাইতে দক্ষ এরূপ লোক বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত পরিমাণ ঠকঠকী তাঁত ক্রয় করিয়া তাহা মফস্বলের নানা স্থানে লইয়া যাইয়া স্থানীয় লোকসাহায্যে তাহা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দিতে হইবে। তৃতীয়ত ছোট ছোট কলে বা চর্‌কায় কিরূপে সূতা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহারও শিক্ষা দিতে হইবে, কারণ সূতার অভাব পূর্ণ না হইলে এসকল কাজ কখনই ভালরূপ চলিবে না। এজন্য উপযুক্ত চর্‌কা বা ছোট ছোট সূতার কলও ক্রয় করিয়া ঠকঠকী তাঁতের ন্যায় তাহারও ব্যবহারসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। তুলার চাসের যাহাতে উন্নতি হয়, পুস্তকাদি লিখিয়া বা অপরাপর উপায়ে তাহা করিতে হইবে।

যখন এ সকল কার্য্য দেশের সাধারণ লোক অনেকটা বুঝিয়া নিজ হস্তে লইতে পারিবে, তখন আমরা এ কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগ করিব। [...]

২। শ্রীরাখালদাস সেন

১। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক এবং অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ঐ অন্যায় পরোয়াণার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন। গবর্ণমেন্ট আপত্তি গ্রাহ্য না করিলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত ছাত্রদিগের যোগদান আমার পরামর্শ নহে।

২। জতীয় ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

(ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কার্য্যে

(খ) জাতীয় ও রাজনৈতিক এবং স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতে ও মফস্বলে প্রতিনিধি প্রেরণ এবং সমগ্র দেশে জাতীয় ভাব উদ্দীপনের চেষ্টায়।

৩। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

বিদ্যালয় শিক্ষার স্থান। সেখানে কুশিক্ষা প্রবিষ্ট হইলে, অথবা সুশিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইলে অকল্যাণ হয়। অকল্যাণ না হইতে পারে, তাহার জন্য সকলকেই যত্ন করিতে হয়। ছাত্রগণ স্বদেশ-সেবা শিখিতেছেন, ইহাকে কুশিক্ষা বলিতে পারি না। বিদ্যালয়েব বাহিরে ছাত্রগণ কোনরূপ দণ্ডার্হ অপরাধ না করিলে, বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষগণ ছাত্রগণকে দণ্ডদান করেন না। তাঁহারা বিদ্যালয়ের বাহিরে অভিভাবকবর্গের সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশসেবায় লিপ্ত হইলে, রাজ-পুরুষগণের দণ্ডদানের অধিকার থাকে না। তাঁহারা অনধিকার-চর্চ্চায় লিপ্ত হইলে, সুশিক্ষা বিনষ্ট হইবে।

শিক্ষাকে রাজশাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করাই কর্ত্তব্য। রাজা শিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন, রাজা কখন ভারতবর্ষের শিক্ষার নিয়ামক ছিলেন না। শিক্ষার স্বাধীনতা আবশ্যক। দেশের লোকই তাহাকে সে স্বাধীনতা দান করিয়াছিল। তাহারা অকাতরে বিদ্যাদান করিত; — বেতন গ্রহণ করিত না। এখন শিক্ষাও দোকানদারির অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে স্বাধীন করিয়া তুলিতে হইলে, দেশের লোককে অর্থব্যয়ের জন্য প্রস্তুত করিযা তুলিতে হইবে। তাঁহারা অর্থব্যয় করিলে, সহজেই সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সে শিক্ষায় বাঙালী সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে চাকরী পাইবে না। কিন্তু চাকরীর আশা ত্যাগ করিতে না পারিলেও বাঙালী মানুষ হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না।

২। জাতীয়ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে তাহাদ্বারা শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞ শিল্পীর অভাবে বাঙালী কোন শিল্পকার্য্যে লিপ্ত হইতে সাহস পায় না। সর্ব্বাগ্রে অভিজ্ঞ শিল্পী গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহার পর লোকে আপনা হইতেই শিল্পকার্য্যে লিপ্ত হইবে। যদি অধিক অর্থ সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে অন্তত একটী বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার মত অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। জাতীয়-ধনভাণ্ডারের অর্থে কোনরূপ কারখানা খুলিয়া শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করিলে, বিশেষ উপকার হইবে না। ইংলণ্ডের "রয়াল কমিশ্যনের" পরামর্শে ইংরাজেরাও কারখানা না খুলিয়া শিল্পবিদ্যালয় খুলিয়াছেন। জার্ম্মানী কেবল এই উপায়েই শিল্পজগতে এতদূর সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

৪। শ্রীকামিনীকুমার চন্দ

১। উপস্থিত পরওয়াণা অগ্রাহ্য করা উচিত। গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবিতরূপে ছাত্রদিগের কার্য্যসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহাতে কেবল ছাত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় তাহা নয়, অভিভাবকের ন্যায্য অধিকারও খর্ব্ব করা হয় এবং আমি বলি গবর্ণমেন্ট কি শিক্ষকের তাহা করিবার অধিকার নাই। প্রথমত আমার মনে হয়, গবর্ণমেন্ট এই পরওয়াণা প্রত্যাহার করিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস করিবেন না। তারপর আমার বোধ হয় এই পরওয়াণার বৈধতাসম্বন্ধেও গুরুতর সন্দেহের কারণ আছে। অবশ্য গবর্ণমেন্ট কোন ছাত্রের "জলপাণি" বন্ধ করিতে পারেন। কিন্তু কোন স্কুল কি কলেজ পরওয়াণা লিখিত কারণে disaffiliate করার অধিকার গবর্ণমেন্টের নাই। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যত গবর্ণমেন্টের মতানুযায়ি কার্য্যই করিবেন এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু Syndicate এই কারণে কোন স্কুল কি কলেজকে disaffiliate করিতে পারেন কি? আমার বিবেচনায় তাঁহাদের এই ক্ষমতা নাই এবং তাহা বোধ হয় High Court এ একটা test Case উপস্থিত করিয়া দেখা যাইতেও পারে। তারপর শিক্ষকগণকে Special Constable করিবেন বলিয়া গবর্ণমেন্ট যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও mandatory সুতরাং High Court এ এই সম্বন্ধে ও ইহার বৈধতাসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। তারপর ইহাতে সফল হওয়া যাউক আর নাই যাউক, এবং গবর্ণমেন্ট এই সারকিউলার প্রত্যাহার করুন আর নাই করুন, শিক্ষার ভার আমাদের হাতে আনা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেন্ট এইক্ষণ যে নীতি অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষা নুতন প্রণালীতে চালিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় এইক্ষণ গবর্ণমেন্টের department বিশেষ, Lee Warner ইতিহাসের ন্যায় গ্রন্থই এইক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রামাণ্য। এইরূপ শিক্ষা লাভ করা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার ভার যতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, আমাদের হাতে আনা আবশ্যক। প্রধান এক বাধা এই যে আমরা পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলে গবর্ণমেন্ট তাহা recognise করিবেন না এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রগণ গবর্ণমেন্টের চাকুরী ও ওকালতি করিতে পারিবে না। আমার বিবেচনায় ইহার এক শুভ ফল হইবে। অবশ্য অনেক অভিভাবক এই ভয়ে ছাত্রগণকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ

করিবেন না। কিন্তু দেখা উচিত যে, গবর্ণমেন্ট-চাকুরীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট এবং ওকালতির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না হইলেও কার্য্যত তাহাই। সুতরাং বিশেষ কোন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যকই সরকারী চাকুরী কি ওকালতি করিতে পারেন। এই মুষ্টিমেয় লোকের জন্য জাতীয় উচ্চ শিক্ষার অবনতি করা কখনও বাঞ্ছনীয় [বাঞ্ছনীয়] হইতে পারে না। সে সকল অভিভাবক জাতীয়ভাবাপন্ন হন নাই ও কার্য্যত প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থন করিতে আপাতত প্রস্তুত নন, তাঁহাদিগকেও অবস্থায় পড়িয়া অনেক স্থলে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সন্তানদিগকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধে ত কোন কথাই হইতে পারে না। সুতরাং আমার মতে গবর্ণমেন্টের সারকিউলার অগ্রাহ্য করা ও সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

২য়। জাতীয়ধনভাণ্ডার-সংগৃহীত অর্থ কোন কল সংস্থাপন-কার্য্যে নিয়োজিত করা সঙ্গত হইবে না, তাহাতে যৌথ কারবার হওয়া উচিত। এই অর্থ হইতে গবর্ণমেন্টের agricultural loan এর ন্যায় Industrial loan দেওয়া যাইতে পাবে। কিন্তু [কিংবা] কোন শিল্প কি ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হইতে পারে। যেমন—কোন বিশেষ ব্যবসায় কি শিল্পবিষয়ে অন্যান্য দেশে যে সমস্ত উন্নত উপায় আবিষ্কৃত কি অবলম্বিত হইতেছে, তাহা আমাদের দেশে ঐ শিল্প কি ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

৫। শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত

মহাশয় ছাত্রসম্বন্ধীয় সরকিউলর সম্বন্ধে যে আমার অভিমত চাহিয়াছেন, তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে আমরা ছাত্রদিগকে কিছুতেই স্বদেশী আন্দোলন হইতে দূরে রাখিতে পারিব না, তবে তাহারা কোন হৈহুজ্জত না করিতে পারে, সে দিকে যেমন দৃষ্টি রাখিতেছিলাম, তেমনি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পুলিশ কিছু করিতে না পারে অথচ আমাদিগের কাজ কোনরূপে শিথিল না হয়, এবিষয়ে আমাদিগের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। গবর্ণমেন্টের যেরূপ ভাব দেখিতেছি—ইহাতে এই বুঝি যে আমাদিগের নিজেদের এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সে বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে বিলম্ব করাও কর্ত্তব্য নহে। সেই বিদ্যালয়ের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত

হইবে, তাহার অধিকাংশ শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থ-বিদ্যালয়-সংস্থাপনে ব্যয় করা আবশ্যক হইবে। সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ বি.এ., এম.এ.-র দিকে সামান্য অর্থ ব্যয় করাই যথেষ্ট হইবে।

জাতীয় ধনভাণ্ডারসম্বন্ধে আমি যাহা বুঝি নিবেদন করিতেছি। মাত্র বয়ন ব্যাপারের জন্য এই ভাণ্ডার রক্ষা করিলে ইহার লক্ষ্য বড়ই সঙ্কুচিত করা হয়। বয়নের জন্য নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে ও হইবে এবং লাভের আশায় অনেকে ইহার সাহায্য করিবেন। যাহাতে কোন ব্যক্তিগত লাভ নাই, এইরূপ শিক্ষা, রাজনীতি ও শিল্প-বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কার্য্যসম্পাদনার্থ এই ভাণ্ডারের আবশ্যকতা মনে করি। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব উঠিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে এই ভাণ্ডার হইতে তাহা করা হইবে। সম্প্রতি আমাদিগের কার্য্য কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিতেছে, ইহা সংযত করিয়া সর্ব্বত্র এক নিয়মে সকলে চলে ইহাব ব্যবস্থা করিতে হইলে কলিকাতায় একটি Central Committee স্থাপন কবা বিধেয়। সেই Committee হইতে যে আদেশ হইবে, আমরা সকলে তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া পালন করিব। সেই সভা আমাদিগের দেশে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমরা এইরূপ একটি সভা দেখিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি। এই সভায় অবশ্য প্রত্যেক জেলার পক্ষে প্রতিনিধি থাকিবেন। এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে জাতীয় ধনভাণ্ডারের সাহায্য প্রয়োজন হইবে। এই রূপ কার্য্যের জন্যই এই ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য মনে করি।

৬। শ্রীঅম্বিকাচরণ মুজমদার

১। ছাত্রগণ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট অথবা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে পরওয়ানা জারি করিয়াছেন, উক্ত পরওয়ানা আমি বৈধ কি সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। তাহার বৈধতা পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তবে ইতিমধ্যে কিংবা কখনও ছাত্রগণ কোন শান্তিভঙ্গের কার্য্য কি অবৈধাচরণ না করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আমার মতে কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে শিক্ষকগণের একটী মন্ত্রণাসভা (Conference) হওয়া আমি আবশ্যক বোধ করি।

২। জাতীয় ভাণ্ডারসম্বন্ধে আমার মত সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাইলে আমি সুখী হইতাম। আমার মতে জাতীয় ভাণ্ডার যুক্ত-বঙ্গ-সমিতি

(Bengal Federation) হইতে পৃথক রাখিলে ফলপ্রদ হইবে না। ভাণ্ডারের তহবিল পৃথক থাকুক এবং তাহার কার্য্যকারকগণও নির্দ্দিষ্ট থাকুন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, কিন্তু উক্ত ভাণ্ডার উক্তসমিতির Economic বিভাগরূপে পরিণত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে মফস্বলে তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিবে এবং সমগ্র দেশের লোকের এবং সমস্ত নেতৃবর্গের সহানুভূতি ভাণ্ডারের উন্নতিকল্পে আকৃষ্ট হইবে। এখন দেশের যেখানে যে টুক বল বীর্য্য আছে, তাহার সমবায় করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন বিভিন্নাকারে বিচ্ছিন্নভাবে শক্তি প্রয়োগের সময় নহে। এখন দেশের দিকে সকলে দৃষ্টি রাখুন।

ভাণ্ডারের অর্থ দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রধানত ব্যবহৃত হওয়া উচিত। দেশীয় আর্থিক অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান, কল কারখানা স্থাপন, সূতা প্রস্তুত, কার্পাসের চাষ, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে ভাণ্ডারের শক্তি প্রয়োগ হওয়া আবশ্যক মনে করি।

৭। শ্রীবিপ্রদাস পাল চৌধুরী

[সংক্ষেপিত]

[...] ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে কিম্বা তৎসংলগ্ন ভূমিতে কিম্বা বিদ্যালয়ের অধ্যয়নের সময়ে যদি বিদ্যালয়ের নিয়মাবলির বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে শিক্ষকেরা ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তজ্জন্য বালকদিগকে উচিত দণ্ড দিতে পারেন এবং তাহা না করিলে গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে দায়ী করিতে পারেন, কিন্তু বালকেরা স্কুল কলেজের সীমার এবং স্কুল কলেজের অধ্যয়নের সময়ের বাহিরে কোথায় কি কার্য্য করিবে, তজ্জন্য শিক্ষকেরা কিম্বা স্কুল কলেজের অধ্যক্ষেরা কতদূর দায়ী, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আইসে না। আবার ছাত্রেরা স্কুল কলেজের সীমার বাহিরে এবং অধ্যয়নের সময়েরও বাহিরে রাস্তায় রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' গাইলে কিম্বা [কিংবা] কোন ব্যক্তিকে বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে দেখিলে বিনীতভাবে তাহাকে তাহা ক্রয় করিতে নিষেধ করিলে কিম্বা [কিংবা] ক্রয় করিয়া আসিলে তাহাকে মিষ্ট কথায় ঐ দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে সে ছাত্রদের দ্বারা কি অন্যায় কার্য্য

করা হইল তাহাও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আইসে না। গবর্ণমেন্ট এসম্বন্ধে যে সার্কুলার প্রচার করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে উহা ছাত্রদের কিম্বা [কিংবা] বিদ্যালয়সমূহের কোন উপকার সাধন উদ্দেশ্যে নহে, কেবল বিলাতী পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের বিঘ্নকর স্বদেশী আন্দোলনের মুলে কুঠারাঘাত করার উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হইয়াছে এবং এই পরোয়ানা প্রচার করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি কিয়ৎ পরিমাণেও উল্লিখিত উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন গবর্ণমেন্ট সেই পর্য্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, বর্দ্ধিত উৎসাহে অনতিবিলম্বেই ছাত্রদের পিতা পিতামহদিগের উপর কঠোরতর পরোয়ানা প্রচারিত হইবে, এবং এখন যত অনায়াসে বর্ত্তমান পরোয়ানা নিষ্ফল করা যাইতে পারিবে, দ্বিতীয় পরোযানা তত অনায়াসে নিষ্ফল বা ধ্বংশ [ধ্বংস] করা যাইতে পারিবে না এবং বর্ত্তমান পরোয়ানা নিষ্ফল হইলে সম্ভবত গবর্ণমেন্ট এরূপ বাতুলের ন্যায় কার্য্য আর করিবেন না।

এক্ষণে ছাত্রদের সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে তাহারা কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য না করে, দেশীয় সঙ্গীত গাইয়া ও দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য করায় যদি গবর্ণমেন্ট অন্যায় করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অভিভাবক অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণকে স্পেশেল কনেষ্টবল করেন, কি বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করেন, কিম্বা [কিংবা] ছাত্রগণের শিক্ষার পথরোধ করিবার জন্য মফস্বল স্কুল কলেজগুলি উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে এসম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট যত অত্যাচারই করুন না কেন সকলই আমরা অকাতরে সহ্য করিব, কিন্তু আমাদিগের আপন কর্ত্তব্য পথ হইতে কোনমতেই বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না। গবর্ণমেন্ট এইজন্য অন্যায় করিয়া জেলে পাঠাইলে আমরা তাহাতে অন্তরে কোন কষ্ট না করিয়া জেল খাটিব, বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করিলে বা গবর্ণমেন্টের স্কুল কলেজগুলি উঠাইয়া দিলে আমরা নিজব্যয়ে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন আপন দেশের ও গ্রামের বালকগণকে লেখা পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিব এবং যাহাতে দেশের ছাত্রগণ শিক্ষিত হইয়া কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদিকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হইব। গভর্ণমেন্টের অন্যায় ভ্রূকুটিতে ভয় না করিয়া ধীরে ধীরে বিনীতভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে থাকিব, শান্তিভঙ্গ বা অন্যায় কোন কাজ করিব না এবং জানিতে পারিলে কাহাকেও করিতে দিব না অথচ গভর্ণমেন্ট অন্যায় বিচার করিয়া পীড়ন করিবেন

এই ভয়ে আমরা আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেও পরাঙ্মুখ হইব না। স্বাধীনভাবে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে থাকিব ও করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিব, কোন কাজেই গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইব না।

২। জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে কিরূপে তাহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? এই ব্যাপাব গুরুতর—উদ্দেশ্য জাতীয় অভাব মোচন। আমাদের জাতীয় অভাবের অন্ত নাই—কুবেরের ভাণ্ডার পাইলেও সমস্ত অভাব মোচন করা যায় না—আমাদের বর্ত্তমান ধনভাণ্ডার বিদুরের খুদ।[...]

এখন বিচার্য্য নিশ্চয় কোন অভাব বা অভাবগুলি অন্যান্য অভাব অপেক্ষা গুরুতর। আমরা বন্দে মাতরম্ বলিয়া রাস্তার রাস্তায় বেড়াইতেছি—উদ্দেশ্য মাতৃস্বরূপা জন্মভূমির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁহার প্রীতিজনক কার্য্য করা। যখন নিদারুণ দীর্ঘকাল ব্যাপী দুর্ভিক্ষে ১০ বৎসরে (ইঃ ১৮৯১ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত) এই মাতৃস্বরূপা জন্মভূমির ১৯০ লক্ষ সন্তান অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং [...] এখনও তাহার ভীষণ ছায়ায় ভারতের লক্ষ লক্ষ সন্তান অন্নাভাবে মারা য়াইতেছে, তখন এই দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও সেইগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণদ্বারা লক্ষ লক্ষ সন্তানের জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা মাতার প্রীতিজনক কার্য্য আর কি হইতে পারে? দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে আমাদের বিদুরের খুদ লইয়া যাইয়া লক্ষ লক্ষ জীবকে আহার দিয়া বাঁচান হউক একথা আমি বলি না; [...] কিন্তু [...] এ ক্ষুদ্র ধনভাণ্ডারের অর্থ দূরদর্শিতা ও সহিষ্ণুতার সহিত ব্যবহার করিতে পারিলে অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষকে একেবারে দেশ হইতে দূর করিতে পারা যাইবে এরূপ আশাও দুরাশা নহে।[...]

এখন ভারতে দুর্ভিক্ষ এত কেন হয়?

ভারতবাসীব যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক তাহা কি আর এখন ভারতের ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় না। এ কথা কোন্ বাতুলে বলিবে—এবং বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে? তবে কেন এখন দুভিক্ষের এত প্রাদুর্ভাব?—সমগ্র ভারতের আমদানি রপ্তানির তালিকা দেখিলেই দুর্ভিক্ষের কারণ দেখা যাইবে। যদি স্বদেশে আবশ্যকীয় খাদ্যের কম উৎপন্ন হওয়াই দুর্ভিক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের দশা কি হইত? সেখানে আবশ্যকীয় খাদ্যের এক চতুর্থাংশ মাত্র

দেশে উৎপন্ন হয়—তবে ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ হয় না কেন? ইংলণ্ডে তিন চতুর্থাংশ লোক অন্নাভাবে মারা যায় না কেন? আবার বলি ইংলণ্ডের আমদানি রপ্তানি তালিকা দেখিলেই ইংলণ্ডে কেন দুর্ভিক্ষ হয় না তাহার কারণ দেখা যাইবে। একটা মোটা কথায় বলি—আমরা বিলাতের প্রস্তুত দুই সের পরিমাণ ২টিন বিস্‌কুট আড়াই টাকা মূল্যে খরিদ করি ও তাহার মূল্যস্বরূপে আড়াই টাকায় একমন গম বিলাতে পাঠাই। এক জোড়া ম্যান্‌চেষ্টার প্রস্তুত ধুতী (ওজন তিন পোয়া) দুই টাকায় খরিদ করি ও তাহার মুল্যস্বরূপ চার সের তুলা বিলাতে পাঠাই, এক জোড়া বিলাতি জুতা ছয় টাকা মূল্যে খরিদ করি ও তাহার মূল্যস্বরূপ ৬্ টাকায় একখানা গো কিম্বা মহিষের চামড়া—যাহাতে ছয় জোড়া এরূপ জুতা প্রস্তুত হইতে পারে বিলাতে পাঠাই। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে না কেন—এবং ইংলণ্ডেই বা দুর্ভিক্ষ হইবে কেন। [...] এখন ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যদ্বারা ভারতবাসী জীবনধারণ করিতে পাবে তাহার উপায় কি? উপায় বপ্তানি কমান; ভারতবাসীর আবশ্যকোপযোগী রাখিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে এবং তাহা হইতেও মন্দ বৎসবেব জন্য প্রচুর মজুত বাখিযা যাহা থাকিবে, কেবলমাত্র তাহাই বিদেশে রপ্তানি কর। [...] বপ্তানি দুই কারণে হয়, ১ম রাজস্ব ও টেক্‌স প্রভৃতি দিবার জন্য — ও ২য বিদেশী শিল্প দ্রব্যের মূল্য দিবার জন্য। যতদিন ভারত বিদেশী গভর্ণমেন্টের অধীন থাকিবে, ততদিন প্রথম কারণ নিবারণ করিতে পারা যাইবে না—দ্বিতীয়টি নিবারণ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। বিদেশী শিল্প দ্রব্য আমরা লইব না—সেই সমস্ত দ্রব্য দেশে প্রস্তুত করিব—জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থদ্বারা তাহারই আয়োজন করা হউক। [...]

জাতীয় ভাণ্ডারের অর্থ এরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যে তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস না হয়। হ্রাস হইতে থাকিলে কালে শেষ হইবে এবং তাহার সহিত আমাদের শক্তিও ধ্বংস হইবে। ভাণ্ডারের অর্থ Co-operative Credit Society-র প্রণালীতে ব্যবহার করা আমি সুবিধা মনে করি। আর একটি কথা—বাঙ্‌লায় আটকোটী লোকের বাস—প্রত্যেকের গড়ে দৈনিক এক আনা আয় হইলে এবং একদিনের আয় সকলে দিলে জাতীয় ধনভাণ্ডারে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সংগ্রহ হয়; যে পর্য্যন্ত এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ না হয়, আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। একদিনের আয় জাতীয় ধনভাণ্ডারে দিতে কাতর হয়, এরূপ লোক বাঙ্‌লায় অতি বিরল। জেলায় জেলায়, নগরে, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে অর্থ সংগ্রহের রীতিমত ব্যবস্থা করা হউক।

৮। শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

[সংক্ষেপিত]

[...] ১। প্রথম প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ; এক কথায়—ছাত্রগণ নিরীহ আন্দোলন ছাড়িবেন না, আন্দোলননিবারক হিংস্র উৎপাত নীরবে সহ্য ও নির্ব্বিবাদে অগ্রাহ্য করিবেন। দেশের জন্য, জাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে এইরূপ ত্যাগের আদর্শ সমুজ্জল। ছাত্রগণ এতদিন সেই সকল ঐতিহাসিকসুধা তিক্ত আরকের মত গিলিয়া আসিতেছিলেন; এবার অল্পে অল্পে উহার স্বাদ গ্রহণ করিবেন; জীবনে উহা পরখ করিবেন; সার্থক করিবেন। এই ত আদত নবজীবন, যার সমস্ত মাল-মসলা নিজহাতে বহুক্লেশে বহুশ্রমে সংগ্রহ করিয়া তবে তাহাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হয়। ছাপার অক্ষরে নেসন্ ও কনষ্টিটিউসনের ছায়াচ্ছবি স্বপ্নের মত ভাসিয়া বেড়ায়, প্রাণে প্রবেশ করে না, জীবনে প্রকটিত হয় না। তাই আশা আছে, আজ ছাত্রসমাজ ও অভিভাবকগণ ঝুটার লোভে আসলকে বিদায় করিবেন না।

সেদিন কার্লাইলি-কানুনের দফাগুলি যখন পাঠ করিলাম, তখন মনে হইল, ফ্রেজার সাহেব সজারুর মত তাঁহার সমস্তগুলি কাঁটাই একেবারে খাড়া করিয়াছেন। আপাতত মফস্ফলে এই কাঁটার তীক্ষ্ণতার পরখ চলিতেছে, সফল হইলে কলিকাতাও কন্টকিত হইয়া উঠিবে,—এই যেন ভাব। মফস্বলে রাগটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যায়। সেখানে হাকিমী হুকুম, পুলিসী জুলুম আইনের বেড়া টপকাইয়া জঙ্গীশাসন প্রতিষ্ঠায় অবাধগতি। তাই আগে ছাত্র ভাগাইবাঁর অভিভাবক বাগাইবার কল মফস্বলেই পাতা হইয়াছে। অনেকে এই সব অহেতুক আকস্মিক হস্তক্ষেপ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিতেছেন,—কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের ছাত্রগণের কাজে এমন কি উচ্ছৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা আবিষ্কার করিলেন, যার জন্য এমন সঙ্গীন রুবকারী জারি করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইলেন না!—যাঁহারা এরূপ বলেন, তাহারা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ইংরাজ ও তাহার রাজনীতি, আর অদ্যকার রাজভৃত্যগণ ও তাহাদের শাসননীতির মধ্যে যে একটা স্পষ্ট প্রভেদ দাঁড়াইয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ওঁরা আমাদের উপর কড়াকড়ি করিতেন, অভ্যাসের বশে; অদ্যকার এঁরা আমাদের সহিত লাগেন, মনে মনে চাল আঁচিয়া। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের স্বাধীনেরা আমাদিগকে অধীন জানিয়া অগ্রাহ্য করিত; এখনকার স্বেচ্ছাচারিগণ আমাদিগকে স্বাধীনতা-প্রয়াসী ভাবিয়া অসহ্য জ্ঞান করে। আগেকার জয়িদল আমাদের শিকলের দুই একটা প্যাঁচ খুলিয়া দিয়া ভাবিত, বেচারারা একটু আরাম করুক্; এখনকার

অতি-সাবধানীরা মিনিটে মিনিটে ডিপ্লোমেসির হাতুড়ী ঠুকিয়া দেখিতেছেন,—শৃঙ্খলের কোথায়ও ভাঙ্গন ধরে নাইত।

শিক্ষানাশা মুরুব্বির মুখে শিক্ষানাশের যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে, নিজেদের নজীর খুলিলেও কিন্তু তার সান্ত্বনা মিলে। কর্ত্তৃপক্ষ কিণ্ডারগার্টেণ ধরনের শিক্ষার অতি-পক্ষপাতী। ছাত্রগণও ত আজ সেই হাতে-কলমেই ইতিহাস শিখিতেছে, ইতিহাস গড়িতেছে। এমন সহজে এমন সহসা একটী বড় উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিয়া সরকার বাহাদুরের মেজাজ কোথায় নরম হইবে, না একেবারে গরমের চরমে উঠিয়াছে। দুই টুক্‌রা বাঙ্গলা সরকারী দপ্তরখানায় জোড়া না লাগা পর্যন্ত সবলের বিভাগে দুর্ব্বলের ঐক্য অটুট রাখিতে অভেদমন্ত্র চীৎকার করিয়াই প্রচার করিতে হয়। ভেদকারীর কাণেই উহা পীড়াদায়ক; ভালমানুষ কর্ত্তৃপক্ষ এই একটা সহজ সাদাসিধা বাহ্য অনুষ্ঠানে বিচলিত হইতে গেলেন কেন?

যা হৌক্, ফ্রেজার সাহেব কড়া অনুশাসনের মিঠে টীকা করিয়া দেশের অসন্তোষ-আগুন কতকটা চাপা দিতেছিলেন; ফুলার সাহেব হঠাৎ কুলার বাতাসে ধুলা উড়াইয়া জনসাধারণের চোখে আগুনকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সময়ে আমাদের কয়েকটী প্রতিপত্তিশালী প্রতিনিধিকে নবাগত বড়লাট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া আমাদের প্রতীকার-প্রতিবাদ জানান আবশ্যক। ইহাতে ফল ফলুক্ আর না-ই ফলুক্ নিজের বল, নিজের কল, নিজের কৌশল কোন অবস্থাতেই বন্ধ রাখিব না। তবে আমাদের কার্য্যপ্রণালী এখন চটুল লঘুতা হইতে সংহত গভীরতার দিকে মূল প্রসারিত করুক্। ছিদ্রান্বেষীকে ছল ধরিতে, ছুতা পাইতে যেন আমরা সুযোগ না দিই। এই উপলক্ষে ছাত্রসমাজের নিকট একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। কেবলমাত্র তাঁহাদের দ্বারা কলিকাতায় একটি মন্ত্রণাসভা স্থাপিত হৌক্; প্রতিনিধি পাঠাইয়া যেখানে যেখানে বিদ্যালয় আছে, সেই সেই স্থানে উহার শাখাপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হৌক্; কলিকাতার এই চালকসভার নেতৃত্বে মফস্বলের সভাগুলির বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবলী নিয়মিত হইবে। ছাত্রসভ্যগণের নিকট মাসিক চাঁদা লইয়া একটী ধনবল গঠিত হৌক্। বাহিরের দানে উহার পুষ্টি হইবে। এইরূপে সহজে সংগৃহীত অর্থ দেশের আশুপ্রয়োজনীয় কাজে লাগিবে। চালকসভার প্রধানগণ কেবল গুরুতর সমস্যায় প্রবীণ পাকা সারথীগণের মন্ত্রণা লইবেন। এইরূপে নীরবে নির্ব্বিবাদে আমরা সরকারী অবিচারকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইব।

স্মরণ রাখিতে হইবে, যে সঙ্কট-সময় আসিয়াছে, ইহা অপেক্ষাও পরীক্ষার সময় পরে উপস্থিত হইতে পারে। এই সব সময়েই শৃঙ্খলা রাখিয়া অগ্রসর হওয়া বেশি আবশ্যক ও বেশি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। উত্যক্ত ও উত্তপ্ত করিবার লোক ঘরে-বাহিরে অনেক আছে। হৌক্, দুই দলের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত; আমরা যেন রাগের মাথায় কাঁচা প্রতিশোধ লইয়া স্বদেশী প্রেরণাকে স্বাদেশিকতার উত্তেজনায় দগ্ধ না করি। সোণার সুযোগ বহুদিনে একবার আসে; তাহা যেন পূর্ণমাত্রায় নিজের অনুকূলে নিয়োগ ও প্রয়োগ করিতে পারি। এখন পরিণাম ও পরিণতি-চিন্তায় মস্তিষ্কের চড়া-সুর যে গ্রামে নামাইতে হয়, সেই মাথায় ভাবিতে, সেই ভাষায় কহিতে ও সেই ভাবে চলিতে সকলকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। [...]

২। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। লক্ষের ধন যক্ষের মত রক্ষা না করিলেও, খুব খোলা-হাতে খরচ যে নিরাপদ নহে, তাহা বেশ জোরে বলা যাইতে পারে। উহা আশুপ্রয়োজনীয় কাজে লাগাইতে হইবে। সে কাজ কি? দু'চার কথায় তাহার উত্তর দেওয়ায় যে দায়িত্ব আছে, তাহার বোঝা ভারি, স্বীকার করিতেছি। তবু একটা কিছু বলিতেই হইবে।

এখন আমাদের প্রধানতম অভাবটা কি তাহা সকলের মনেই জাগিতেছে। কিন্তু তাহা দূর করার জন্য ভাণ্ডার কোন্ দিকে মুক্ত করিতে হইবে, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায় নাই। দুর্ব্বলের সম্বল ব্যয়সাধ্য কলকারখানার পাছে ঢালা ঠিক নয়। আমাদের দেশে অসাফল্যের দৃষ্টান্ত যত প্রখর, সাফল্যেব দৃষ্টান্ত তত উজ্জ্বল নহে। তাই সংযত ক্ষিপ্রতার সহিত ব্যয়ের বাজেট ধরিতে হইবে। দশের কষ্টার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হইলে এ দেশে যে তুমুল কলহ-কোলাহল উঠে, কৈফিয়তে তাহার জের মেটে না। আগেকার সেই সব ধাক্কা এখনো সামলানো যায় নাই। তবু কাপড়ের মিল বা কল বাঙ্গলায় চাই, তাহা হইবেও, তাহার উদ্যোগও হইতেছে। তাহা এমন কয়েকটী বাছা লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হৌক্, যাঁহাদের অর্থ কি সামর্থ্য ব্যর্থ হইলেও সেজন্য দশকে বা দেশকে দায়ী কি দুর্ব্বল হইতে হইবে না। ঐরূপ একটী-দুটী কলে মোটেই কুলাইবে না; তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁতের উন্নতি করিয়া লইতে হইবে। ফ্লাইসাটল তাঁতকে আমরা এখন যে পরিমাণে আদর দিতেছি, ইহাতেই শেষ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিয়া না যাই। এ আশঙ্কা একেবারে অসম্ভব নয়; আমরা চাল-চলনে সহজে সন্তুষ্ট হই না, কিন্তু মনন-বীক্ষণে বড় সহজে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়ি। পূর্ব্বপুরুষে পরপুরুষে ঠিপ বিপরীত

প্রভেদ। হ্যাণ্ডলুমের বয়নচাতুর্য্য আমাদের অনায়ত্ত রহিয়াছে, এই অপরাধে উহার শ্রেষ্ঠত্বে সন্দিহান হইলে চলিবে না। তাহাকে আগে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। জাতীয় ধনভাণ্ডারের সাহায্যে, জাপানে বাঙ্গলার উপযোগী তাঁত ফরমাসে গড়াইয়া একেবারে শিক্ষক সহ এখানে আনিলে, সে উদ্যম নিষ্ফল হইবে না বলিয়াই অমার বিশ্বাস।

এখন পরাব সাথে পড়াব কথাও ভাবিতে হয়। সরকার এক গুলিতে দুই বাঘ মারিবার ফন্দি আঁটুন্ আব নাই আঁটুন্, একেব অপঘাতমৃত্যু বহুদিন হইয়াছে। শিক্ষা বহুদিন হইতেই শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। বিদ্যাদানের মত গুরুতব ব্যাপারে পরের কর্ত্তৃত্বের পাশাপাশি ঘরের নেতৃত্বেব বন্দোবস্ত আজ হোক্, কাল হোক্, করিতেই হইবে,—ইংরাজেব উপব জেদ কবিয়া নহে, শিক্ষাসংস্কার অত্যাবশ্যকীয় মনে করিয়া। তাই নিজেদেব নবশিক্ষাশালা ও বঙ্গবিশ্ববিদ্যালয় একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ইহাতে কল্যাণ আছে, তাই আপদও আছে, বিপদও আছে। এজন্য এ ভাণ্ডারেও কিছু হাত পড়িতে পারে। অন্তত দিন আসিলে, অংশিক দানের জন্য অপ্রস্তুত থাকা উচিত হইবে না।

আমাদের এ তরুণ আযোজনে বিশ্ববিদ্যালয় কথাটা আমি চালাইতে বাজি নই। ইউনিভারসিটি বলিতে যা বুঝায়, বিশ্ববিদ্যালয় কথায় ঠিক সে অনুভবটী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। বিশেষত ঐ কথাটাব ভাবে ও ভাষায যে সমাবোহ আছে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। উহা কার্য্যে পবিণত কবিতে আমাদের অর্থ বা সামর্থ্যের উপর যে কঠিন চাপ পড়িবে, তাহা এখনকার পক্ষে অকুলান হইতে পারে। আর আশু ভাঙার দিকে না কথিয়া গড়ার দিকেই আমাদের ঝুঁকিয়া পড়া ঠিক। অগঠিত নূতনের লোভে প্রতিষ্ঠিত পুরাতনে অকাল-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দিতে নিজেও সাহসী নই, কাহাকেও সে সাহস করিতে বলি না। প্রথম প্রথম আদর্শ ধরা, পরখ করা এই দুই হিসাবে একটা ছোট রকমের আয়োজন করা সঙ্গত। সেই উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্যের অনুপাতে মিলাইয়া আমি উহার নাম দিতে চাই, 'শিক্ষাপরিচালক সভা' অথবা 'বিদ্যাদরবার'। বিদেশের ঢালা-ছাঁচ সাম্‌নে রাখিয়া দেশের উপযোগী করিয়া বর্ত্তমান ইউনিভারসিটির অনেক অঙ্গ উহা হইতে বর্জ্জন করিব, আবার অনেক নূতন অঙ্গ উহাতে যোগ করিয়া লইব। বঙ্গীয় ঐক্যমন্দিরের আগে অবিলম্বে আমাদের এই জ্ঞানতীর্থের কীর্ত্তিমন্দির মাথা তুলিয়া দাঁড়াক্। আমরা এম-এ, বি-এর পরিবর্ত্তে মানুষ গড়িতে থাকি, কর্ম্মী গড়িতে থাকি। বি-এল,

ডি-এল এর পরিবর্ত্তে স্বদেশসেবক স্বজাতিবৎসল জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক গড়িতে থাকি। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়-বিতাড়িত দলকে আগে এই বিদ্যাদরবারে আশ্রয় দিতে থাকি। মনে রাখিতে হইবে, পার্য্যমানে পুরাতন হইতে সমস্ত অধিকার ও কারবার উঠাইয়া আনিব না। কেবল তাহার পাশে নিজেদেব একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নূতন প্রতীকারের ব্যবস্থা করিব।

এ দুদিক রক্ষার প্রস্তাব শুধু রাজদত্ত কয়েক লক্ষ টাকার লোভে নহে; শুধু সবকারী দরবারে উমেদারী কি তাবেদারী বা স্বাধীন পেশাদারী হইতে উৎখাতের ভয়ে নহে। আমাদের প্রকৃতিতে আমাদের অবস্থায় এক ধাক্কায় আমূল সংস্কার কোন বিষয়েই স্থায়িত্ব লাভ করে না। তাই এদেশে সংস্কাব ব্যাপারে দায়িত্ব অতি গুরুতর। ভয় ও ভাবনা এজন্যও যথেষ্ট য়ে, ছোট আকারের বৃহৎ আদর্শ বড় গোছের আড়ম্বরের চাপে চূর্ণ হইয়া না যায়! আদর্শটা কি? — দু'চার কথায় তাহা ফুটাইয়া তোলা যায না, সে স্পর্দ্ধাও আমি রাখি না। আমরা শুধু কাঠামো গড়িতে পারি। বিশেষজ্ঞ পাকা ওস্তাদেব হাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন যোজনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সংক্ষেপে আভাসে এইটুকু বলিব, — এই নূতন শিক্ষাপরিচালক সভার অধীনে থাকিবে, কতকগুলি আদর্শ সাধারণ শিক্ষার উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয় এবং কতকগুলি আশু-অবলম্বনীয় শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যবিষয়ক পুঁথিগত শিক্ষার সহিত হাতে-কলমে আয়ত্তের অনুষ্ঠানালয়। আর, ইহার অধীনে—সাধারণ নিম্নশিক্ষাতেও শ্রম-সময়ব্যয়কুণ্ঠ জনসম্প্রদায়ভুক্ত তরুণদলের ও তাহাদের নিরক্ষর স্বাদেশিকতাবর্জ্জিত অভিভাবকগণের জন্য জাতীয়তাচর্চ্চার সহজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হৌক্।

যেদিন বিভিন্ন বিচিত্র শিক্ষাশালাগুলি ও এই নূতন শিক্ষাপরিচালকসভার কাজ আরম্ভ হইবে, সেদিন পরের ভাষা-ভাবের কুজ্ঝটিকা ভেদিয়া মাতৃভাষার সোনার আলো জ্বলিয়া উঠিবে। বঙ্গসরস্বতীর মন্দির হইতে সেদিন নূতন যুগের জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। সেইদিন বঙ্গসাহিত্যের বঙ্গবিজয় সহজে শীঘ্র সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হইবে। সেদিন বাঙালীর ভাব, বাঙালীর ভাষা বাঙালীর হৃদয়ে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আমাদের সেই নবশিক্ষা শত শত প্রতিভাশালী ছাত্রকে মাতৃভাষার ভক্ত-সেবক করিয়া ছাড়িয়া দিবে। বিজাতি ভাব ও বিদেশী ভাষাকে তখন গ্রহণ করা হইবে, দাস দাসীর মত কাজে লাগাইতে; আর জাতীয় ভাব ও স্বদেশী ভাষাকে বরণ করা হইবে, রাজা রাণীর মত পূজা দিতে। শুধু এই একটী কল্যাণের জন্যও শিক্ষাসংস্কারের সার্থকতা আছে। [...]

একটা অনাবশ্যক আবশ্যকীয় কথা বলিয়া শেষ করিব। জাতীয় ধনভাণ্ডারের ব্যয়ের পন্থা ঠাওরান অপেক্ষা এখন আয়ের চিন্তা করাই বেশী দরকারী হইয়াছে। স্বদেশ ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ফিবিয়াও যথেষ্টরূপে পাত্র পূর্ণ করিতে অক্ষম। এই দারিদ্র্যের জন্য আমরা চিবকাল পরকেই খোটা দিয়া আসিতেছি, ঘরকে তত দায়ী কবি নাই। পরেব জিনিস যেমন ছাড়িয়াছি, ঘরের বাহুল্যকেও তেমনি আগ্রহে ছাডিতে হইবে। বাড়ীর আদুরে ছেলেব মত উহাকে অন্যায় পক্ষপাতে প্রশ্রয় দিব না, উহাকে শাসন করিব, সংযত করিব। দেশের টাকা দেশেও যদি এলো-মেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে, তবে তাহা দেশের ও দশের বীতিমত কাজে আসে না। গোলাশুদ্ধ চাল নিবেদন করিয়া দিলেও তাহা দেবতার ভোগে লাগে না; সেজন্য নৈবেদ্য সাজাইতে হয়। কেবলমাত্র একদিকে চাহিযা, এক জাতি, এক দেশ, এক লক্ষ্য মনে বাখিয়া, স্থির করিয়া লইব, এই কাজের যুগে আব বাজে খবচ সাজে না; এই দুর্দ্দিনে সমারোহ-আড়ম্বর আব শোভা পায না। সাধাসিধা সহজ-সংক্ষেপে আমাদেব জীবন-যাত্রাব মাত্রা নির্দ্দিষ্ট ও নিযমিত হৌক্। তবেই আমাদেব দেশ ধনধান্যে পবিপূর্ণ, শিল্পসম্পদে উচ্ছ্বসিত ও বাণিজ্যবৈভবে উদ্ভাসিত হইযা উঠিবে। আইনের ঘন-বেড়াজালে ঘেরিয়াও বিদেশী আমাদের এই স্বদেশী উন্নতির গতিরোধ করিতে পারিবে না।

শিক্ষা*

ভাণ্ডার ।। বিশেষ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩১২

ভূমিকা

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত)

সমাজকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশ কোনো দিন স্বদেশী বা বিদেশী রাজার আইনের বাঁধনে ধরা দেয় নাই। নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের লোক নিজেরাই করিয়াছে। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে যে কেবল টোল এবং পাঠশালাই বুঝাইত তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় যে বিদ্যায়তন ছিল, তেমন বৃহৎ ব্যাপার এখনো কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। মিথিলা কাশী নবদ্বীপে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহায্য ব্যতিরেকেই চিরদিন চলিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে নানাকারণে শিক্ষালাভের জন্য আমাদিগকে বহুল পরিমাণে রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যথোচিত শিক্ষা লাভের কি পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমাজ আত্মহিত-সাধনের শক্তি হইতে যে প্রত্যহ ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই আমি সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমাদের যে পাঠশালা যে টোল অনায়াসে স্বদেশের মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া দেশকে চিরদিন ফলদান করিয়া আসিয়াছে— সেই আমাদের স্বকীয় পাঠশালা ও টোলগুলিও ক্রমশই রাজার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়া আত্মপোষণের স্বাধীন শক্তি হারাইতেছে। মোগলসাম্রাজ্যসূর্য যখন অস্তমিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বভাবের নিয়মে একদিন ইংরেজকেও নিশ্চয় এদেশ হইতে বিদায় হইতে হইবে, তখন তাঁহাদের অন্নজীবী টোল পাঠশালাগুলি ভিক্ষান্নের জন্য আবার কাহার দ্বারে হাত পাতিতে যাইবে।

শক্তি-লাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহা কেবলমাত্র খাদ্যলাভ নহে বিদ্যালাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্ব লাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে, তখন সে ক্ষতি কোনো

---

* নামান্তরে 'শিক্ষার আন্দোলন'। এই বিশেষ সংখ্যাটির পৃষ্ঠাক্রম বাংলা বর্ণমালা অনুসারে সাজানো হয়েছিল, ভাণ্ডার-এর পৃষ্ঠাসংখ্যার অনুক্রমে নয়। পৃথক পুস্তিকা হিসেবেও সংখ্যাটি দেখা দিয়েছিল। — সংকলন-সম্পাদক

প্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিম্‌নি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল, সেই তার, সেই চিম্‌নির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ করি না কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য! সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র; যখনি জাগ্রত হইব, তখনি সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্ত্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্র প্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার শক্তি ইংরেজ এদেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরো অনেকগুলি শক্তি আছে, যাহার উৎকর্ষসাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারো সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্টস্বীকারের অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এমন কি আমাদের বিধিদত্ত স্বাতন্ত্র্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে মানবে কোনো দিন কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই কথা লইয়া বাংলাদেশে কিছু দিন আলোচনা চলিতেছিল— এমন কি, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা কেহ কেহ নিজের সাধ্যমত সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই আলোচনা এবং সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব ও আনুকূল্য কিরূপ ছিল, তাহা কাহারও অগোচর নাই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না পার্টিশন রহিত হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন— পরের উপরে রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না; আমরা পরাধীন জাতির মজ্জাগতদুর্ব্বলতাবশত মুগ্ধভাবে বিলাতি জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশিবস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি, তবে স্বদেশ একটি নূতন শক্তি

লাভ করিবে। যে সকল দ্রব্য ত্যাগ করিব, তাহা অপেক্ষা যে শক্তি লাভ করিব তাহার মূল্য অনেক বেশি। এক শক্তি আর এক শক্তিকে আকর্ষণ করে— বলিষ্ঠভাবে ত্যাগ করিবার শক্তি বলিষ্ঠভাবে অর্জ্জন করিবার শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এ সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে পার্টিশনের সঙ্গে বিদেশিবর্জ্জনকে জড়িত করা শ্রেয় নহে। মনে আছে এই আলোচনাও তখন অনেকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

তাহার পরে মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধিবিবর্জ্জিত সার্কুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে আমরা বর্ত্তমান য়ুনিভার্সিটিকে "বয়কট" করিব, আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

অবশ্য এ কথা আমরা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়ের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই ঔচিত্য বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই চেষ্টা যদি কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অনেক সময়ে প্রবর্ত্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ এবং সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে অনেক বিশাল ব্যাপারের প্রারম্ভ দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা আকস্মিক ক্ষণিক আঘাতের অপেক্ষা করিয়া থাকে ইহা দেখা গেছে। শিক্ষাসম্বন্ধে ও অন্যান্য নানা অভাবের প্রতিকারসম্বন্ধে এদেশের স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্বোধন সম্ভবত বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রতীক্ষায় ছিল, অতএব এই উপলক্ষ্যকে অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না।

তথাপি, স্থায়ী মঙ্গল যে উদ্যোগের লক্ষ্য, আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো ত্যাগসাধ্য ক্লেশসাধ্য মঙ্গল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই, পরের প্রতি রাগ করিয়া আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। রাগারাগির ষ্টীম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কি? গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তুবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না।

আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন আমাদের এখনি আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোন মতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবলক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোট হইতে বড় করিতে হইবে। অনিবার্য্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ছোট আরম্ভের প্রতি ধৈর্য্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। সেই জন্য শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পিতৃমাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয়। যথার্থ স্বদেশ প্রীতির প্রবর্ত্তনায় যখন আমরা কোনো কাজ আরম্ভ করি, তখন ক্ষুদ্র আরম্ভের প্রতিও আমরা অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিযা দিতে পারি। তখন কেবলি এই ভয় হইতে থাকে, পাছে অতিরিক্ত প্রলোভনের তাগিদে তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া যখন আমরা কোন উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। তখন আমরা এক মুহূর্ত্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেই জন্য আবম্ভকে আমরা কেবলি বার বার আঘাত করিতে থাকি।

দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই যে আঘাতকর অধৈর্য্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়। কাজের সূত্রপাত হইতেই আমরা বিবাদ সুরু করিয়াছি। আমাদের যাঁহার যতটুকু মনের মত না হইতেছে, যাঁহার যে পরিমাণ কল্পনাবৃত্তি অপরিতৃপ্ত থাকিতেছে, তিনি তাহার চতুর্গুণ আক্রোশের সহিত এই উদ্যোগকে আঘাত করিতেছেন। একথা বলিতেছেন না "আচ্ছা, হৌক. পাঁচজনে মিলিয়া কাজটা আরম্ভ হৌক;— কোন জিনিষ যে আরম্ভেই একেবারেই নিখুঁৎসুন্দর এবং সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারকে যদি খাড়া করিয়া তোলা যায়, যাহা চিরদিনের মত জাতীয় সম্বল হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জাতির সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিবে।"

বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল সভাসমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা কিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ

মনঃপূত হইতে পারে না। এই সকল সমিতির সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত, তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমত প্রণালীই বাস্তবিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে প্রণালীর প্রবর্ত্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে এ ধৈর্য্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সাধারণের সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের আদর্শরচনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম ও বিচক্ষণতাসহকারে আদর্শ রচনা কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল হউক বা না হউক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে অন্তত আমারত কোনো আপত্তি নাই।

কারণ, কাজের বেলা একজনকে মানিতেই হইবে। পাঠশালার ডিবেটিং ক্লাবকে সর্ব্বত্র বিস্তার করা চলে না। সকলে মিলিয়া বাদবিতণ্ডা এবং পরস্পরের প্রত্যেক কথার অন্তহীন সমালোচনা এ কেবল সেই প্রকার বৈঠকেই শোভা পায়, যাহার পরিণাম কেবল তর্ক। আমাদের তর্কের দিন যদি গিয়া থাকে, আমাদের কাজের সময় যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেককেই প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিনয়ের সহিত একজনের নায়কতা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষাচালনার নায়কপদ দেশ কাহাকে দিবে তাহা এখনো স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। বর্ত্তমান লেখকের মনে সন্দেহ নাই যে এই শিক্ষা ব্যাপারের কাণ্ডারীপদ হইতে যদি কোনো কারণে গুরুদাস বাবু অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহার উপর হইতে দেশের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে।

নূতন বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তনব্যাপারে গুরুদাস বাবুকে প্রধান স্থান দিবার নানা কারণ আছে, তাহার মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের বর্ত্তমান আন্দোলনব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই। তিনি এই আন্দোলনের সুবিধাটুকুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার আঘাতের প্রতি অমনোযোগী হইবেন না। কোটালের জোয়ারে নৌকাকে কেবল অগ্রসর করে তাহা নহে, ডুবাইতেও পারে। প্রবল জোয়ারের বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবলে হাল বাগাইয়া ধরা চাই। ভাসিয়া যাওয়াই লক্ষ্য নহে গম্যস্থানে পৌঁছানই লক্ষ্য— আন্দোলনের উত্তেজনায় একথা আমরা বারম্বার ভুলিয়া থাকি। আপাতত কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি স্পৰ্দ্ধা প্রকাশ করিয়া

আমাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধিতেই আমাদের চিরন্তন কল্যাণ একথা যাঁহারা এক মুহূর্ত্ত ভোলেন না, দেশের সঙ্কটের সময় তাঁহাদের হাতেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন রাগের মাথায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া মকর্দ্দমা জিতিবারই জেদ জন্মায়, তখনই শান্তচিত্ত প্রবীণ অভিভাবকের প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা সমস্ত স্বীকার করিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছি, এমন অবস্থায় যদি দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গলকর কর্ম্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়, তবে গুরুদাস বাবুর মত লোকের প্রয়োজন। স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্য সভা উত্তম, সংবাদপত্রও উত্তম, কিন্তু জাতীয়বিদ্যালয় নৈব নৈবচ।

যাহাই হউক্, আমাদের সংকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে তাহা জানি না। যদি দেশ যথার্থভাবে একাজের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর একটা জিনিষ গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্পনা কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে। সে জন্য ক্ষোভ করা বৃথা। ইহা নিঃসন্দেহ, দেশ যদি বাঁচিতে চায়, তবে আজ না হউক্ কাল পুনরায় এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ডও হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে মনে করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনের সমস্ত ঘটনা পরে পরে বিবৃত করা যাইতেছে।*

[রচনা ঃ শান্তিনিকেতন, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২]

---

* অগ্রহায়ণ ১৩১২-র এই বিশেষ সংখ্যার সূচীপত্রে বিষয়বিন্যাস ছিল এই রকম ঃ প্রথমে রবীন্দ্রনাথেব 'ভূমিকা', তারপর 'বিবরণ', সবশেষে 'বক্তৃতা'। 'বিবরণ' মানে কার্তিক-অগ্রহায়ণেব ঘটনার প্রতিবেদন। অংশটি বাদ দিয়েছি, কেননা ঘটনাগুলি বহুচর্বিত। ৫ই কার্তিক, ২২ অক্টোবর ১৯০৫-এর *স্টেট্‌স্‌ম্যান* কাগজে Carlyle Circular-এর খবর দিয়ে বিবরণ শুরু। বিবরণ শেষ ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর Anti-Circular Society প্রতিষ্ঠায় (১৮ই কার্তিক, চৌঠা নোভেম্বব ১৯০৫)। মাঝখানে অব্যাহত ছাত্রপীড়ন; এমন কি বয়কট রুখতে গুর্খা বাহিনী বা পিটুনি পুলিশ (punitive police) নিয়োগ।
বক্তৃতার মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ, তিনটি ছাত্রসভায় ঃ পটলডাঙার মল্লিকবাড়িতে (১০ই কার্তিক), Field & Academyতে (১৬ই কার্তিক) Dawn Society তে (১৯ কার্তিক)। পটলডাঙায় তাঁরই সভাপত্যে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু সদলবল শপথ নিলেন ঃ "যদি গভর্নমেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'ভূমিকা' থাকায় তাঁর বক্তৃতা বর্জন করা গেল। বাদ পড়েছে রসুল ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতাও। এবার অন্যান্য নেতাদের বক্তৃতা শুনুন।

— সংকলন-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা*

(অনুবাদ)

আপনারা যে আজ আমাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা করিবেন আমি তাহা কখনো ভাবি নাই। এ অভিনন্দনের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, আমি ইহার যোগ্যও নই। আপনারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি কোনো দ্বিধা কোনো সংশয় না করিয়া বলিতেছি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলনীতি (Principle) আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আমাদের স্বদেশী আন্দোলনেরই একটি অঙ্গ। আমাদের চিন্তা, আমাদের মত, আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সকল বিষয়েই আমাদিগকে স্বদেশী হইতে হইবে। আমাদের শিক্ষাকে গবর্ণমেন্টের হাত হইতে মুক্ত করিতেই হইবে। আমাদের শিক্ষা আমাদের নিজেদের ব্যাপার, ইহার সহিত গবর্ণমেন্টের কোনো সংশ্রব থাকা উচিত নয়। গবর্ণমেন্ট এবং শিক্ষা এই দুইটি জিনিষকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। বিলাতেও গবর্ণমেন্টের সহিত শিক্ষার কোনো সংশ্রব নাই। স্যর মাইকেল হিকস্‌বিচ্‌ আলিগড় কলেজে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনিও এই শিক্ষাস্বাতন্ত্র্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি কিম্বা বালকগণের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই সম্ভব নহে।

বন্ধুগণ, আমাদের হৃদয় যদি প্রস্তুত হইয়া থাকে তবে এ কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব হইবে না। আপনারা ইতিমধ্যেই পাঁচ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছেন (সকলে বলিলেন ঃ 'বেশী' 'ঢের বেশী')। বেশত; যদি এই পাঁচ লক্ষ টাকা আপনারা পান তবে আরো পাঁচ লক্ষ টাকা যে পাওয়া যাইবে এ কথা আমি বলিতে পারি। এতদ্ব্যতীত, সে দিন আপনাদের যে বিরাট সভা হইয়াছিল, আমি শুনিলাম তাহাতে আমার তরুন বন্ধু বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক (সকলে বলিলেন ঃ 'রাজা' সুবোধচন্দ্র) — না, — আমি বলি 'মহারাজা' সুবোধচন্দ্র— আপনাদিগকে এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আপনারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সকলের মনে এমন

* গত ৩০শে কার্ত্তিক কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ষ্টেসন হইতে অভিনন্দন করিয়া লইয়া আসিলে গোলদীঘির নিকট তিনি ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া ইংরাজীতে এই বক্তৃতা করেন। [—ভান্ডার প্রকাশক]

উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন যে লোকে বিনা বিবেচনায় লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই উৎসাহ হইতেই যে আমাদের অর্থাভাব দূর হইবে, তাহার আর কোনো সন্দেহ নাই।

আপনারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। আমি এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলনীতি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু ইহাকে বাস্তবাকার দিতে হইলে আমাদিগকে উৎসাহেব সহিত কার্য্য প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমি প্রস্তাব করি যে আপনাদের ঐ সোসাইটির ('এন্টি সাবকুলাব সোসাইটি') ছয় জন প্রতিনিধি এবং নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে ছয় জন প্রতিনিধি লইযা একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হউক। এই সমিতি এই সংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়ের আলোচনা কবিবেন। আপনারা দায়িত্বজ্ঞানহীন যথেচ্ছাচারী রাজপুরুষগণের অত্যাচারমূলক কার্য্যকলাপে কিছু মাত্রও বিচলিত হইবেন না। আপনারা আইনেব সীমা লঙঘন করিয়া কোন কার্য্যে করিবেন না কিন্তু যদি কোন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীও বেআইনী কোন আদেশ প্রচার করেন তবে তাহার নিকট আপনারা কখনও মস্তক অবনত কবিবেন না। যদি তাহা কবেন তাহা হইলে অন্যায়েব নিকট, অধর্ম্মেব নিকট, অপব্যবহৃত রাজশক্তির নিকট মস্তক অবনত করা হয়।

আপনারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপক্ষে সাধারণেব মত গঠিত করিয়াছেন, এ গৌরব আপনাদেরই প্রাপ্য। আপনারা সকলের হৃদয় আশান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। আপনাদের সহিত আমার সহানুভূতি আছে, আমি আপনাদিগকে সাহায্য করিব। এখন এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সফল করিয়া তুলিবার ভার আপনাদেব উপর।

এখন বোধ হয় বক্তৃতার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা এখন কাজ চাই— শুধু কাজ। আপনারা আমার আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রত্যেকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। আমার শুভাকাঙক্ষা, সমগ্র জাতির সহানুভূতি এবং সর্ব্বোপরি ভগবানের আশীর্ব্বাদ আপনারা লাভ করিয়াছেন। তাহাই লইয়া আপনারা আপনাদের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতা*

[অনুলিখিত]

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বক্তা বলিয়াছেন যে, এই যে য়ুনিভার্সিটির আন্দোলন, ইহার মধ্যে আমরা বিধাতার শুভ হস্তের সাক্ষাৎ পাইতেছি। কালকার যে সভার কথা মনোরঞ্জন বাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমিও উপস্থিত ছিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী সভা হইয়াছিল। প্রথম দুই ঘণ্টা সভার যে ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভীত হইয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, আমাদের সুখ সঙ্কল্প বুঝি কুজ্মটিকার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল। অবশেষে সকলের মত একীভূত হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। যে চক্ষুতে কখনও জল দেখা যায় নাই, সে চক্ষুও কাল অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। যে আননে কেহ কখন করুণা দেখে নাই, সে আননেও করুণার রক্তিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহা দেখিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, ইংলন্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপীয়র যে বলিয়াছেন There's a divinity which [that] shapes our ends, rough-hew them how we will ইহা অতি সত্য। এ ঘটনাতেও তাহাই দেখা গেল। আমাদের এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তখন কত লোকে কত ভ্রূকুটি করিয়াছিলেন। ইহাকে অজ্ঞতা, অর্ব্বাচীনতা, অকালপক্কতা এই সকল অভিধানে অভিহিত করিয়াছিলেন। কাল দেখিলাম, আমাদের যাঁহারা নেতা, সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারা বিধাতার কৃপায়— কাহারো বক্তৃতায় নহে, প্ররোচনায় নহে, প্রলোভনে নহে— কেবলমাত্র বিধাতার শুভ ইচ্ছায় স্থির করিলেন যে, আমাদের এখন national education on national lines under national control প্রয়োজন হইয়াছে। শুনিয়াছি 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। এত দিন আপনারা ভাবনা করিয়াছেন যে, আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন হয়। আজ আপনাদের সে শুভ ভাবনা সিদ্ধ হইয়াছে। এখন আপনারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

---

* গত ১লা অগ্রহায়ণ 'ফিল্ড এন্ড একাডেমী'র মাঠে 'জাতীয় শিক্ষা-সমাজ' ঘোষণা করিবার জন্য যে সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই বক্তৃতা করেন। শিক্ষার সহিত কোন সংশ্রব নাই বলিয়া আমরা তাঁহার বক্তৃতার প্রথমাংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। [—**ভাণ্ডার প্রকাশক**]

আপনারা শুনিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কতক অর্থ ইহার মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। আরও বহু অর্থের প্রয়োজন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ অধিনায়ক সুরেন্দ্র বাবুর মুখে আপনারা শুনিলেন যে, তিনি আশা করেন শীঘ্রই আমাদের ৫০ লক্ষ টাকা উঠিবে। সেই আশার প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলি যে, মরিবার পূর্ব্বে আমরা দেখিয়া যাইতে পারিব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে এক ক্রোর টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য জাপানীদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা। এই সভাতে তিনটি জাপানী ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন। তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, জাপানে মিকাডোর রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্য জাপানের জনসাধারণ চাঁদা দিয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে মিঃ ওকাকুরা নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাপানী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে 'দুই বৎসরের মধ্যে রুশ-জাপানে যুদ্ধ হইবে, এবং আমরা জয়ী হইব।' তাঁহার সে কথা আজ সফল হইয়াছে। তাঁহার মুখেই এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। ওকাকুরা বলেন, জাপান দবিদ্র দেশ— ভারতের চেয়েও দরিদ্র। সেখানে বড় অট্টালিকা নাই, সব কাঠের ঘব ও কাগজের দেওয়াল। কিন্তু যখন পাশ্চাত্যজাতিগণের সঙ্গে জাপানীদিগের মিলন হইল, পরস্পরের দেশে যাতায়াত আরম্ভ হইল, তখন জাপানের প্রধান ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, এমন একটি রাজোচিত প্রাসাদ (Royal palace) নির্ম্মাণ করিতে হইবে যাহা ইউরোপীযদিগের চিত্তেও সম্ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে। তখন তাঁহারা কি করিলেন? প্রত্যেক জাপানী জাপানের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য দান করিলেন। তাহাতে অল্প দিনেব মধ্যেই অনেক টাকা সংগৃহীত হইল। তাই বলি, আমরা যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ মহাপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে ধর্ম্ম বলিয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহার জন্য অর্থ সাহায্য করুন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে— beg, borrow or steal. আমি steal করিতে কাহাকেও বলি না। এই steal কথাটা ছাড়িয়া দিয়া সকলকে বলি— beg, borrow or kneel. এই সভাস্থলে আমরা অন্ততঃ পনের হাজার ছাত্র উপস্থিত আছি। এই পনের হাজার ছাত্র যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, beg, borrow কিম্বা kneel যেমন করিয়া হউক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রত্যেকে বেশী নয়, দশ টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া দিব— নিজেরা উপার্জ্জন করিয়া না দিতে পারি, অপরের নিকট ভিক্ষা করিয়া দিব— তাহা হইলে নেতারা যেমন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তেমনই আমরাও

আমাদের পনের হাজার ছাত্রের দান দেড় লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিব। আপনারা প্রত্যেকে দশ টাকা করিয়া দিন। আমাদের নেতারা দেখুন যে, আমরা স্বার্থত্যাগ করিতে জানি কিনা, তাঁহারা দেখুন আমরা যুবকেরাও প্রস্তুত আছি। তাঁহারা দেখুন আমরা যে শুধু আদান করিতে জানি তাহা নহে, প্রদান করিতেও জানি। উপার্জ্জন করিয়া হউক ভিক্ষা করিয়া হউক, ঋণ করিয়া হউক, যাঁহার যেমন সাধ্য তিনি তেমনি করিয়া দিন। আপনাদের পক্ষ হইতে 'ডন' সভার সম্পাদক সতীশ বাবু তাহা সংগ্রহ করিয়া নেতাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

আপনারা জানেন, যখন দয়ানন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ছাত্রেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া, শুধু চাল চানা সংগ্রহ করিয়া কলেজের জন্য দুই লক্ষ টাকা তুলেন। পাঞ্জাবীরা যাহা পারিয়াছে, বাঙালী কি তাহা পারিবে না? আপনারা সকলে বলুন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রত্যেকে নিজের জিনিষ বেচিয়া, নিজে কষ্ট করিয়া— beg করিতে, borrow করিতে যদি লজ্জাবোধ হয় তাই বলিতেছি— যেমন করিয়া হউক দশ টাকা তুলিয়া দিব। তাহা হইলে নেতারা বুঝিবেন, ইহাদের real earnestness আছে, ইহাদের উৎসাহ কেবল মৌখিক নহে। তাহারা বুঝিবেন যে, কেবল সামান্য প্রয়োজনে, কার্লাইল সার্কুলারের ভয়ে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাহিতেছি না। আমরা বুঝিয়াছি যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতির মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে জাতিরই প্রতিষ্ঠা হয় না। তখন আর উহাকে জাতি বলা যায় না, সে একটি লোকসঙ্ঘ মাত্র।

আপনারা দেখিলেন এখানে আমরা কেহ টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসি নাই, তবুও ইহার মধ্যেই আজ ১৩০০্ টাকা উঠিল। আমি ওকালতী করি— উকীলেরা agreement এর সময় বায়না লইয়া থাকেন— আমরা এই তের শত টাকাকে দেড় লক্ষ টাকার বায়নাস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। আমাদের সঙ্গে আজ agreement (চুক্তি) হইয়া গেল। আপনারা জানেন earnest money মূল্য থেকে বাদ যায় না। এও যাবে না। ভিক্ষা ক'রে, beg ক'রে, borrow ক'রেও কি আপনারা এই দেড় লক্ষ টাকা তুলিয়া দিতে পারিবেন না? আপনারা এই টাকাটা তুলিয়া দিন। দেখিবেন, তাহার পর লক্ষ লক্ষ টাকা আসিবে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উঠিবে।

আপনারা যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন। শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইলেই হইবে

না, আপনাদিগকে তার সেবার জন্য আসিতে হইবে। ওকালতীর লোভ, মুন্‌সেফির মায়া, কেরাণীগিরির প্রলোভন সব পরিত্যাগ ক'রে, দেশের সেবক হ'য়ে, অচলাভক্তি নিয়ে, দারিদ্র্যকে ভয় না ক'রে আপনাদের সকলকে আসিতে হইবে। শুধু প্ররোচনায় কিম্বা উত্তেজনায় আপনারা আসিবেন না, স্বদেশ-প্রেমের মোহন আহ্বানে আসিবেন। তাহা হইলেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতির গৌরবের জিনিষ হইবে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা*

[অনুলিখিত]

আজ আমার মুখে মুখোস আছে। জাতীয় শিক্ষাসমাজের কথা ঘোষণা করিবার জন্য এখানে যে দিন সভা হইয়াছিল, সে দিনও আমি মুখোস প'ড়ে [পরে] এসেছিলাম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিণ করবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছে— যাতে এই মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনের সুযোগ্য অধ্যক্ষ নগেন্দ্র বাবু আছেন, সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ আমার বন্ধু ক্ষুদিরাম বাবু আছেন, সিটি কলেজের হেরম্ব বাবু আছেন, বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশ বাবু আছেন, সর্ব্বজনমান্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আছেন— সেই কমিটিতে নগণ্য আমাকেও এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। কমিটির উপর কাজের ভার আছে, তাঁহারা সকল কথার বিচার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। সুতরাং কমিটির মন্তব্য প্রকাশিত হইবার আগে কিছু ব'লতে গেলে আমাকে অনেকটা সামলাতে হবে। আগে যা ব'লতাম এখন আর তা খুলে ব'লতে পারবো না। তবু আপনাদিগকে আজ যা বল্‌ছি মনে রাখবেন এ আমি privately বলছি— কমিটির মেম্বররূপে বলছি না। আমাকে আপনাদের মধ্যে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন 'আমরা একজামিন দেব কি না?' এর উত্তরে আমি বলতে পারি— কমিটির মেম্বররূপে নয়, তিনটি বালকের পিতারূপে বলতে পারি— আমার নিজের ছেলে যদি এসে আমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো তবে তাকে আমি বলতাম, 'বাবা, রংপুরের ছেলেরা সার্‌কুলারের জন্য পথে এসে দাঁড়িয়েছে, যতদিন তাদের একটা ব্যবস্থা না হয় ততদিন একজামিন দিও না, যদি মানুষের ছেলে হও তবে একজামিন দিও না, যদি পিতৃকুলের মুখোজ্জ্বল করতে চাও তবে একজামিন দিও না।' আমি আমার ছেলেকে বলতাম "তুমি বল যে 'বন্দে মাতরং' বলার জন্য স্বদেশের সেবা করার জন্য যারা অকুল সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে তাদের একটা কিনারা না হ'লে আমি ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যেতে পারি না।"

এখানে আমার কয়েকটি কুটুম্ব বালক আছে, তাদের বিদ্যাশিক্ষার ভার— সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয় পরোক্ষভাবে— আমার উপর ন্যস্ত আছে। তাহাদিগকে আমি বলিয়াছি

---

* গত ৮ই অগ্রহায়ণ 'ফিল্ড এন্ড একাডেমী'র মাঠে যে সভা হইয়াছিল সেই সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই বক্তৃতা করেন। [—ভাণ্ডার প্রকাশক]

'তোরা এবার একজামিন দিস্না'— একথা আমি তাহাদিগকে কমিটির মেম্বররূপে বলি নাই, ব্যক্তিগতভাবে বলিয়াছি— 'তোরা একজামিন দিস্না, তা না হ'লে আর জাত রক্ষা হয় না।'

আমি আমার নিজের ছেলেকে যা বল্‌তে পারি, তোমাদিগকেও তাই বল্‌তে পারি। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা ক'রবেন, 'তোমার ছেলের উপর তোমার অধিকার আছে, তোমার যা খুসি তাকে তা ব'লতে পার, তুমি তার সর্ব্বনাশও কর্‌তে পার। অন্যের ছেলেকে বল্‌বার তুমি কে?' আমি বাপ হয়ে, আম'র অঙ্গ থেকে হৃদয় থেকে যে জন্ম গ্রহণ করেছে, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের নিমিত্ত আমার জ্ঞান আমার বুদ্ধি আমার বিশ্বাস অনুসারে যা কর্ত্তব্য মনে করি, এ দেশের সকল বালকের পক্ষেও তাই কর্ত্তব্য মনে করি। একথা ব'লে তাদেক প্ররোচিত ক'র্‌তে আমি কিছু মাত্রও কুণ্ঠিত নই।

কাল ঐখানে বসে ('ফিল্ড এন্ড একাডেমী' ক্লবে) আমরা— আমার বন্ধু এই মিত্র সাহেব (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র), জ্ঞান বাবু, আর আমরা যাঁর প্রজা হয়েছি সেই 'রাজা' সুবোধচন্দ্র— রংপুরে পাঠাবার জন্য একখানা টেলিগ্রাম লিখ্‌ছিলাম। এমন সময়ে আমাদের সভাপতি মহাশয় (রংপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সেই টেলিগ্রামে আমরা লিখ্‌ছিলাম "আপনারা National Institution দৃঢ় ভাবে ধ'রে থাকুন। আমরা আপনাদিগকে আশা দিচ্ছি যে আমরা একটা National College স্থাপন ক'র্‌বো, তাতে Literary আর Scientific উভয়বিধ শিক্ষারই ব্যবস্থা থাক্‌বে। আপনাদের রংপুরের আদর্শ তাতে প্রসারিত হবে।"

আমি কেবল শূন্যগর্ভ কথা বল্‌ছি না। সেদিন আমাদের সুবোধ বাবুকে Land Holders' Association এর মন্ত্রণা সভায় যখন গুরুদাস বাবু, নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন— কমিটির মন্তব্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই, এ সকল কথা ব'লে বোধ হয় আমি কোন দোষ কচ্ছি না, কেননা সুবোধবাবু নিজেই এ কথাটি বল্‌বার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন— যখন জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'আপনার প্রদত্ত এই এক লক্ষ টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হবে?' তখন আমাদের 'রাজা' সুবোধচন্দ্র কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে বললেন, 'রংপুর, ঢাকা, রাণীগঞ্জ এবং অন্যান্য যে সকল স্থানের ছাত্রগণ 'বন্দেমাতরং' বলার জন্য কিম্বা [কিংবা] স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎ ভাবে হোক, পরোক্ষ ভাবে হোক, উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হ'বে, তাদের শিক্ষার জন্য আমার এই এক লক্ষ টাকা সর্ব্ব প্রথম ব্যয়িত হবে।' স্বদেশী আন্দোলনে

যোগদান করেছে ব'লে পবিত্র বন্দে মাতরং ধ্বনি উচ্চারণ করেছে ব'লে যে তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হবে না, তাদের ছুতোর কামার হ'য়ে থাকতে হবে তাতো নয়। আমরা একদিকে যেমন তাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের ব্যবস্থা ক'রবো অন্য দিকেও তেমনি তাদের উদরান্নের ব্যবস্থা ক'রবো। যাতে তাদের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা হয় তার জন্য সর্ব্বাগ্রে সুবোধ বাবুর এই এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। তিনি আরো বলেছেন, 'এ টাকা এই কার্য্যে এখন ব্যয়িত হউক, প্রয়োজন হইলে আমি আরো অর্থ দিব।' আমি সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, সুবোধ বাবু ত কোটীশ্বর ন'ন— কোটীশ্বর হ'লে কখনো এ টাকা তিনি বাহির করিতে পার্‌তেন না—আমি জিজ্ঞাসা করি কোটীশ্বর না হ'য়েও সুবোধবাবু কেমন ক'রে এত টাকা দিতে পারলেন? তাঁর যতটা শক্তি তিনি মায়ের নামে তা তুলে দিয়েছেন। তিনি ত অগ্রসর হয়েছেন, আমরাই কি কেবল পশ্চাৎপদ হব?

বাল্যকালে একটি কবিতা প'ড়েছিলাম, এখনও সেটি স্মরণ আছে—

যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্,
শুনিয়া চলিনু তোমারি ডাক।

আজ তোমাদিগকেও তাহাই বলিতে হইবে। তোমরা পঞ্চ পাণ্ডবের সেই স্বর্গারোহণের কথা স্মরণ কর। এই জাতীয় মহাযজ্ঞের পর স্বর্গারোহণ কর্‌তে মনে রেখো অনেক প্রিয়তম নিকটতম আত্মীয়তম খ'সে প'ড়ে যাবে। শুধু জেনো ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্টিরের [যুধিষ্ঠিরের] ন্যায় যে সত্যকে বজ্র মুষ্টিতে ধ'রে থাক্‌তে পারবে সেই স্বর্গারোহণ করবে। যে পারবে না সে ঝ'রে পড়্‌বে, খ'সে পড়্‌বে। তাই বলি—

যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্,
শুনিয়া চলিনু তোমারি ডাক।

তোমরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না। আবার দ্বিধা করিতেছ কেন? আজ আবার তাদের মত জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তখন কোন্ নেতার হুকুমে করেছিলে? সেদিন গোলদীঘিতে যখন নিজেরা বলেছিলে, 'আমরা গোলামখানা ছাড়বো', তখন কার কথা শুনে বলেছিলে? সে দিন আমি তোমাদিগকে বলেছিলাম, 'একটু থাম। দেখ ওঁরা কি করেন।' এখানেও সে দিন তোমাদিগকে বলেছিলাম, 'আশু বাবুর কথায় একটু থেমে থাক।' তখন বুঝি নাই, নেতাদের উপর বিশ্বাস বড় বেশী ছিল, অপরাধ হয়েছে, সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

নেতাদিগের হয়েই না হয় তোমাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সত্য ক'রবার সময়— দোষ দিও না— তাঁদের পরামর্শ নাও নাই, নিজের মতানুযায়ী সঙ্কল্প করেছিলে। এখন তাঁহাদিগকে সত্যভঙ্গের পাতকভাগী কর কেন? এখন বল কেন নিজেরা নিমিত্ত মাত্র কচ্ছি? তোমাদের নেতারা তোমাদিগকে ব'ল্‌চেন, 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিচ্ছ, পাশ করতে পার্‌লে ৮০০০, টাকা পাবে, যা পাবে তাই লাভ, পাগলামী ক'রে তা ছাড়বে কেন? পাশ যদি ক'রতে পার তবে এই ৮০০০, টাকা নিয়ে জাতীয় মিলে (mill) দাও না কেন? সেও তো দেশেরই কায।' আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যজমানের অবস্থা অনুসারে পাঁতির ব্যবস্থা করেন। তোমরা যে ব্যবস্থা চেয়েছ, সেই ব্যবস্থাই পেয়েছ। কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঃ যখন তোমরা প্রথম স্বদেশী আন্দোলনেব সৃষ্টি করেছিলে, তখন কি তোমবা মাড়ওযারীদেব দোকানে গিয়ে বলেছিলে 'তোমরা আগে দোকান বন্ধ কর তাবপর আমরা জিনিষ কিন্‌বো না'? তা ত কব নাই, তোমরা বজ্রধ্বনি ক'রে বলেছিলে, 'তোমার দোকান খোলা থাক আর নাই থাক, আমরা কখনও বিদেশী পণ্য নেবো না।' সেখানে যদি ব'ল্‌তে পেরেছিলে, তবে এখানেও সুরেন্দ্রনাথকে, নগেন্দ্রনাথকে সে কথা ব'ল্‌তে পাব না? দুই একই কথা। স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মাডওয়াবী বণিকও যা তোমাদেব এ শিক্ষার আন্দোলনে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাই। সেখানে তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য পালন করেছিলে ব'লে যেমন আজ মারওয়াড়ী বণিকও দেশী কাপড় দেশী জুতো এনে দোকানে রাখছে, তেমনি আজ যদি এই 'রাজার মাঠে' দাঁড়িয়ে তোমবা দৃঢ়ভাবে বল 'আমরা এখানে দাঁড়ালাম, ওখানে আর যাব না, যেখানে To let লেখা হযেছিল, সেখানে আর আমরা যা'ব না,' দৃঢ়ভাবে একথা যদি তোমরা ব'লতে পাব, তবে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হবেই হবে। অন্য পন্থা নাই। তোমাদের সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে ত তোমাদের গরজেই হবে, তোমাদের স্বার্থত্যাগে হবে, তোমাদের স্বদেশ প্রীতিতে হবে, তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞানে হবে। যদি না হয় তবে জেনো তোমাদের স্বার্থপরতায়, তোমাদের স্বদেশপ্রেমের ক্ষীণতায়, তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য হবে না। তোমাদিকে কোন উপদেশ দিচ্ছি না— আমি কমিটির মেম্বর, আমি বল্‌ছি বেশ ত অপেক্ষা কর, দেখ নেতারা একটা কিছু করবেনই— কিন্তু তোমরা জেনো মাড়ওয়ারীর দেশী মাল আনা না আনা একমাত্র গ্রাহকের উপর নির্ভর করে। আমি যে কমিটির মেম্বর হয়েছি সে কমিটির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণও তোমাদের সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করবে। তোমরা শুনেছ রাজা সুবোধচন্দ্র একলক্ষ টাকা তোমাদিগকে দিবেন। যদি কমিটি আর কোন কাজ নাও কর্‌তে পারেন, তবে সুবোধবাবুই College Council করাবেন, একথা মনে রেখো।

আর একটা কথা। আমরা যদি কলেজ কাউন্সিল করি, বিশ্ববিদ্যালয় করি, তবে ভয় আছে, এ কথা তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে। যাঁরা মোলায়েম ক'রে কথাটা বল্‌বার চেষ্টা কচ্ছেন, তাঁদের স্বদেশহিতৈষণা তোমাদের চেয়ে কম নয়, তাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা বুঝেছেন, ইংরাজের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলা যায় না। তাঁরা বুঝেছেন যে, নিজেদের শিক্ষার ভার আমরা যদি নিজেদের হাতে নিতে চাই তবে গবর্ণমেন্ট চাপ দিবেন। ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মিন্টো যদি কুটিল নীতি অবলম্বন করেন— লর্ড মিন্টো কি রকম চালে চ'ল্‌বেন এখন পর্য্যন্তও তা আমরা কিছুই বুঝি নাই—College Council খুল্‌লে আর এই রংপুরের, মাদারিপুরের ১৫টি স্কুলের এবং রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের ছাত্রগণ তাতে যোগ দিলে যদি সরকার বাহাদুর আইন পাশ করেন, যদি তাঁরা বলেন যে, দেশের জনসাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা সরকারের কর্ত্তব্য, আমরাই সে ভার লইবার প্রকৃত অধিকারী, যদি বলেন যে ছেলেরা কুশিক্ষা যাতে না পায় তাহা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য, এই জন্য যদি তাঁহারা নিয়ম করেন যে যারা শিক্ষা দিবে তাদের Licence নিতে হবে— রুশিয়ায় এ রকম Licence নিতে হয়; যদি কেউ লাইসেন্স না নিয়ে সেখানে পড়ায় তবে তাকে সাইবেরিয়ায় যেতে হয়— যদি তাঁরা এ কথা বলেন তখন ক'র্‌বে কি? ভেবে দেখো ২৫ বছর পরে এখানকার অবস্থা কি হবে। সে কথা বিবেচনা ক'রে কর্ত্তব্য স্থির ক'রো। এ বড় কঠিন দাবাখেলা, শুধু বৈরে ঠেল্‌লে হ'ল না, প্রতিপক্ষ কোন চাল চাল্‌বে তা বুঝে তোমার চাল চাল্‌তে হবে।

গবর্ণমেন্ট বাধা দিলেও আমরা জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবো, বাধা না দিলেও করবো। আমরা passive resistance এর চরম দৃষ্টান্ত দেখাবো। সকলে জানে হিন্দুর, বাঙালীর, ভারতবাসীর কোন শক্তি নাই। আমরা passive resistance দিয়ে সংযম দিয়ে পশুশক্তিকে বশ ক'রবো। আমরা কলেজ কাউন্সিল ক'রবো, আমরা পড়াব। জেল দাও, জেলে যাব। বে-আইনী করবে না কিন্তু অন্যায় কিছুও মান্‌বো না। নীলকরের কথা জান? নীলকরের আন্দোলনের সময় বাঙালী কৃষক দেখাইয়াছে আমাদের কি শক্তি। তারা ব'লেছিল হাত কাটো আর যাই কর, এ হাতে আর নীল বুন্‌বো না। কটা হাত কাট্‌বে? গবর্ণমেন্টকে নতশিরে নীলকরের অত্যাচার দমন কর্‌তে হ'ল। আমরাও তেমনি বলবো, আমরা পড়াব। ছয় মাসের জেল দেবে, দাও; তিন বছরের জেল দেবে, দাও— আমরা তবু পড়াব। এই মিঃ রায় (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়) বল্লেন তিনি মাষ্টারি করবেন। ধরুন তিনি জেলে গেলেন। বেশ। তারপর মিঃ মিত্র (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র) গেলেন। তার পর

আমিও গেলাম। সকলেই জেলে যেতে প্রস্তুত হবেন। জেলে যাওয়ার জন্য আমাদের পড়ান বন্দ [বন্ধ] হবে না। এই রকম ক'রে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে গবর্ণমেন্ট আপনিই অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌বেন।

যদি বল National University Calcutta University কে supersede ক'রবে না— supersede ক'রবে বল্‌লেই আবার লাইসেন্স নিতে হবে কিনা— যদি তাই বল, তবে ভেবো না ইংরাজ কিছু বুঝবে না। ইংরাজ এমন বোকা নয়। এ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে কি দেখ্‌তে পাও? এই দেখ্‌তে পাও যে এই শিক্ষার আন্দোলন প্রথম political আন্দোলন, তারপর educational আন্দোলন। কার্লাইল সার্কুলারের লায়ন সার্কুলারের তাড়নায় এবং 'বন্দেমাতরম'-এর অবমাননায় এর উৎপত্তি।... ..

ইংরাজ একথা বুঝেছে। তবে আর তেল সিন্দুব দিয়ে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, ওকালতীর ফাঁদ পেতে, শুদ্ধভাবে, কল্যাণ ভাবে, বন্ধুত্বের ভাণ করে, এ বিজ্ঞতা কেন? এখন স্পষ্টনীতি অবলম্বন ক'র্‌তে হবে, নিজেব শিক্ষা নিজের হাতে নিতে গিয়া জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে। ভাই বরিশালে কি অত্যাচার হচ্ছে চেয়ে দেখ।....

পড়া শুনা কিসের? যখন বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, তখন কি তোমরা বই খুলে পড়? গ্রামে যখন মড়ক লাগে, তখন কি কেউ একজামিনের ভাব্‌না ভাবে? বরিশালের খবর শুনে আমরা যে বুড়ো আমাদেরই রক্ত গরম হয়ে উঠে, মুখে ভাত যায় না, রাত্রে ঘুম হয় না, আর তোমরা কি এমনই অমানুষ হয়েছ যে তোমরা আজ একজামিন নিয়ে ব্যস্ত! তোমাদের যৌবনের সে উদারতা, যৌবনের সে দেবভাব, যৌবনের সে বিশ্বপ্রেম আজ কোথায়? মহাযোগেশ্বর নইলে ত এমন সময় কাহারো পুস্তকে মনঃসংযোগ হয় না। তোমরা কি মহাযোগেশ্বর হয়েছ যে, নেতৃগণ তোমাদের বল্‌ছেন "তোমরা একজামিন দাও"? ছাড়ো তোমার পড়া, কর তোমার বই বন্ধ— পড়বার আর সময় নাই। শুন্‌লাম আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, ছেলেরা এক বছরের জন্য পড়াশুনা ছাড়ুক। আমরাও বলি, তোমরা পড়াশুনা ছাড়ো। পড়াশুনা ছেড়ে দল বাঁধ, মুখে বল 'বন্দেমাতরং' আর প্রাণে মায়ের অভয় নিয়ে যাও বরিশলে যাও, যাও মাদারিপুরে যাও, যাও ফরিদপুরে যাও। যেখানে গুর্খা গিয়াছে সেখানে যাও, যেখানে গুর্খা যায় নাই সেখানেও যাও। গিয়া গ্রামে গ্রামে 'বন্দেমাতরং'এর রব তুলিয়া দাও।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্তের বক্তৃতা*

[অনুলিখিত]

আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ। বড় শহরে বা রাজধানীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে, ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এবং নেতৃবর্গের সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হয়, তাহার বড় খবর রাখি না। বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে আমার পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধিতে আমি যা বুঝেছি, তোমাদিগকে তাই ব'ল্‌বো।

প্রথমেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। ইংরাজ রাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? বিস্তৃতভাবে ধরিতে গেলে রাজশক্তি প্রজাশক্তির প্রতিভু, রাজশক্তি প্রজাশক্তি একই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একথা যে সম্পূর্ণ ভাবে সত্য তাহা বলা যায় না। ইংরাজ বহুদূর থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন। তাঁরা কেবল যে আমাদের উপকারের জন্যই এসেছেন একথা যদি আমরা বুঝি,তবে ভুল বুঝবে; আর তাঁরাও যদি একথা বলেন, তবে ভুল বল্‌বেন। ইংরাজকে— শুধু ইংরাজ কেন ইউরোপের অন্যান্য জাতিকেও— আমরা কি ভাবে দেখতে পাই? বণিকরূপে। সমস্ত পৃথিবীটা তাদের বাজার হ'য়ে প'ড়েছে। আমাদের দেশও ইংরাজ বণিকের একটা বড় বাজার মাত্র। ইংরাজ বণিকের স্বার্থ আর ইংরাজ রাজের স্বার্থ এক। সুতরাং ইংরাজ রাজ চান যে তাঁহাদের এ বাজার যেন বজায় থাকে আর ইংরাজ বণিকের পণ্য কিনিবার মত অবস্থা আমাদের থাকে। আমাদের দেশ যদি একেবারে শ্মশান ভূমি হ'য়ে উঠে তবে ইংরাজ আর পণ্য বেচ্‌বে কাকে? তাই ইংরাজ চান যে সর্ব্ব বিষয়ে আমরা তাঁহাদের উপর নির্ভয় করিয়া থাকি। আর এই দেড় শত বৎসরে আমাদেরও এমন অবস্থা হয়েছে যে এমন কোন বিষয় নাই যাহার জন্য আমরা ইংরাজের উপর নির্ভর না করি। ছেলেদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হবে, দাও ইংরাজের স্কুলে; রাস্তা ঘাট তৈয়ার করিতে হবে, যাও ইংরাজের কাছে; হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিতে হইবে, চাও ইংরাজের মুখের পানে; মহামারী নিবারণ করিতে হইবে, ডাকো ইংরাজকে। তারা কর্‌লে হ'ল, না কর্‌লে হ'ল না। এইরূপ সকল বিষয়েই আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক একেবারে পরাধীন হ'য়ে আছি। তোমরা ইংলন্ডের ইতিহাসে পড়েছ যে রোমানেরা যখন ইংল্যান্ড অধিকার করেছিলেন, তখন ইংলন্ডের সমস্ত লোক একেবারে

* গত ১০ই অগ্রহায়ণ 'ফিল্ড এন্ড একাডেমী'র মাঠে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এই বক্তৃতা করেন। [—ভাণ্ডার প্রকাশক]

Romanised হ'য়ে গিয়াছিল; প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাদের রোমানদের মুখাপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হত। তারপর রোমানেরা যখন চ'লে গেল তখন এক অসভ্য বর্ব্বর জাতি এসে তাদের পরাজয় করলে। আমাদেরো তেমনি অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যদি ইংরাজ আমাদের দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে চান তবে আমাদের পায়ে ধ'রে তাঁহাদিগকে রাখ্‌তে হবে। আমাদের উপর কেহ অসহ্য অত্যাচার ক'রলেও হাত তুলে আমরা তার প্রতীকার [প্রতিকার] করতে পারি না। এই দেড় শত বৎসরে সর্ব্ব বিষয়ে আমরা অকর্ম্মণ্য অপদার্থ হয়ে পড়েছি। এতদিন আমবা কাজের মধ্যে একটু লেখা পড়া কবেছি, সভা করেছি, বক্তৃতা কবেছি— জাতীয় উন্নতির জন্য তেমন বড় কোন স্বার্থ ত্যাগ বা তেমন বড় কোন কাজ করি নাই। এখন তোমরা ভেবে দেখ কি অবস্থায় তোমরা পড়েছ। ইংরাজের স্বার্থ— তোমাদিগকে এই অকর্ম্মণ্য অবস্থায় রাখা। তোমাদের স্বার্থ— আত্মনির্ভর অবলম্বন করা। এই আত্মনির্ভরের জন্য সর্ব্ব প্রথমে আমাদেব শিক্ষাকে স্বাধীন করা দরকার। তার পর শিল্প বাণিজ্য, তার পর অন্যান্য সাধারণ কাজ, সমস্তই আমাদের নিজেদের হাতে নিতে হবে। এমন কি তাবপর কোন দিন ইংরাজের অধীনে থেকে পার্লামেন্টের মত কোন representative system এ আমাদের হাতে রাজ্য শাসনেব ভার আস্‌তেও পারে।

এতদিন আমরা কেবল সভা সমিতি করিয়া আসিয়াছি, এখন প্রকৃত কার্য্যের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আজ বাংলাদেশে এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। নির্জ্জীব, জড়, পরনির্ভব পুরাণো বাংলা ভাঙিযা আজ সজীব কর্ম্মঠ, আত্মনির্ভর নূতন বাংলা গঠিত হইতেছে। ছাত্রেরা বুঝেছ, এ নূতন বাংলা কারা গড়্‌বে? তোমরা। কাদের নিয়ে এ নূতন বাংলা? তোমাদের নিয়ে। যারা আজ এই নূতন বাংলা গড়্‌বে তাদের বোঝা উচিত যে পুরোণো ভেঙে নূতন কিছু গড়্‌তে গেলে অনেক বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। বাড়িতে যদি ফাটল ধরে আর সে বাড়ি যদি নূতন ক'রে গড়্‌তে হয় তবে সব ভাঙা চুরা করতে হয়। অবশ্য আমি একথা অস্বীকার কচ্ছি না যে নূতন গড়বার সময় পুরোণোর যে টুকু ভাল তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমি আজ তোমাদিকে শুধু এই কথাই বল্‌ছি যে সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে কখনও আমূল পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে না। যদি এই নূতন যুগে তোমরা পুরাতন ভেঙে নূতন গড়্‌তে চাও তবে তোমাদিগকে যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে হবে। তোমরা পথে পথে গান গেয়ে বেড়াও 'আমরা দেশের জন্য সব দিব'। এই 'সব দেওয়া'র অর্থ কি জান? এর অর্থ স্ত্রী ভুলে যাওয়া, পরিবার ভুলে যাওয়া, ভাই ভুলে যাওয়া; যা কর্ত্তব্য ব'লে বুঝবো দুঃখ আসুক কষ্ট আসুক ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে তাকে অম্লান বদনে আলিঙ্গন করা।

যা কর্ত্তব্য ব'লে বুঝবে তোমরা কোন দ্বিধা কোন সংশয় না ক'রে তা কর্‌বে। কর্ত্তব্য পালন করা কিছু ছেলে খেলা নয়। সুখস্বচ্ছন্দতা বজায় রেখে কর্ত্তব্যের কঠোর আদেশ পালন করা যায় না। মনে কর প্রবল শত্রু কোন দেশ আক্রমণ করেছে। দেশে যারা যুদ্ধ কর্‌তে জানে তারা যুদ্ধ কর্‌তে গেল। যুদ্ধের সময় সব ওলট পালট হয়েই থাকে। এখন রাজ্যের দোকানদার যদি বলে আমার দোকান টুকু বজায় থাকবে, চাষী যদি বলে আমার ক্ষেত খানি নষ্ট হবে না, গৃহস্থ যদি বলে আমার বাড়িতে আঁচর টুকুও লাগবে না, রাজা যদি বলেন আমার রাজধানীর কোন ক্ষতি হতে পারবে না, তবে তাহা কি কখন সম্ভব হতে পারে? রাজা প্রজা দোকানদার সকলের এক লক্ষ্য থাকা উচিত— কিসে দেশ রক্ষা হয়। দেশ রক্ষা কর্‌তে গিয়ে নিজের যদি ক্ষতি হয় তা মনে করা উচিত নয়। তোমরা যখন বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করেছিলে, তখন অনেক দোকানদারের স্তূপীকৃত বিলাতী জিনিষ ছিল। তা নষ্ট হ'ল। তাদের ক্ষতি হ'ল কিন্তু তাতে জাতির উপকার হ'ল। তোমাদিগকেও আজ সর্ব্বস্ব দিতে হবে, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা খুজ্‌তে গেলে তোমাদের চল্‌বে না।

তোমাদের আর একটি সমস্যা এই সার্‌কুলার। সার্‌কুলার যখন জারি হয় তখন তোমরা সকলে এক বাক্যে উৎসাহ ভরে বলেছিলে 'সার্‌কুলারের ভয়ে আমরা কখন দেশের সেবা ছাড়বো না।' তোমরা দেশের সকল ছাত্র একত্র হয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এখন তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপন্ন হয়েছে। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য কি? তোমাদের কর্ত্তব্য তোমাদের বিপন্ন ভাইদের সহায় হওয়া। টাকার জন্য তাহারা তোমাদের মুখের দিকে চাইবে না, তারা তোমাদের কাছে যা প্রত্যাশা করে তোমরা তাদের তাই দাও। গবর্ণমেন্ট বলেছিলেন যারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবে তারা পরীক্ষার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হবে। যখন তারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য বিপন্ন হয়, তখনও তোমরা তাদের বলেছিলে 'বিশ্ববিদ্যালয় যদি ছাড়তে হয়, ছেড়ো; কিন্তু দেশের সেবা হ'তে কখন বিরত হয়ো না'। আজ তারা দেশের সেবার জন্য পরীক্ষার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে। তোমরা কি এখন সেই পরীক্ষা দিতে পার? তোমরা যারা এক সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরীক্ষার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যারা সে অধিকার হ'তে বঞ্চিত হও নাই, তারা আজ পরীক্ষায় উপস্থিত হতে পার কি? তোমরা এখন পুরানো ভেঙে নূতন গড়ার মধ্যে পড়েছ। এখন তোমাদের সকলের মধ্যে একত্বের ভাব জেগে উঠা উচিত। যাদের হাতে নূতন বাংলা গড়ার ভার, যাদের নিয়ে নূতন বাংলা, তারাই আজ নূতন বাংলার

ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত কচ্ছ। আমি যে ভাবে কথাটি দেখি সেই ভাবে তোমাদের কাছে উপস্থিত কল্লাম। তোমাদের কি করা কর্ত্তব্য তোমরা স্থির কর্‌বে।

তারপর লাভালাভের কথা। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত মনে করেছ এবার এম.এ কি বি.এ পরীক্ষা দিবে। বি.এ যদি পাশ কর্ত্তে পার, তোমরা কেহ কেহ হয় গবর্ণমেন্টের চাকরি করবে না হয় ওকালতী না হয় ডাক্তারি করবে। গবর্ণমেন্টের চাকরির মধ্যে ডেপুটিগিরি, মুন্সেফী কি কেরানিগিরি। হাজার হাজার ছেলে বি.এ. পরীক্ষা দেয় কিন্তু কটা ছেলে ডেপুটি হতে পারে? প্রতিযোগী পরীক্ষা যদি প্রচলিত থাক্‌ত তবে ভাল ছেলেদের কিছু আশা থাক্‌তো, কিন্তু এখন তো তাও হবার যো নাই। এখন এই গোলামীর জন্য পরের দ্বারে যে গোলামী কর্ত্তে হয়, তা কেবল গবর্ণমেন্ট চাকুরের ছেলে বা জামাইদেরই সাজে। মুন্সেফীর আশাও প্রায় ডেপুটিগিরির মতই। বি.এ. পাশ করে দুই বছর পরে বি.এল. দিবে, তার পর তিন বছর ধ'রে ওকালতি করবে, তার পর নাম enrolled হবে, তার পর acting মুন্সেফ হবে, তার পর ৭/৮ বৎসরের পর পাকা মুন্সেফ হ'তে পার। কেরাণীগিরি ও মাষ্টারির অবস্থা আরও শোচনীয়। আমাদের স্কুলে ১৫্ টাকা মাহিনায় একটি মাষ্টারি খালি হয়। তার জন্য ৫/৬ জন বি.এ. ফেল ভদ্রলোক দরখাস্ত করেন। তার মধ্যে এক জনকে ২ বছরের গ্যারান্টি নিয়ে মনোনীত করা হয়। তাও আবার on probation. এঁদের আর দোষ কি? দেশেরই এমন দুরবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ভদ্রলোকের ছেলের লেখা পড়া শিখেও আর মান রক্ষা করা কঠিন। এঁদের মধ্যে আবার অনেকে ১৫্ টাকায় ঢোকেন, আশা থাকে ওকালতী পরীক্ষা দিয়ে পরে উকীল হবেন। আমি আজ ৮/৯ বৎসর শিক্ষকতা কচ্ছি, আমি দেখে আস্‌ছি, উকীল হবেন বলে অল্প মাইনায় যাঁরা শিক্ষকতা নেন তাঁদের আর উকীল হওয়া হয় না। আর উকীল মোক্তারের দশা যা তাত আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি। মাদারিপুর একটা ছোট সাবডিভিসন। তাতেই প্রায় ৮০ জন মোক্তার। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিশেষ লাভের কিছুই নাই এখনও তাহা তোমরা বুঝিতে পার না কেন?

ওকালতী মোক্তারী এ সব ক'রে এখন আর কিছু হবে না। এখন ব্যবসা বাণিজ্যের পথ দেখতে হবে। কিন্তু ব্যবসা করতে যেয়েও সকলেরই বড় বড় আশা থাক্‌লে চল্‌বে না। বড় বড় আশার জন্য ব্যবসায়ে অনেক সময় সফলতা লাভ করা যায় না। সাধারণ ছাত্রদের ছোট ছোট আশা নিয়ে ব্যবসায়ে ঢুক্‌তে হবে।

আমার যা মত তা বল্লাম। তোমরা বেশ ক'রে বুঝে কর্ত্তব্য স্থির ক'রো। এখনই ধীর ভাবে ভেবে দেখো,পরে কেঁদোনো। এসব বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষা ক'রো না।

ভান্ডার ।। পৌষ ১৩১২

স্বদেশী আন্দোলনের কথা*

আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক অতি-বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবনসঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র উপায়, এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দারিদ্র্য সমস্ত জাতির অধঃপতনের অঙ্গ মাত্র, সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবনসঞ্চারিণী আশা— যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদিগকে চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালী জাতির শ্রবণবিবরে এক আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব স্বাধীনতাসঙ্গীত ঢালিয়া দিতেছে না? আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙালী জাতির আত্মনির্ভর পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে।

জগতের ইতিহাস বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তি আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেই রূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হইবে। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

---

* ১৬ই অক্টোবর দার্জিলিং হিন্দুহলে পঠিত

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। মনে করিয়া ছিলাম, ইংরাজ আমাদিগের সকল দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে, একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম।

তাহার যথাযথ কারণও ছিল। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানাকারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চির পুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, কেবল মাত্র মৌখিক মন্ত্রের আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপরদিকে যে অপূর্ব্ব প্রেম-ধর্ম্মবলে মহাত্মা চৈতন্য সমস্ত বাঙ্‌লা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেম-ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র মালা ঠোকাইতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল; আর আমাদের সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূণ্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূণ্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌবব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী; বাঙালীর জীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপ কি ধর্ম্মে কি জ্ঞানে বাঙালী তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, বাঙালীর বলবীর্য্য পর্য্যন্ত তখন নিতান্ত কৃতঘ্নের মত সমস্ত বাঙালী জাতির গলদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইতে ব্যস্ত ছিল।

এমন সময়ে—সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক্‌বেশে আগমণ করিয়া আমাদেরই জাতীর দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়া দুই একদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপনপূর্ব্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দান করিল, আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতানিবন্ধন আমরা শুধু ইংরাজের রাজত্বকে নয়, সমগ্র ইংরাজজাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে দুই হাতে আকড়িয়া ধরিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই দুর্ব্বলতার জন্যই বোধ হয় আমাদের চক্ষু ইংরাজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারে নাই। আমরা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময় ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে

করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হয়; আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, আমাদের নিজের সাহিত্যের প্রতি একেবারে দৃক্‌পাত না করিয়া, আমাদের নিজের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ধাবমান হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজের রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমরা মোহ-মুগ্ধ হইয়া একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজেরই জাতীয় জীবনের প্রতিমা, আমাদের নহে; ইংরাজের সাহিত্য ইংরাজেরই জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পার, তাহার সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; ইংরাজের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য কিছুতেই ঘুচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারণ হয় না, ইহা অতি সোজা কথা— অত্যন্ত সরল সত্য; কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে বোধ হয় এমনই করিয়া অতিশয় সরল সত্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজের ক্ষমতা দেখিয়া আত্মজ্ঞান হারাইতে ছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইতে ছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। যে Proclamation* লইয়া আমরা এত গর্ব্ব করি, এবং কথায় কথায় যাহার দোহাই দেই, তার মধ্যে যে কোন অন্ধকারকোণে আমাদের সকল আশা ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য— "So far as it may be" এই বাক্যময় শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল, তাহা একেবারে অনুভব করিতে পারি নাই। Curzon বাহাদুরকে ধন্যবাদ দি, তিনি সেদিন আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন—তস্করের গুপ্ত ছুরিকা সেই অন্ধকার কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আমরাও ভাল করিয়া Proclamation এর গূঢ় তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি! জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন, এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

আর আমরা ভুলিয়া ছিলাম ইংরাজের Pax Britan[n]ica-এ—ইংরাজ রাজনীতি হইতে উৎপন্ন এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় মহাশান্তি। এই মহাশান্তির প্রসাদে আমরা

---

* সিপাহি বিদ্রোহশেষে মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র, ১৮৫৮ — সংকলন-সম্পাদক

গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দারূপী পঞ্চায়েত-বেষ্টিত, সহরে সহরে অতি ধীর শান্ত বহুশিষ্টাচারসম্পন্ন লালপাগড়ীওয়ালার কোমল-করুণ রুলের স্পর্শে সর্ব্বদাই শান্তি রসে নিমগ্ন, জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের দল আমাদের শান্তির উপায় অন্বেষণ করিতে সদা সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া চাবুক-হস্তে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং ডিভিসনে ডিভিসনে কমিশনারবৃন্দ এই অদ্ভুত শান্তিপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আর রাজধানীতে—কখনও বা শৈলশৃঙ্গে—ইহাদের সকলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা অতিশয়শ্রম-শ্রান্ত বহুভাবনা-ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর আমাদের ছোটলাট বাহাদুর দ্বিতীয় নেপোলিয়নের ন্যায় নৃত্যসভায় পর্য্যন্ত সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে কি করিয়া যে এই বাঙালী জাতির শিরায় শিরায় এই মহাশান্তির অহিফেন প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সেই ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছেন! হায়রে বৃটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগ্য! আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী নিছক্ শান্তি আমাদের জীবনকে আরষ্ট [আড়ষ্ট] করিয়া রাখিবার উপায় মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, ইহা যে মৃত্যুর শান্তি, ইহার উপরে কোন দিন কোন কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না।

আজ ভগবৎপ্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণচ্ছায়ারূপী এই মহামায়া কুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছে। এই নবোন্মেষিত জাতীয়ত্বের প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর—পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তর-বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণনেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটা খানি উত্তমরূপে চুসিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছুই দিবে না। আর বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোন দিন আমাদের মুক্তির দ্বার উদঘাটিত হইবে না। সেইজন্যই আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই নব আন্দোলন আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, কারণ ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু আমাদের চিরকালের ভাগ্যহীনতা এইক্ষণেও আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমাদের দেশে এক সময় তর্কশাস্ত্র আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ

করিয়াছিল এবং যদিও এখন আর তর্কশাস্ত্রের সেই উন্নত অবস্থা নাই, তথাপি আমাদের দূরদৃষ্টবশত নিষ্ফল তার্কিকের কোন অভাবই পরিলক্ষিত হয় না। উপহাস-রসিকেরও প্রাদুর্ভাব কম নহে। তাহাদের শুষ্ক স্বদেশ-প্রেম-বর্জ্জিত হৃদয় হইতে দুই একটা শাণিত বাক্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অতিশয় বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া আপনার সুখে অস্থির হইয়া উঠেন। কিন্তু সে তর্ক ও সেই উপহাস মাতার আহ্বানকে কিছুতেই ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে শত-লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরং' ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্তই হতভাগ্য! আর যে ডাক শুনিয়াছে, কিন্তু শুনিয়াও আপনার ছোট খাট স্বার্থগুলিকে সম্মুখে ধরিয়া আপনার মস্তিষ্ক হইতে আকৃষ্ট মিথ্যা তর্করাশি এবং আপনার করুণাবর্জ্জিত হৃদয়জাত শুষ্ক তুচ্ছ উপহাসের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সে সরকারি উকিলই হউক, বা ছোট কি বড় রকমের সরকারি জুজুই হউক, কি সামান্য কেরাণী কি সমান্যতর ক্লার্কই হউক, — সে মাতা ও বিধাতার অপমান করিতেছে—সে মাতৃদ্রোহী—ঈশ্বরদ্রোহী! তুষানলেও তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

তার্কিকেরা ও উপহাস-রসিকেরা যাহাই বলুক, তাহাতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার কোন কারণ নাই। আমরা মায়ের ডাক শুনিয়া অগ্রসর হইয়াছি, আমরা কি দুটা নিষ্ফল তর্ক ও নিষ্ফলতর উপহাস শুনিয়া ফিরিয়া যাইব? বিধাতার অমোঘ বাণী আমাদের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে, আমরা শত তর্ক শত যুক্তি শত সহস্র উপহাস অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া বিধাতার বাণীকে শিরোধার্য্য করিয়া বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইব। আর অধিক পরিষ্কার দেখিতেছি যে, অচিরে আমাদের এই নব আন্দোলন ফলবান হইয়া তার্কিককে লজ্জিত করিবে ও উপহাস-রসিককে উপহাস-যোগ্য করিয়া তুলিবে।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে Boycott বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন; সুতরাং ইহার উপর আমাদের জাতীয় উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বদেশীয়তা স্বদেশপ্রেমের উপর প্রাতিষ্ঠিত, তদ্দ্বারা জাতীয় জীবন পুষ্টিলাভ করিবে। ইঁহারা স্বদেশী আন্দোলন চা'ন, কিন্তু Boycott চা'ন না। ইহা শুধু বুঝিবার ভুলমাত্র আর কিছুই নহে। আমি কখনই স্বীকার করিব না যে Boycott বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। Boycott ও স্বদেশীয়তা এ দুই স্বদেশপ্রেমভাবাপন্ন। বৈষ্ণবকবিদের ভাষায় বলিতে গেলে Boycott পূর্ব্বরাগ, স্বদেশীয়তা মিলন। মাতার আহ্বান শুনিয়াছি

বলিয়াই বিদেশী বিলাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কুলটা রমণীর ন্যায় বিলাতী বিলাস তাহার শত সহস্র ছলা-কলা বিস্তার করিয়া তাহার অধরের হাস্যে, তাহার নয়নের ভঙ্গিমায়, তাহার সুন্দর হস্তের কোমল পরশে আমাদিগকে একেবারে মোহমুগ্ধ করিয়া তাহার বাহুবন্ধনের মধ্যেই আমাদের সুখ নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। সেই বাহুবন্ধন হইতে আমাদিগকে একেবারে মুক্ত না করিলে কেমন করিয়া আমাদের সেই চিরধৈর্য্যশীলা চিরকল্যাণময়ী মাতা—যিনি এতদিন ধরিয়া তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে কল্যাণপ্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহার পবিত্র কল্যাণময় প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিব? আর এই যে বিলাতীদ্রব্য বর্জ্জন করিতেছি, ইহাতে কি প্রতিদিন আমরা সংযমশিক্ষা করিতেছি না? সংযম ব্যতীত কখনও কি প্রেম স্থায়ী হয়? প্রতিদিনই কি বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন করিবার সময়ে স্বদেশের কথা স্মরণ হয় না? প্রতি প্রভাতেই কি আমাদের কোন জিনিষ ক্রয় করিবার আবশ্যক হইলে স্বদেশের কথা ভাবি না। এই জিনিষ ক্রয় কবিব, কারণ ইহা স্বদেশজাত, ইহা আমরা কিনিব না, কারণ ইহা আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় নাই; প্রতিদিন আমরা এইরূপ ভাবিয়া থাকি এবং প্রতিদিনই আমাদের এই বর্জ্জনের মধ্য দিয়া স্বদেশপ্রেম সজীব হইয়া উঠিতেছে।

আবার অর্থশাস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে Boycott নিতান্ত আবশ্যকীয়। ইংরাজি অর্থশাস্ত্রে যাহাকে production বলে, তাহার জন্য demand আবশ্যক। আমরা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া সেই demand এর সৃষ্টি করিতেছি। একবার যদি Boycott এর দ্বারা আমরা স্থায়ী demand দাঁড় করাইতে পারি, আমাদের দেশের লুপ্ত ও নষ্ট বাণিজ্য মাথা তুলিবেই তুলিবে।

আমাদের দেশে আর একদল আছেন—যাঁহারা Boycott চা'ন, কিন্তু স্বদেশীয়তা চা'ন না। তাঁহারা বলেন Boycott একটা রাজনৈতিক চাল্, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয়তা অর্থশাস্ত্রবিরুদ্ধ, আমরা কি জগতের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দিব? ইত্যাদি। হে অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত! আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষ আগে না তোমার অর্থশাস্ত্র আগে, মানুষ বড় না তোমার অর্থশাস্ত্র বড়? আগে, আমাদের মানুষ হইতে দাও। আমরা মানুষ হইলে জগতের সহিত আদন-প্রদান করিব। আগে আমাদিগের ক্ষুধার অন্ন লজ্জানিবারণের বস্ত্র নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে দাও। এই যে প্রতিদিন Manchester-জাত ইংরাজের পদাঙ্কিত নামাবলী গাত্রে ধারণ করিয়া মানব-কলঙ্কস্বরূপ ঘুরিয়া

বেড়াইতেছি—এই মহালজ্জা হইতে জাতীয় জীবনকে উদ্ধার কর। তার পর যখন ধীরে ধীরে এই আত্মনির্ভরের পথ অবলম্বন করিয়া জাতীয় চেষ্টায় জাতীয় শক্তি ও প্রভাবে বিশ্বমানবের ক্রোড়ে আমাদের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিব, তখন জগতের সহিত আদান-প্রদান জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করিবে—তাহাতে লজ্জার কারণ থাকিবে না।

আর বৃথা তর্ক করিবার সময় নাই। এই যে স্বদেশী আন্দোলন ইহাকে যেমন করিয়াই হউক জাগাইয়া রাখিতে হইবেই হইবে। ইহারি উপরে আমাদের সকল আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে এমন অনেক উপহাসরসিক আছেন, যাঁহারা বলেন "তোমরা কি করিতে চাও?—তোমরা কি Company-র রাজত্ব উল্টাইয়া দিবে?" এ কথার উত্তর অতি সহজ। আমরা আর কিছু চাইনা—আমরা আমাদিগকে মানুষ করিতে চাই। ইংরাজের সহিত আমাদের শুধু রাজাপ্রজাসম্বন্ধ। ইংরাজের আইন আমাদিগের মানিয়া চলিতেই হইবে; কিন্তু ইংরাজকে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন কখনই অধিকার করিতে দিব না। ইংরাজের আইনের গণ্ডির বাহিরে, ইংরাজের সহিত আমাদের যে ক্ষেত্রে সম্বন্ধ, তাহারও বাহিরে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা সেইখানে আমাদের মাতার বিজয়-নিশান উত্তোলিত করিব। আমরা সেইখানে বাঙালীর কলঙ্ক ঘুচাইব। আমরা সেইখানেই আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিব। তারপর যে অনন্ত মহান্ পুরুষ আপনাকে সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সকল মানবের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে, সকল জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কি ভাবে—কি রূপে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আপন'কে প্রকাশিত করিবেন, তাহা তিনিই জানেন—শুধু তিনিই জানেন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

প্রস্তাব*

জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থে—

'বঙ্গমাতা' নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হউক। অতিসহজ—অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এমন কি চাষাড়ে ভাষায় তাহা লিখিত হউক। অশিক্ষিত জনসাধারণ যেন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। বোধোদয়-পড়া লোক যেন তাহা বুঝিতে পারে। মূল্য দুই টাকা হউক। সপ্তাহে যেন এক লক্ষ কি দুই লক্ষ ছাপা হইতে পারে এমন যোগাড় যন্ত্র করা হউক। মফস্বলে আমরা লোকের হাতে পায় ধরিয়া গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিব। এখনও মফস্বলের লোক কিছুই অবগত নাই। তাহারাই দেশের জীবন, তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে।

কলিকাতার সভায় উহারা কেহ যাইতে পারে না, গেলেও বক্তৃতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, আব্রহ্ম স্তম্ভ [আব্রহ্মস্তম্ব] পর্য্যন্ত সকলে বুঝিতে পারে, এমন একটা সংবাদপত্র প্রচার করা নেহাত্ দরকার, আমরা মফস্বলের লোক, উহার অভাব খুব বুঝিতে পারি।

এইরূপ করিলে জাতীয় ধনভাণ্ডারে অধিক অর্থাগম হইবে।

প্রথমতঃ ঐ মর্ম্মে একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হউক। সকল শিক্ষিত লোক বাজে লোকের হাতে পায় ধরিয়া উহাদিগকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করুন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায

* এই প্রস্তাব বস্তুত কার্তিকের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। — সংকলন-সম্পাদক

প্রশ্নোত্তর*

১। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র লাহিড়ী

গবর্ণমেন্ট যে পরোয়ানা জারি করিতেছেন, তাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইতঃপর গবর্ণমেন্ট যদি এই পরোয়ানা বাহির করেন যে, প্রজাবর্গ ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় পরিবে এবং লিভারপুল লবণ খাইবে; না খাইলে, প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তা বিশেষ কনষ্টবল হইয়া তাহার মাতা স্ত্রী কন্যা পুত্রদিগকে পুলিশে ধরিয়া দিবে, তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই হইবে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে তাহার সীমা কোথায়, নির্দ্দেশ করা যায় না। ইংরেজজাতির উপর আমাদের নির্ভর করা বৃথা। তাঁহারা আমাদের কোনই খবর রাখেন না। আমরা নামে মাত্র বৃটিশজাতির অধীন। যেমন আমেরিকায় দাস ব্যবসায়ীরা এবং দাসক্রেতারা কাফ্রিদিগের উপর রাজত্ব করিতেন, যেমন কিছুদিন পূর্ব্বে নীলকর সাহেবগণ আমাদের উপর রাজত্ব করিতেন, এখনও চা-বাগানে যে রাজত্ব চলিতেছে, তাহা অপেক্ষা কোনরূপেই উত্তম রাজত্ব ইতঃপর আমরা আশা করিতে পারি না। কোম্পানীর রাজত্ব লোপ হইয়াছে, কিন্তু আমরা ইংরেজরাজের শাসনাধীনও নহি। বলিতে গেলে ইন্ডিয়া অফিস প্রমুখ কতিপয় ইংরেজ কর্ম্মচারীর শাসনাধীনে আমরা বাস করি। ইহাদের অধীনে কখনই উচ্চতর রাজকার্য্যে প্রবেশ করিবার আশা করিতে পারি না। স্বায়ত্ত-শাসন সুদূর-পরাহত। যেমন কোন হৌসের কর্ত্তা আপন আত্মীয়বন্ধু দ্বারা হৌস পূর্ণ করেন, তেমনি এই ইংরেজ কর্ম্মচারীর দল আপন আপন আত্মীয় স্বজন দ্বারা ভারতবর্ষের প্রজার মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত। সুতরাং ইংরাজজাতির প্রতি নির্ভর করা, আর আকাশে ঘর বাঁধিয়া বাস করা একই কথা। আত্ম-নির্ভরতা চাই। তাহার প্রথমসূত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং আত্মসম্মান রক্ষা করা। গবর্ণমেন্ট যে পরোয়ানা জারি করিয়াছেন, তাহা উভয় প্রকারেই সর্ব্বনাশজনক।

কিন্তু "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী" শত অপমান সহ্য করিবে, তত্রাপি সম্মুখের সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে রাজি নয়। হাকিম ভাবেন, তাঁর ছেলেরা

---

* কার্ত্তিকমাসে যে দুইটী প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, এই উত্তরগুলি তাহারই। ভাঃ প্রঃ
[ভান্ডার-প্রকাশক]

হাকিমই হইবে। উকিল ভাবেন, তাঁহার ছেলেরা উকিলই হইবে ইত্যাদি। এই সকল ছেলের ভবিষ্যৎ প্রস্পেক্ট কি নষ্ট করা যায়? সুতরাং বিলাতি জুতা পর না পর, তাহা মস্তকে বহন করিয়া দেশের যথাসর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া আমার ছেলেটীকে আমি 'গোলাম' প্রস্তুত করিবই, এই আমি ছেলের পিতা স্থির করিয়াছি, "তাহাতে যায় তোমার দেশ, যায় তোমার স্বদেশী, সব অতল জলে ডুবিয়া যাউক। আমার ছেলে এবং আমি এবং আমার ছেলে যে স্কুলে পড়িবে সে স্কুলের শিক্ষক এই নীতির উপাসক। আর যদি আপনার এত মাথার ব্যথা হইয়া থাকে, আপনি ঘর হইতে যত টাকা লাগে দিয়া একটা Polytechnic খুলুন, তখন বিবেচনা করিব, গবর্ণমেন্টের পরোয়ানা মানিব কিনা?"

২। শ্রীযুক্ত বরদাচন্দ্র তালুকদার

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

১। গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে কার্য্য না করিয়া ছাত্রদিগকে সভাসমিতিতে পূর্ব্ববৎ যোগ দিতে নিষেধ করা উচিত নহে এবং তাহাতে গবর্ণমেন্ট কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

২। বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে যে প্রকার দেশব্যাপী আন্দোলন করা হইয়াছিল, ছাত্রদের সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান অন্যায় আদেশ রহিত করিবার জন্যও স্কুলের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্র ও অভিভাবকগণের প্রথমত সেইরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন ও প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য বোধ করি। ইহাতে ঐ অন্যায় ও অবৈধ আদেশ রহিত হইলেও হইতে পারে।

৩। গবর্ণমেন্টের সংস্রবরহিত স্বাধীন ভাবের বিশ্ববিদ্যালয় খোলা আবশ্যক বলিয়া কেহ কেহ মত দেন। ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না সত্য, কিন্তু ঐ সকল ছাত্রদিকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া বর্ত্তমান সময়ের সংস্কৃত অধ্যাপকদিগের ন্যায় কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং তাহারা ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা সন্দেহজনক।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

১। জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহা একটি জাতীয় মূলধন হইবে এবং উপযুক্ত ট্রষ্টীর হস্তে তাহা ন্যস্ত থাকিবে।

২। এইক্ষণ নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত দ্রব্য (যথা পেন্সিল কলম, দেশলাই, কাচের ও হাড়ের জিনিস ইত্যাদি) এই দেশে প্রস্তুত হয় না ও লোকে বাধ্য হইয়া বিদেশী দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার করিয়া থাকে, ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত ও প্রচলনজন্য কতক টাকার দ্বারা কল কারখানা স্থাপন করা আবশ্যক।

৩। দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির নিমিত্ত স্থানে স্থানে কতক টাকার নানা প্রকার দেশীয় শিল্প শিক্ষার জন্য শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দেশীয় শিল্পীদিগকে যন্ত্রাদি খরিদ জন্য কম সুদে অথবা আবশ্যক মত বিনা সুদে কর্জ্জ দিবার জন্য কতক টাকা রাখা আবশ্যক।

৩। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত

ছাত্রদিগকে গবর্ণমেন্ট যেরূপ শাসন করিতে ইচ্ছা করেন, এবং শৈশব হইতেই তাহাদের পায়ে যেরূপ দাসত্বের শৃঙ্খল অভ্যাস করাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমার মতে অতিশয় অন্যায়। আমি ছাত্রের অভিভাবক, ছাত্রগণের রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি না। আমার অভিপ্রায় যে, এক্ষণে যেমন তাঁহারা রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দিতেছেন, ভবিষ্যতেও তেমনি দিবেন। ইংলন্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া কোথাও ছাত্রগণ রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন নহে। তবে আমরা কেন ছাত্রগণকে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিতে দিব না?

এজন্য যদি শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ নিপীড়িত হয়েন, তবে আমার মতে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করাই বিধেয়। আমি ইতিপূর্ব্বে সঞ্জীবনী-স্তম্ভে ভাষার বিচ্ছেদসম্বন্ধে এক প্রবন্ধে তাহাই আপনাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কি সে সময় হয় নাই? বহুদর্শী ও বিচক্ষণ জাতীয় নেতাগণ এ বিষয়ে বিবেচনা করুন।

শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ যদি এজন্য নিপীড়িত হয়েন, তথাপি বালকগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, বরং তাঁহারা কার্য্য ত্যাগ করুন। স্বতন্ত্র স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন দেশের উদ্ধার নাই।

২। জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্দ্ধাংশ দেশের শিল্পোন্নতি কল কারখানায় ও অর্দ্ধাংশ এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত হউক।

৪। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয়

১। মফস্বলের স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি গবর্ণমেন্ট যে পরোয়ানা জারী করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কলিকাতার ও মফস্বলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদসূচক আবেদনপত্র বড় ও ছোটলাট সাহেবের নিকট দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে কোন ফল না হইলে ঐ আবেদনপত্র পার্লামেন্টে পাঠান হয় এবং কেম্‌ব্রিজ অক্সফোর্ড কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের ও পার্লামেন্টের মেম্বরগণের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ লালমোহন ঘোষ, মিঃ এ চৌধুরী মহোদয়দের মধ্যে ২/৩ জনকে বিলাত পাঠাইলে ভাল হয়। ঐ বিষয় বিলাতে আন্দোলন করার জন্য সার কটন সাহেবকে, মিঃ গোখেলকে, ও মিঃ ডব্লিউ, সি ব্যানার্জ্জিকে পত্র লেখা হয়। এই সকল উদ্যোগ যদি সমস্তই নিস্ফল হয়, তবে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। অধিকাংশ স্কুল কলেজ আমাদের স্বদেশীয় ধনী ব্যক্তিদের অর্থদ্বারা চালিত হয়। গবর্ণমেন্ট কেবল ঐ অর্থের ট্রাষ্টি মাত্র আছেন। ঐ টাকা গবর্ণমেন্টের হস্ত হইতে উক্ত অর্থদাতৃগণ কিম্বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণ ফেরত চাহিতে পারেন কিনা— আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের মত সাপেক্ষ। ঐ সকল অর্থ গবর্ণমেন্টের হস্তে ন্যস্ত করিবার সময়ে যে সর্ত্ত হইয়াছে, তাহা এই পরোয়ানা দ্বারা উল্লঙ্ঘন হইতেছে কি না দেখিতে হইবে।

২ ক। জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহা দ্বারা স্থানে স্থানে শিল্প ও কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা ও ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিকে সময় সময় পল্লিগ্রামে পাঠাইয়া শ্রমজীবী ও কৃষকগণকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

২ খ। সদর মফস্বলে কোন ব্যক্তি কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুতের কোন কুঠি বা কারখানা করার জন্য ভাল ভূমিসম্পত্তি রেহান বা অন্য প্রকার ভাল জামীন দিয়া টাকা কর্জ্জ লইলে অতি অল্প সুদে জাতীয় ভাণ্ডার হইতে কর্জ্জ দেওয়া উচিত।

২ গ। কোন ভূম্যধিকারী তাঁহার এলাকার মধ্যে প্রজাদের দ্বারা তুলার ও ইক্ষুর

আবাদ এবং সূতা ও চিনি প্রস্তুতের কারখানা করার জন্য ভাল জামিন দিয়া টাকা কর্জ্জ চাহিলে অল্পসূদে জাতীয় ভাণ্ডার হইতে টাকা কর্জ্জ দেওয়া উচিত।

২ ঘ। শিল্প ও কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য কেহ কোন কল আবিষ্কার বা নূতন উপার উদ্ভাবন করিলে এই জাতীয় ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবে।

২ ঙ। স্বদেশীয় কার্য্যের আন্দোলনের জন্য কোন ব্যক্তিকে বিলাত পাঠাইতে হইলে তাহার ব্যয় জাতীয় ভাণ্ডার হইতে দেওয়া উচিত।

৫। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস

১। আমার মতে কচি ছেলেদের এই সব বিষয়ে যোগ দেওয়া উচিত নয়। কলেজের ছেলেদের এই পরোয়ানার দ্বারা বাধ্য হওয়া উচিত নয়। কলেজের ছেলেরা যোগ দিবে, তাহাতে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের কোন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইলে তাঁহারা তাহা ভোগ করিবেন। আমাদের একটি জাতীয় ইউনিভারসিটি হইলে অনেক লাঞ্ছনা হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি।

২। যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে সংগৃহীত অর্থ ঐ সভার [?] হস্তে দেওয়া আবশ্যক। আমাদের প্রচুর অর্থের আবশ্যক হইবে। কল কারখানা ইত্যাদিতে এই অর্থ ব্যয় করা উচিত নহে।

কোম্পানী করিয়া কল কারখানা ইত্যাদি আবশ্যক মতে করিবেন।

৬। হুগলী চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মত

অদ্য ২০শে কার্ত্তিক সোমবার বেলা ৮টার সময় হুগলী, চুঁচুড়া ও চন্দন নগরের গণ্যমান্য অন্যূন ছয়শত ভদ্রলোক, ছাত্র নিগ্রহের জন্য গবর্ণমেন্ট যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য এবং জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ কি সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় স্থিরীকৃত হয় যে;—

১। এ পর্য্যন্ত বালকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয় নাই এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাহারা তাহার কোন অপব্যবহার করে নাই বা অভদ্র ব্যবহার করে নাই।

২। বালকেরা স্বদেশী আন্দোলনে যেরূপে যোগদান করিয়াছেন, এই সভা তাহার অনুমোদন করেন।

৩। জাতীয় ধনভাণ্ডারের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে বা হইবে, তৎসম্বন্ধে এ সভার মত এই যে, ধনভাণ্ডারের কতক অংশ শিল্পাদির উন্নতির জন্য ও কতক অংশ বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত।

৭। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক

প্রথম প্রশ্নসম্বন্ধে আমার মত— গবর্ণমেন্ট স্কুল ও কলেজ হইতে আমাদের ছাত্রগণকে বিচ্ছিন্ন করাইয়া তাহাদিগকে বেসরকারী স্কুলে পড়ান আবশ্যক। উপস্থিত সময়ে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলে পড়ান আবশ্যক। উপস্থিত সময়ে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবেক, নচেৎ শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাচারিতা লাঘব হইবেক না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক জাতীর উন্নতির বিশেষ অন্তরায় ও কোন কার্য্যকর নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দেশে অর্থের অনাটন হইবে না; যাহা কিছু অভাব— সুদক্ষ স্বাধীনচেতা পরিচালকের।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর— জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ নূতন ছাঁচে গঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

৮। শ্রীযুক্ত বেণীভূষণ রায়

১। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য সমস্ত বঙ্গদেশে যে প্রকার আন্দোলন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সর্ব্বথা শ্রেয় হইতেছে। সে ক্ষেত্রে মফস্বল স্কুল কলেজ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান পরোয়ানা বিশেষ হানিজনক। এ অবস্থায় উক্ত পরোয়ানা রদ করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গজাতির সমবেত চেষ্টা করা উচিত। উক্ত

চেষ্টা বিফল হইলে শিক্ষাবিভাগ গবর্ণমেন্টের হস্ত হইতে যাহাতে স্বাধীনভাবে চালিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

২। জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহার কতকাংশ উপরোক্ত কার্য্য চালাইবার জন্য ব্যয় হইবে ও অপর অংশ স্বদেশী শিল্পজাত বস্ত্র ও সূতার উন্নতিকল্পে ব্যয় হওয়া উচিত।

৯। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন

(দিনাজপুর সভার কার্য্যনির্ব্বাহিকসভার মত)

(১) দেশের এই দুর্দ্দিনে আমাদের বাঙালী জাতির একটি জাতীয় সমিতি সংগঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মহাশয়দিগের ন্যায় অনেক দেশহিতৈষী মহাত্মা দেশের ও জাতির উন্নতি সাধনকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কোন একটি জাতীয় সমিতি সংগঠিত হয় নাই। সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাচন প্রণালী অনুসারে একটি সমিতি সংগঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(২) উক্ত জাতীয় সমিতির একটি ধনভাণ্ডার থাকা আবশ্যক হইবে। বাঙালী মাত্রেরই প্রত্যেকের প্রতি বৎসর এক দিনের আয় জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে উক্ত ধনভাণ্ডারে দান করা উচিত। বাঙালীগণের মধ্যে এই অল্প সময়েই যেরূপ একটি অতুলনীয় জাতীয় ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন বাঙালীই একদিনের আয় জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে দান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সম্প্রতি যে টাকা জাতীয় ধনভাণ্ডারের নিমিত্ত সংগৃহীত হইতেছে, তাহাই উক্ত ধনভাণ্ডারের ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হইতে পারে।

(৩) আম্যাদের দেশে দেশহিতৈষণার নিমিত্ত নানা স্থানে যে সকল সভা সমিতি আছে, তৎসমুদয় প্রস্তাবিত জাতীয় সমিতির অধীন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৪) উক্ত জাতীয় সমিতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকা উচিত; যথা— শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ইত্যাদি।

(৫) যাঁহারা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত উল্লিখিত যে কোন বিভাগের উন্নতিসাধনকল্পে ঐ চাঁদা দিতে সক্ষম হইবেন, এইরূপ নিয়ম ধার্য্য হইলে সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি জাতীয় সমিতির কোন বিভাগবিশেষের কার্য্যে

যোগদান করিতে ইচ্ছা না করিলেও তাঁহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে অন্য বিভাগের সাহায্যার্থ যথাসাধ্য দান করিতে সুযোগ পাইবেন।

(৬) দেশের লোক নানা রূপ ট্যাক্স ও চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করিতে করিতে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন কারণে স্বতন্ত্ররূপে চাঁদা সংগ্রহ করা সুকঠিন এবং জনসাধারণও নানা কারণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে। তজ্জন্যই মনে হয় যে, জন সাধারণের নিকট হইতে প্রতিবৎসর সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের নিমিত্ত ও জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে একবারে মোটের উপর প্রতি বৎসর একদিনের আয় সংগ্রহ করা ততদূর কঠিন হইবে না।

(৭) জাতীয় সমিতিতে উল্লিখিতরূপ বিভাগ সকল সংস্থাপিত হইলে প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নির্ব্বাচন প্রণালীতে পৃথক পৃথক কার্য্যনির্ব্বাহিকসমিতির সংগঠন প্রয়োজনীয় হইবে।

(৮) গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় যে ফেডারেশন হলের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই হলই জাতীয় সমিতির প্রধান কার্য্যালয় হইতে পারে।

(৯) সর্ব্বাগ্রে স্বদেশ-জাত দ্রব্যের অভাবমোচনকল্পে নানাবিধ আবশ্যকীয় আদর্শ কল কারখানা ইত্যাদি সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাবে জাতীয় সমিতির সমগ্র সমবেত চেষ্টা যত্ন প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়; এবং ঐ সকল কল কারখানা সংস্থাপিত হইলে তাহার যে আয় হইবে, তাহা জাতীয় ধনভাণ্ডারে যাইবে। এইরূপে উক্ত ভাণ্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে। জাতীয় সমিতি এইরূপ কল কারখানা সংস্থাপন করিলে দেশের অনেক লোকে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে জাতীয় কল কারখানার অনুকরণে নিজ ব্যয়ে কল কারখানা সংস্থাপন করিয়া দেশের ও নিজের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

(১০) উপরে প্রস্তাবিত জাতীয় সমিতির যে সকল বিভাগের কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে জাতীয় উন্নতিসম্বন্ধেও একটি সাধারণ বিভাগ থাকা প্রয়োজনীয় হইবে। চাঁদা দাতাগণের মধ্যে যদি কোন কার্য্যবিশেষ সম্বন্ধে আপত্তি থাকে, তবে ঐ সাধারণ বিভাগ হইতে ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এবং আপত্তিকারী চাঁদাদাতা যে বিভাগে চাঁদা দিবেন, তাঁহার চাঁদা কেবল সেই বিভাগের কার্য্যেই ব্যয়িত হওয়া সম্বন্ধেও একটি নিয়ম থাকা উচিত বলিয়া বোধ হয়।

১০। শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত

[সংক্ষেপিত]

আমার মত এই যে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সার্কুলার রদ করার জন্য গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করুন। ঐ সার্কুলার উপলক্ষ করিয়া রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১লা নভেম্বর তারিখে একতাবন্ধন সম্বন্ধে রঙ্গপুরে যে সভা হয়, তাহাতে যে সকল ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল ও সভার পর স্বদেশী সঙ্গীত গান করিয়া "বন্দেমাতরং" ধ্বনি করিয়া রাস্তা দিয়া গিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের ৫্ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের সার্কুলার কি তাহা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টে আদেশ করুন। সার্কুলার যেরূপ ভাবে সংবাদ পত্রাদিতে বাহির হইয়াছিল, তাহাতে সভায় যাওয়া ও জাতীয় সঙ্গীত গান করা বা "বন্দেমাতরং" ধ্বনি করা ছাত্রগণের পক্ষে নিষেধ লিখিত হওয়াও দেখা যায় না, অথচ উহার জন্য ছাত্রগণের জরিমানা হইতেছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, গোপনে ঐ সার্কুলারে অনেক কথা আছে। প্রকৃত পক্ষে গবর্ণমেন্ট হইতে ঐ সার্কুলার যাহাতে প্রচার হয়, তাহা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের করা প্রথম কর্ত্তব্য। পরে সঙ্গত রূপে উহা বা উহার অংশ রদ করাইবার চেষ্টা করা উচিত।

অধ্যাপকগণ— যাঁহারা মফঃস্বল গবর্ণমেন্ট স্কুল বা কলেজের অধ্যাপক, তাঁহারা ঐ সার্কুলার বা তাহার যে অংশ সভ্য জগতে অনুমোদিত নহে, ঐ সম্বন্ধে কার্য্য করিতে বাধ্য হইলে এক সময়ে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিলে ঠিক হয়; কিন্তু আশা করা যায় না। গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীর মধ্যে' অনেক বাঙ্গালী এই উপলক্ষে গবর্ণমেন্টের খয়ের খাঁ হওয়ার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে কোন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারিলে ভাল হয়; কিন্তু তাহা কি উপায়ে হইতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ বিষয়ে মহাশয়গণ পরামর্শপূর্ব্বক কি করা যাইতে পারে, স্থির করিবেন।

গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ও বিনাসাহায্যকৃত বেসরকারী স্কুলের বা কলেজের অধ্যাপকগণের উচিত যে, তাঁহারা ঐ সার্কুলার মতে যতদূর কাজ না করিতে পারেন, তাহাই করিবেন। রুষিয়ার সৈন্যগণের ন্যায় শূন্যে গোলাবর্ষণ করিলে ছাত্রগণের উচিত যে, তাহাদের সার্কুলারের মধ্যে যে সকল কার্য্য আইনমতে দোষার্হ তাহা না করিয়া সভা ইত্যাদিতে যোগ দান পরিত্যাগ করিবে না, প্রয়োজন মতে স্বদেশী সঙ্গীত গাইবে ও বন্দেমাতরং ধ্বনি করিবে।

[......]

দেশের চাষা প্রভৃতি সকল লোকের জন্যে [মধ্যে] যাহাতে সেই [স্বদেশী] ভাব উদয় হয় ও তাহারা যাহাতে সেই ভাবে প্রণোদিত হয়, তাহারা বেশী দরে বিলাতী জিনিষের পরিবর্ত্তে দেশী জিনিষ ক্রয় করে, তাহাই করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এজন্য জাতীয় ভাণ্ডারের টাকা ব্যয় হওয়া উচিত। লোকের দৃঢ় সংকল্প থাকিলে সকল সিদ্ধ হইবে, নতুবা বিলাতী জিনিষ সস্তায় পাইলে লোকে তাহা কিনিতে ছাড়িবে না। হয়ত ইংরেজ বণিক্‌গণও মফস্বলে মফস্বলে তাহাদের জিনিষ প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরণ করিবে।

দেশের সর্ব্বত্র সূতা ও লুম দেশীয় ভাণ্ডার হইতে ক্রয় করিয়া দেওযা হউক, ইহা অতি সত্বর করা প্রয়োজন। তাহাতে লোকেও বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা তাহাদের নিজের কাপড় নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। এই জন্য দেশীয় ভাণ্ডাবের টাকা হইতে শিক্ষক সহ লুম ও সূতা সর্ব্বত্র অতি সত্বর প্রেরণ করা হউক।

দেশে কল হইলে ও উহার স্থাপন হইলে বিলাতী কাপড় উঠিয়া যাইবে। তাহাতে কম দামে অর্থাৎ বিলাতী কাপড়ের দামে দেশী কাপড় বিক্রয় কবিলে যে ক্ষতি হইবে, তাহা দেশীয় ভাণ্ডার হইতে দিতে হইবে। সম্ভবতঃ বিলাতী বণিক্‌গণ নিজেরাই এদেশে কাপড় আনিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা সত্বর করিবে। তাহা যাহাতে কার্য্যকর না হয়, তাহার চেষ্টাও এখন হইতেই দেশের লোকের করা উচিত। দেশী কলে বিলাতী চাদরের মত চাদর হয় না। মহরম আসিতেছে, মুসলমানগণ বলিতেছে তাহাদের ঐরূপ ধোলাই চাদরের প্রয়োজন হইবে। দেশী না হইলে তাহারা বিলাতী কিনিবে। শ্রীরামপুরের মিলে অর্ডার দিয়া ঐরূপ চাদর প্রস্তুত ও চাদর বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

যাহাতে অন্ততঃ ৬ মাস কাল ম্যানচেষ্টার ও লিভারপুল বন্ধ থাকে, তাহা জাতীয় ভাণ্ডার হইতে করা প্রথম কর্ত্তব্য। স্বদেশী আন্দোলনের যে খরস্রোত উঠিয়াছে, তাহার বেগ যাহাতে না থামে, তজ্জন্য এই সকল করা বিশেষ প্রয়োজন। এসকল থামিয়া গেলে আবার এ স্রোত আসিবে না। এই সকল কার্য্য করিয়া জাতীয় ভাণ্ডারের টাকা উদ্বৃত্ত হইলে তাহা দ্বারা কল কারখানা স্থাপন করিতে হইবে।

১১। শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন

গবর্ণমেন্ট স্কুল সম্বন্ধে যে সার্‌কুলার প্রচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কি করিতে হইবে, চিন্তা করিয়া ঠিক করা সুকঠিন। Fraser সাহেবের সার্‌কুলার চট্টগ্রামে জারি করা হইতেছে না, অত্যন্ত গোপনভাবে রাখা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এমনভাবে কার্য্য করা উচিত হইবে না, যাহাতে ইউনিভারসিটি উঠিয়া যায়। সত্য যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবে, তাহাতে সাধারণ লোক তাহাদের ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারিবে না। আমি বোধ করি, নেশনেল ইউনিভারসিটি হওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইউনিভারসিটিও থাকা উচিত। কারণ তাহা আমাদের টাকা দ্বারা পোষিত হইতেছে। উচ্চ শিক্ষা যাঁহারা দিতে সমর্থ, তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদের শিক্ষা তথায় দিতে পারেন। যদি কেম্‌ব্রিজ, অক্সফোর্ড, এডিনবরা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠান যাইতে পারে, তবে রাঁচিতে (Ranchi) পাঠাইতে আপত্তি কি? এই্ বিষয় এত গুরুতর ঠিক মত স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন। আমি বোধ করি, বুদ্ধিমান অগ্রণীগণ মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে ভাল হয়।

১২। শ্রীযুক্ত বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

আপনার প্রেরিত প্রশ্ন ২টী সম্বন্ধে অত্রস্থ* সকল লোকের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য গতকাল একটি সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। অধিকাংশ সভ্যের মত হইল যে, ছাত্রগণ পূর্ব্বমত স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিবে এবং সারকুলার মান্য করা হইবেক না। অবশিষ্ট সভ্যের মত হইল যে, সারকুলার রহিত করিবার জন্য প্রতিবাদ করা হইবেক, কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ছাত্রগণের সারকুলার মানিয়া চলাই্ কর্ত্তব্য এবং সম্প্রতি ছাত্রগণের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করা কর্ত্তব্য নহে।

* কুত্র? — সংকলন-সম্পাদক

১৩। শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র রায়

যে দুইটী প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন, তাহার প্রথমটির উত্তর স্থির করা আমার বিবেচনায় সুকঠিন। গবর্ণমেন্টের সারকুলার অসঙ্গত হইলেও তাঁহারা যখন উঠাইয়া লইবেন না, তখন তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আবেদন করায়ও কোন ফল দৃষ্ট হয় না। আমাদের কোন নিজের বিশ্ববিদ্যালয় নাই, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার বা উপাধি পাইবার উপান্তর [উপায়ান্তর] নাই, গবর্ণমেন্টের স্বরলিপিপ্রার্থী, সাহায্যেরও প্রত্যাশী আমরা কিরূপে স্পর্দ্ধা করিব? যদি আমরা গবর্ণমেন্ট সাহায্য ব্যতীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট সারকুলারে চকিত বা ভীত হইতে হইত না। যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা গবর্ণমেন্ট করিয়াছেন, তাহাতে সারকুলার যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, তদ্রূপ আচরণ করাই আমার মতে শ্রেয়ঃ। ছাত্রদের স্বদেশী ব্যাপার অধিকতর কষ্ট মিশ্রিত না হইলে এবং স্কুল কলেজের সংস্রবরহিত ব্যক্তিগণ ছাত্রগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলে সারকুলার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না। ছাত্রগণের নিকট যাহা আমরা আশা করিয়াছিলাম, পূর্ণ হইয়াছে। তাহারা স্বদেশী জিনিষ পত্র ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প ও বিদেশী জিনিষ ব্যবহারে বিরত হইয়াছে, এই মহান লাভ। প্রকাশ্যভাবে তাহারা সম্প্রতি আর কিছু না করিলেও জাতীয় অভ্যুত্থানের ব্যাঘাত হইবে না, শীঘ্র বা বিলম্ব হউক ফলোৎপত্তি অবশ্যই হইবে। স্কুলের ও কলেজের ছাত্রগণকে আপাততঃ মিলিতে না দিয়া গবর্ণমেন্টের সারকুলার ব্যর্থ করাই বিহিত।

ভাণ্ডার ।। মাঘ ১৩১২

রাজভক্তি*

রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল— তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারো রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল— সে জন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন— এবং আমার কথাটি ফুরালো, নটে শাকটি মুড়ালো।

ব্যাপারখানা কি? একটা কাহিনীমাত্র। রাজ্য ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদুর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা— দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু ব্যয়ে— বহু নৈপুণ্য ও সমারোহ সহকারে সমাধা হইল।

অবশ্যই রাজপুরুষেরা ইহার মধ্যে কিছু একটা পলিসি, কিছু একটা প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন— নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন?

রূপকথার রাজপুত্র কোনো সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়াছিলেন। আমাদের রাজপুত্রও বোধকরি সুপ্ত রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল?

নানা ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুরুষেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির পরেই বেশি আস্থা রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতাপের আড়ম্বরটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ঝলকিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে, কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না— পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।

ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এখানকার রাজাসনে যাঁহারা বসেন, তাঁহাদের মেয়াদ বেশিদিনকার নহে, অথচ এখানে রাজক্ষমতা যেরূপ অত্যুৎকট, স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নহে। বস্তুত ইংলণ্ডে রাজত্ব

---

* *ভাণ্ডার*-এ প্রকাশের পর পৃথক পুস্তিকারূপেও দেখা দিয়েছিল *রাজভক্তি*; তারপর অনেক কাটছাঁট করে *রাজা প্রজা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। — **সংকলন-সম্পাদক**

করিবার সুযোগ কাহারও নাই; কারণ, সেখানে প্রজাগণ স্বাধীন। ভারতবর্ষ যে অধীন রাজ্য, তাহা ইংরেজ এখানে পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং এদেশে কর্ত্তৃত্বের দম্ভ ক্ষমতার মত্ততা সহসা সম্বরণ করা ক্ষুদ্রপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ রাজার পক্ষে এই নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাহারা কর্ত্তৃত্ব করিতে আসেন, তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এদেশের পরিবর্ত্তন অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা কোনো কালেই বিশেষ কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা এক মুহূর্ত্তেই হর্ত্তাকর্ত্তা। এমন অবস্থায় নেশার ঝোঁকে এই নূতন লব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।

প্রেমের পথ নম্রতার পথ। সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নিজের মাথাটাকে তাহার দ্বারের মাপে নত করিতে হয়। নিজের প্রতাপ ও প্রেষ্টিজ্ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি হঠাৎ নবাবের মত সর্ব্বদাই আপাদমস্তক সচেতন, সে ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য। ইংরেজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনাগোনার রাজত্ব না হইত, যদি এদেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কর্ত্তৃত্বের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জন্য এদেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে, আমরা কর্ত্তা এবং সেই ক্ষুদ্র দম্ভটাকেই সর্ব্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে; আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিকে স্পর্শ করিতে পারে, একথা তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন কি, তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব, তাহাও তাহারা স্পর্দ্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক্ না কেন সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাঙক্ষা থাকে। অথচ হৃদয় অধিকার করিবার ঠিক পথটিও সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দুর্ণম্য ঔদ্ধত্যে বাধা দেয়। যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে স্ত্রী তাহার আধিপত্য সহ্য করে, কিন্তু তাহাকে ভাল বাসে না, তবে সে তাহার কঠোরতার মাত্রা বাড়াইতেই থাকে। প্রীতি জন্মাইবার ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সেইরূপ ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজারা আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবীটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ— সে সম্বন্ধে দান প্রতিদান আছে— তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবরদস্তির কর্ম্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না— অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তি সম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে, তখন গুর্খা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরেজ, শাসনের কল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ এক একবার রাজভক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, কার্জ্জনের আমলে তাহার একটা নমুনা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড্ কার্জ্জন্ কর্ত্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা "খোঁয়ারী"-গ্রস্ত মাতালের মত আজ যে অবস্থায় আছে, তাহা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিতাম, তবে বাঙালিও বোধহয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত। এরূপ আধিপত্যলোলুপতা বোধকরি ভারতবর্ষের আর কোনো শাসনকর্ত্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাট সাহেবটি ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন বাদসাহেদের ন্যায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন—এবং স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যরাজামাত্রেই বুঝিতেন দরবার স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্য নহে; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দ-সম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্য্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজ-শাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।

কিন্তু পশ্চিমের হঠাৎ নবাব দিল্লির প্রাচ্য ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়াও বদান্যতাকে সওদাগরী কার্পণ্যদ্বারা খর্ব্ব করিয়া কেবল প্রতাপকেই উগ্রতর করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বস্তুত ইংরাজের রাজশ্রী আমাদের কাছে গৌরব লাভ করে নাই। ইহাতে দরবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেছে। এই দরবারের দুঃসহ দর্পে প্রাচ্যহৃদয় পীড়িত হইয়াছে, লেশমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রচুর অপব্যয় যদি কিছুমাত্র ফল রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অপমানের স্মৃতিতে। লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা নহে— তাহাতে উল্টা ফল হইয়া থাকে।

এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত। সেই জন্য দিল্লির দরবারে ড্যুক্ অফ্ কন্‌ট থাকিতে কর্জ্জনের দরবার-তক্তগ্রহণ ভারতবর্ষীয় মাত্রকেই বাজিয়াছিল, এরূপ স্থলে ড্যুকের উপস্থিত থাকাই উচিত ছিল না। বস্তুত প্রজাগণের ধারণা হইয়াছিল যে কার্জ্জন্ নিজের দম্ভপ্রচার করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্ব্বক দরবারে ড্যুক্ অফ্ কনটের উপস্থিতি ঘটাইয়া ছিলেন। আমরা বিলিতি কায়দা বুঝি না— বিশেষত দরবার ব্যাপারটাই যখন বিশেষভাবে প্রাচ্য, তখন এ উপলক্ষ্যে রাজবংশের প্রকাশ্য অবমাননা অন্তত পলিসিসঙ্গত হয় নাই।

যাই হোক ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য একবার রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত; বোধকরি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থ'কিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ, হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এদেশকে হৃদয় দেয়ও নাই এদেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না। ইহারা রাজপুত্রের ভারতবর্ষে আগমন ব্যাপারটাকে যত স্বল্পফলপ্রদ করা সম্ভব তাহা করিল। আজ রাজপুত্র ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়া জাহাজে উঠিতেছেন আর আমাদের মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, যেন একটা রূপকথা শেষ হইল। কিছুই হইল না— মনে রাখিবার কিছুই রহিল না, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনি রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত একথা সত্য। হিন্দু ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্ম্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ একথার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।

সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই হিন্দু দৈবসম্বন্ধ না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। হিন্দুর কাছে প্রায় কিছুই আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। কারণ, হিন্দু জানে, আমাদের কাছে প্রকাশ যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন হউক না মূলশক্তি একই। ভারতবর্ষে ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, ইহা ধর্ম্ম— ইহা পুঁথিতে লিখিবার কালেজে পড়াইবার নহে— ইহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উপলব্ধি ও জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে প্রতিফলিত করিবার। আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী

স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্ম্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ যে কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গললাভ করি, সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি, তখন এ মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্য দুর্ব্বলতা তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, ইঁহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতেছেন, সেই পিতৃমাতৃত্ব জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ. শক্তিপ্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান্ পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনো দিন তৃপ্ত হয় নাই। এই জন্য বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্ব্বত্রই দেব-শক্তিতে সজীব।

একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজ্য করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না— ইহা নহে মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্ব্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গললাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে, এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে সে আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারীকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে;— ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে যন্ত্র একটা উপলক্ষ্য মাত্র— যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে, তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে, কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য তাহার কৃতজ্ঞতা, তাহার পূজা যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।

এই ভারতবর্ষ রাজ্যশাসন ব্যাপারকে যদি পুরুষরূপে নহে, কেবল যন্ত্ররূপে অনুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়াকর আর কিছুই হইতে পারে না। জড়ের মধ্যেও আত্মার সম্পর্ক অনুভব করিয়া তবে যাহার তৃপ্তি হয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের মত এত

বড় মানব-ব্যাপারের মধ্যে সে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে মূর্ত্তিমান না দেখিয়া বাঁচিবে কিরূপে? আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই নত হওয়া যায়— যেখানে তাহা নাই সেখানে নত হইতে অহরহ বাধ্য হইলে অপমান ও পীড়া বোধ হয়; অতএব রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তি ও মঙ্গলের প্রত্যক্ষ স্বরূপকে রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি। নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই— রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অনুভব করিতে চাই— আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।

অতএব ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত একথা সত্য। কিন্তু সেই জন্য রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাসার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্গরূপে দেখিতে ভালবাসে না। সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে। সে রাজাকে বহুকাল ধরিয়া পাইতেছে না বলিয়া উত্তরোত্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বহুরাজার দুঃসহভারে এই বৃহৎ দেশ কিরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন কিরূপ নিরুপায়ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া কেহ দেখিবার নাই। যাহারা পথিক মাত্র— ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে— যাহারা পেটের দায়ে নির্ব্বাসনে দিন যাপন করিতেছে— যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে— যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোনো সম্বন্ধই নাই— অহরহ পরিবর্ত্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়-সম্পর্কশূন্য আপিসিশাসন নিরন্তর বহন করা যে কি দুর্ব্বিষহ তাহা ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে— হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান্ আমি এইসকল ক্ষুদ্ররাজা, ক্ষণিক রাজা, অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও! যিনি বলিতে পারিবেন— ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য; বণিকের নয়,খনিকের নয়, চাকরের নয়, ল্যাঙ্কাশিয়রের নয়;— ভারতবর্ষ যাঁহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে— আমারই রাজা; হ্যালিডে-রাজা নয়, জ্যাক্-রাজা নয়, ফুলর-রাজা নয়, পেড্‌লর-রাজা নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য ও ইংলন্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতবর্ষের মঙ্গল এবং ইংলন্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক রাখিব না

এ স্পর্দ্ধা ধর্ম্মরাজ কখনই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না— ইহা স্বাভাবিক নহে— ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য সুশাসনই বল, শান্তিই বল, কিছুর দ্বারাই এই দারুণ হৃদয়-দুর্ভিক্ষ পূরণ হইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিশ-সর্প ফণা তুলিতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্ম্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে, তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল— আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে, আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না। অন্তত এই কয়দিনের জন্যও যদি ভারতবর্ষকে 'সত্যকার' রাজপুত্রের স্বাদ দেওয়া হইত, তবে সুদীর্ঘকাল পরে ভারতের হৃদয়ে আনন্দের ক্ষনিক্ বসন্ত পুলকিত হইত— বঞ্চিত মানব-হৃদয় মানব-হৃদয়ের প্রাণস্পর্শ লাভ করিত।

যে কয়দিন রাজপুত্র ভারতবর্ষে ছিলেন, সেই কয়দিনের মত কলের নিয়মের ব্যভিচার করিয়াও তাঁহার হস্তে কতকগুলি সত্যকার রাজক্ষমতা দেওয়া উচিত ছিল। বাজি পোড়ানো, ফৌজ কাওয়াজ করানো, অভিনন্দনপত্র গ্রহণ ও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানই রাজক্ষমতা নহে। আমরা জানি, অপরাধ ক্ষমা, অন্যায়ের প্রতিকার, দুঃখ দূর, অভাব পূরণ করা প্রভৃতিই রাজক্ষমতার সত্য পরিচয়। আমরা যদি যথার্থ রাজাকে পাইতাম, তবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতাম অভিযোগ করিতাম মার্জ্জনা চাহিতাম। তাঁহার ঔদার্য্য ও বদান্যতায় মুগ্ধ হইতাম, তাঁহার ক্ষমাগুণে তাঁহার সকরুণ প্রজাবাৎসল্যে তিনি আমাদের হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া যাইতেন। আমাদের বড় দুঃখ— বড় নিগ্রহের সময়েই রাজপুত্র এদেশে পদার্পণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু সে দুঃখ তাঁহাকে যে নিবেদনমাত্র করিব, সেইটুকু রাজধর্ম্মও তিনি গ্রহণ করিলেন না।

বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে— রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, একথা মনেও করিয়োনা। তোমরা আমাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক ইহারা শান্তিতে আছে তবু ইহারা আর কি চায়! ইহা জানিয়ো, হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে বশ করিলে সে ধনপ্রাণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। শান্তি

নহে— মানুষ তৃপ্তি চাহে এবং দৈব আমাদের প্রতি যতই বিরূপ হউন, আমরা মানুষ! আমাদেরও ক্ষুধা দূর করিতে হইলে সত্যকার অন্নেরই প্রয়োজন হয়— আমাদের হৃদয় বশ করা ফুলর, প্যুনিটিভ্ পুলিশ এবং জ্যাক্-জুলুমের কর্ম্ম নহে।

কিন্তু যখন আমরা চাহিতেছি সত্য এবং পাইতেছি মরীচিকা, তখন আমাদের হৃদয় দ্বিগুণ আক্ষেপের সহিত সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করে তখন আমাদের অন্তরের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠে, সে বলিতে থাকে বাহিরের সাজ দেখিয়া ভুলিয়োনা— এ সমস্ত খেলামাত্র। এই খেলায় যে ব্যক্তি নাচিতেছে সেও জানে না যে, সে কেবল ছদ্মবেশ পরা নট। সে মনে করিতেছে, সে রাজা, সে লাটসাহেব, সে পুলিশের প্রধান কোতোয়াল। এই প্রকাণ্ড মিথ্যার দ্বারা যতই আচ্ছন্ন হইতেছে ততই আসল সত্যকথাটা ভুলিয়া যাইতেছে। তাহার খেলার সাজগুলি আজই খুলিয়া লইলে যে চিরকালীন সত্যটুকু বাকি থাকে সেই সত্যের মধ্যে তাহাতে আমাতে লেশমাত্র প্রভেদ নাই। এই জগতে তুমিও যত বড় রাজা আমিও তত বড়ই রাজা। অথচ যে ব্যক্তি অনায়াসেই এই মানুষের সুখ দুঃখ মান অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহার প্রতি অন্যায় ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া সুখে ঘবে আসিয়া অন্ন পান গ্রহণ করিতে ও ক্লাবে আসিয়া টেনিস খেলিতে পারে, ঈশ্বর জানেন, অপমানিত মনুষ্য তাহার অপেক্ষা কোনো অংশেই ক্ষুদ্র নহে— বরঞ্চ যাহা সে সহ্য করিল তাহার দ্বারাই তাহার দাবী বাড়িয়া রহিল— কারণ, কোটালিই করুন আর ম্যাজিস্ট্রেটই হউন আর লাটের তক্তাতেই বসুন, খেলা একদিন শেষ হইবেই এবং যাহা সত্য তাহা কোনো দিন মরিবে না।

যিনি অনন্ত নরকাগ্নির নিমেষবিহীন রক্তচক্ষু মেলিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতে চান তিনি অসীম ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও তাঁহাকে যে ভীরু মনুষ্য মান্য করে, সে দীনহীন। যে ভগবান্ প্রেমের গুণে স্বয়ং আমাদের সমান ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে চান বলিয়া সহস্রভাবে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার পায়ে যে স্বতই আপনাকে লুণ্ঠিত না করে, সে ক্ষুদ্র— সে মৃত।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত চাবুক, জেল জরিমানা, প্যুনিটিভ পুলিশ ও গোরা গুর্খার প্রাদুর্ভাব, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মত আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্দ্ধে

তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখ— এই সমস্ত বড় বড় নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্ব্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার কর, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সঙ্কুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা, উজ্জ্বলতা, পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জ্জন গর্জ্জন, এই সমস্ত উচ্চ পদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন শোষণের আয়োজন আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলামাত্র— ইহারা যদি তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেই খানেই নত হওয়া গৌরব— যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজে যাহা করিতে পারো নীরবে নিভৃতে তাহার প্রতি সমস্ত মন প্রয়োগ করিয়ো, তাহার আরম্ভ সামান্য হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করিয়ো না— নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে— সেই জন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এত দিন বাঁচিয়া আছ, তাহা কখনই নহে, তুমি যাহা হইবে যাহা করিবে অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই— তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্ব্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে— এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্ব্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয় জানি—তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্ম্মের, কি ধর্ম্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল্ কাল-ভুজঙ্গের বিশ্বদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইয়ো না, লুব্ধ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না, তুমি "আত্মানং বিদ্ধি" আপনাকে জান এবং "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও, যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাণ্ডার ।। ফাল্গুন ১৩১২

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কন্‌গ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা— যদি হইয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহা সাধন করিতে হইবে।

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কংগ্রেসেব আকৃতি-প্রকৃতি, প্রণালী-পদ্ধতির সংস্কার যে আবশ্যক হইযা উঠিযাছে,তাহা অনেক দিন হইতেই চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ উপায়ে তাহা হইতে পাবে, তাহার মীমাংসা হয নাই।

কংগ্রেসেব দুইটি বৃহৎ বাহুল্য অনেকের চোখেই ভাসিতেছে। এক ব্যয়বাহুল্য, আর কার্য্যবাহুল্য। ব্যয় কমাইতে হইলে কয়েকটি আড়ম্বরের সঙ্কোচ করিতে হইবে। জমাটের জন্য যে ঘটাব আবশ্যক ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কংগ্রেসের মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও প্রতিনিধিগণের আতিথ্য-সৎকার এই দুইটি ব্যয়ের অঙ্গই প্রধান। এবার বঙ্গে যে সব বড় বড় সভা হইয়া গেল, তাহার জন্য যদি মণ্ডপ প্রস্তুত করা আবশ্যক না হইয়া থাকে, তবে কংগ্রেসের জন্য কেন হইবে? কংগ্রেসের কার্য্যবাহুল্য কমাইয়া যদি একদিনের অধিবেশনেই কাজ শেষ কবা যায়, তবে কোন বড় বাড়ি লইয়া অথবা খোলা ময়দানে চন্দ্রাতপ খাটাইয়া সভা করা যায়। কংগ্রেসে কেবল মাত্র প্রধান প্রধান বিভাগ হইতে দু-একটি করিয়া প্রতিনিধি প্রেরিত হইলেই যথেষ্ট। এইরূপে ব্যয় কমাইয়া আয়ের উদ্‌বৃত্ত তহবিল কোন কার্য্যকরী অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সরকারের নিকট অতি-পুরাতন প্রার্থনাগুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কতক বাদ দেওয়া দরকার। তাতে কাজ সংক্ষেপ হইবে এবং আবেদনের মধ্যে একটি নূতন

তেজ ফুটিয়া উঠিবে। অতীতের পুরাতনকে ছাঁটিয়া কাটিয়া বর্ত্তমানের নূতন সর্ব্বপ্রধান আন্দোলনটী— যার নেশায় সমস্ত দেশ পাগল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে অধিক আগ্রহে গ্রহণ ও বরণ করিতে হইবে, সার্থক করিতে হইবে। কংগ্রেসকলঙ্ক রটনাকারিগণ কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী আলোচনায় উহাকে কেবল ইংরেজী-বাগীশের বক্তৃতার লীলাভূমি বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ঠিক পথটির নির্দ্দেশ কেহ করিতে পারেন নাই। মানবে যাহা পারে নাই, দেবতা তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন। এবার কংগ্রেসের মত মহাসম্মিলনীর যোগ্য একটি মহাকাজ খুঁজিয়া পাইয়াছি। সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসেওয়ালাদেরই মাথায় এই দৈবপ্রেরণা— স্বদেশী আন্দোলন— প্রবেশ করিয়াছিল। এখন দলাদলি ভুলিয়া সেই মহা-অনুভবকে সার্থক করিতে হইবে। কংগ্রেস যদি তাহা না করে, তবে তাহার সমস্ত প্রতিপত্তি সে হারাইবে। দেশে বহুল পরিমাণে কল কারখানা ও যৌথ-কারবার স্থাপনের জন্য কংগ্রেস হইতে নূতন ভাবে আয়োজন উদ্যোগ হউক। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অর্থ ও সামর্থ্যের সাহায্য লইয়া এই ভাবটিকে দেশময় ব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত করা কংগ্রেসের উপরই নির্ভর করিতেছে। সমস্ত শক্তি দিয়াও যদি এই একটি ব্রতকে বহন করিতে পারে, তবে কংগ্রেসের সমস্ত অক্ষমতা একদিন সাফল্যের নবগৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

২। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কন্‌গ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অলোচনা ও মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় সকলকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে— যে উদ্দেশ্যেই কন্‌গ্রেস্ স্থাপিত হইয়া থাকুক্ না কেন, আর সেই উদ্দেশ্য কোন অংশে সাধিত হইয়া থাকুক্ বা না থাকুক্, এই জাতীয় মহাসমিতির দ্বারা যে, জাতীয় ভাবের প্রথম উদ্রেক ও জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে অপরাপর যে সমস্ত কার্য্য কন্‌গ্রেস্ দ্বারা সাধিত হইয়াছে বা সাধিত হইতে পারে বলিয়া অনেকে যখন আস্ফালন করেন, তখন স্বভাবতঃই একটি কথা জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে। সে কথাটি এই— কন্‌গ্রেসের নেতারা কি ভাবেন, যে তাঁহারা যে সমস্ত দাবি-দাবা করেন, ইংরেজরাজ তাঁহাদের আবেদন নিবেদনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদের ক্রন্দনে বিহ্বল হইয়া বা তাঁহাদের যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া, সেই সমস্ত দাবি-দাবা গ্রাহ্য করিবেন? আমাদের রোদনে ইংরেজের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইবে

এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা নিশ্চয়ই মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে ইংরেজ আমাদের দেশে বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দাতাকর্ণের ন্যায় বৃষকেতু অর্থাৎ জন বুল্‌কে (John Bull) পর্য্যন্ত বলিদান দিতে প্রস্তুত। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করা সময় নষ্ট মাত্র। ইংরেজ এখানে তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসিয়াছে ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আছে। আর যখনই সেই ইংরেজ বলে যে সে আমাদের উপকারের জন্য আসিয়াছে, আছে বা থাকিবে, তখনই সে সত্যের অপলাপ করে— সেটা কেবল তাহার দোকানদারী কথা। এ সম্বন্ধে ইতিহাস খুলিয়া দুচারি পৃষ্ঠা দেখিলেই বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে যে ইংরেজের চক্রান্তে, তাহার ছলে বলে ও কৌশলে, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ও অপরাপর যাহা কিছু ছিল, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন অনায়াসে হইতে পারিত, সে সমস্তই লোপ পাইয়াছে। সেই জন্য আমি ইংরেজের দোষ দিই না; আর যদি দিই সে কেবল গায়ের জ্বালা নিবারণের জন্য। তেল ও জল মিস্ খাইতে পারে, তথাপি ইংরেজের স্বার্থে ও ভারতবাসীর স্বার্থে কখন খাপ খাইবে না। সে অবস্থায় ইংরেজ নিজের ইষ্ট ত্যাগ করিয়া আমাদের উপকারের জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া গরমদেশে গলদ্‌ঘর্ম্মে কালযাপন করিবে আশা করা নিতান্তই মূঢ়তার প্রমাণ— তাহাতে আমাদের দোষ, তাহাদের নহে। আমাদের দোষ এই জন্য বলি যে আমরা নিজেদের ইষ্ট নিজেরা সাধন করিতে না চেষ্টা করিয়া ফিরিঙ্গি-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। কান্নাকাটির বলে আবেদন-নিবেদনে মানুষবিশেষে কখনও কাহারো উপকার হইয়াছে কি না জানিনা,কিন্তু তাহাতে কখন কোন জাতি উন্নতির পথে যে অগ্রসর হইতে পারে নাই সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যপ্রমাণ আছে। আর যখন ইংরেজ স্বার্থসাধনের জন্য এদেশে আসিয়াছে, তখন সে যে ন্যায় বা যুক্তির অনুরোধে নিজের স্বার্থে আঘাত দিবে তাহাও সম্ভব নহে। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ আজকাল স্বদেশী আন্দোলনে ইংরেজ যাহা করিতেছে তাহা উল্লেখ করা মাত্র প্রয়োজন। তবে কুকুরকে যেমন লাতি [লাথি] ঝাঁটা মেরে পরে একমুষ্টি উচ্ছিষ্ট অন্ন দিয়া তাহাকে বশীভূত করা যায়, সেইরূপে ইংরেজও যে আমাদের বশীভূত রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে স্বল্পাধিক দয়া দেখাবে, সেটা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। যদি সেই অন্ন খাওয়া ভিন্ন জীবন রক্ষার অন্য উপায় না থাকে, তবে তাহা খাইতেই হইবে। কিন্তু সেই অন্নের উপর নির্ভর করিয়া নিজের ক্ষমতায় অন্ন উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না পাওয়া কুকুরেরই সাজে— মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। সেই জন্য আমার মনে হয় যে অনুনয়

বিনয় ও ইংরাজের অনুগ্রহের উপর যদি কন্‌গ্রেসের সফলতা নির্ভর করে, তাহা হইলে সে সফলতা কখনই লাভ হইবে না। পরানুগ্রহ ছাড়িয়া যদি জাতীয় শক্তিকে কখনও কন্‌গ্রেসের পৃষ্ঠপোষক করা যায়, যদি ইংরাজ বুঝিতে পারে যে এই জাতীয় মহাসমিতিতে সমগ্র ভারতবাসীর সহানুভূতি আছে, তাহা হইলে আমাদের বেশী আব্দার করিতে হইবে না— যখনই যাহা চাহিব তাহা পাইব ও যাহা ইচ্ছা করিব তাহা পূর্ণ হইবে। জগতের নিয়মই এই।

এ অবস্থায় যাহা করিলে জাতীয় আত্ম-শক্তির বর্দ্ধন হয়, তাহাই কন্‌গ্রেসের করা উচিত। যদিও বা কন্‌গ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে ফিরিঙ্গিরাজ সশঙ্কিত হইয়া ভয়ে ভয়ে আমাদের পাওনা কড়ি কিয়ৎ পরিমাণে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাতে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত লোক ছাড়া সাধারণের বিশেষ কোন ফল লাভ হয় নাই। আর কন্‌গ্রেস যতই কিছু করুক না কেন, বিদেশী রাজার কাছ হইতে চোখে ধুলো দিয়ে যে কখন বেশী আদায় করিয়া লইতে পারিবেক তাহা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। যে জাতি দু-এক লক্ষ লোক লইয়া ত্রিংশৎকোটী লোককে অক্লেশে যথেচ্ছাচার শাসনের যাঁতায় পিষিতে পারে তাহারা যে কন্‌গ্রেসের পাণ্ডাদের বোড়ের চালে হঠাৎ মাৎ হইয়া যাবে, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। যদি কখন কন্‌গ্রেস আন্দোলনের পশ্চাতে জাতীয় বল প্রকাশ পায় তাহা হইলেই বিদেশী রাজা কন্‌গ্রেসের কথায় কর্ণ সজোরে আকর্ষিত হইবার ভয়ে আপনা হইতেই কর্ণপাত করিবে। সেই জন্য এখন যাহাতে কন্‌গ্রেসেতে সকল শ্রেণীর লোক আকৃষ্ট হয় যাহাতে আপামর সাধারণ কন্‌গ্রেস আন্দোলনে যোগদান করে তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। দেশীয় জনসাধারণের সহানুভূতি পাইতে হইলে পূর্ণমাত্রায় বিদেশী ধরণে কন্‌গ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিলে চলিবে না। যেমন পুস্তিকা ও সংবাদ পত্র দ্বারা, বা বড় বড় সভা করিয়া কন্‌গ্রেসের কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্য-লিপি প্রচার করা আবশ্যক, সেইরূপ যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি নানারূপ জাতীয় উপায়ে দেশের সমস্ত লোককে কন্‌গ্রেসের উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত— তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে ভারত সন্তান বলিয়া নিজের দেশের উপর তাহাদের কি অধিকার আছে, আর কি কারণে ও কিরূপভাবে জননী জন্মভূমির কাছে মায়ের সতীনপুত্র হইয়া নিজেদের অধিকার ও স্বত্ত [স্বত্ব] হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এরূপভাবে কার্য্য করিতে গেলে অর্থ অপেক্ষা মানুষের দরকার, বক্তৃতা অপেক্ষা কার্য্যের দরকার। ইংরাজের দ্বারা, অভাব মোচন হইবে এই আশায় বিংশতি বৎসর ধরিয়া ইংরাজকে আমাদের জাতীয় অভাব

বুঝাইবার জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা বৃথা ব্যয় না করিয়া যদি দেশের লোককে কিয়ৎ পরিমাণে রাজনৈতিক শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়াস পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বাস্তবিক এতদিনে আমরা অনেকটা কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিতাম। সমগ্র ভারতবর্ষে এক একটি করিয়া প্রাদেশিক সমিতি স্থাপনা করিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক সমিতির অধীনে জেলায় জেলায় যদি একটি করিয়া জেলা সমিতি স্থাপনা করা যায়, আর বৎসরান্তে জেলা ও প্রাদেশিক সমিতি কিরূপভাবে সর্ব্বসাধারণের কাছে স্বদেশীভাব পরিবর্দ্ধন করিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ লওয়া হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই দেশের মঙ্গল অচিরাৎ হইবে। সেই জন্য ইংরাজের কাছে দরবার বা নালিশ না করিয়া নিজেদের মধ্যে আত্ম-শক্তি ও আত্ম-চেষ্টা, আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্ম-নির্ভর কি প্রকারে বর্দ্ধিত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া কন্‌গ্রেসের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করা উচিত। আর প্রদেশে প্রদেশে, জিলায় জিলায়, সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক প্রচারক দ্বারা দেশের লোককে তাহাদের অধোগতির কারণ বুঝাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া কন্‌গ্রেসের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিলে যে আমাদের জাতীয় জীবনে নব কার্য্যকরী দেশ-হিতৈষিতার আবির্ভাব হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে, ইংরেজ সমীপে যদি কোন একটা বিষয় লইয়া আন্দোলন না করিলে কন্‌গ্রেস নেতাদের নিদ্রার নেহাৎই ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে সমস্ত লোক শিক্ষার জন্য গভর্ণমেন্টে অলঙঘনীয় আইন দ্বারা যাহাতে সকলকে কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিতে হয়, গভর্ণমেন্ট লোক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন পাস করিয়া যাহাতে সকলকে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করিতে পারে, সেই বিষয় একমাত্র চেষ্টা করিতে পারেন।

৩। বঙ্গরমণী

ভাণ্ডার সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্ন এই যে, কংগ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা, যদি হইয়া থাকে তবে কিরূপে সাধন করিতে হইবে?—

কংগ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি কি তাহা কাগজে কলমে কি ভাবে বর্ণিত আছে তাহা জানি না, কয়েকবার প্রত্যক্ষ দেখায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এইরূপ; গবর্ণমেন্ট আমাদের যে কোন দেয় জিনিস দিতেছেন না বা যে কোন কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন না, তদ্বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট তাহার

জন্য সমবেত প্রার্থনা। কংগ্রেসের সফলতা যদি এই উপায়ে হইয়া থাকে, তবে কংগ্রেসের ভাবী পথ ঠিক করা সহজ হইত। কিন্তু ২১ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস এই আবেদন করিয়া তাহার কি কিছু ফল পাইয়াছেন? ২১ বৎসরে একজন মানবশিশু বুদ্ধিমান্ হইয়া আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়া লয়। ২১ বৎসরে কি দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা চালিত কংগ্রেসের আপনা হইতে এ বোধ হয় নাই যে এই নিষ্ফল "আবেদন আর নিবেদনের থালা বহিয়া বহিয়া নতশির" না হইয়া যাহাতে দেশের কাজ দেশ আপনি করিতে পারে সেই উপায় করিতে হইবে?

কংগ্রেসে যাঁহারা যান, তাহারা প্রায় একই লোক, প্রতিবৎসর একই কথা শুনিয়া আসেন। তাহাতে লাভ হয় কতটুকু?

কংগ্রেসের বক্তৃতায় গবর্ণমেন্টের হৃদয় মুগ্ধ না হইলেও কংগ্রেসের বক্তৃতার যে একবারে ফল নাই তাহা নহে। বর্ত্তমান রাজকার্য্য কিরূপ ভাবে চলিতেছে তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার একটা আবশ্যক আছে। আবশ্যক ছাড়া আনন্দও যে নাই, তাহা নহে। এবার কংগ্রেসে যখন স্বদেশী বিষয়ে লজপৎ রায় বক্তৃতা দিয়া ছিলেন, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা কি কাহারও মনে ছিল? কিন্তু সে বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, তাহার সুর নূতন। সে আবেদনের কথা নয়, নিজের আত্ম-শক্তির উপর দাঁড়াইবার জন্য উপায়। কিন্তু এ রকম বক্তৃতা কয়টী ছিল? বাকি ১৮টী কন্‌ফারেন্সে যে সহস্রাধিক চর্ব্বিত চর্ব্বণ বক্তৃতা এ মাটীর শরীরে সহ্য করাই মুস্কিল। তাহা ভিন্ন কংগ্রেসের যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ মিলন ইহা তাহাকে ব্যর্থ করে। এই এতগুলি বক্তৃতায় যে কি শুনিয়া ছিলাম তাহা এখন প্রায় মনে নাই, কিন্তু বক্তৃতার ক্ষণিক বিরামে আহার বিহারের অবসরের মধ্যে যে দুই চারিজন বাল্য সখীকে কতকাল পরে দেখিয়াছি যে সকল নূতন সখী লাভ করিয়াছি তাহার আনন্দ কখন ভুলিব না। শুধু পুরুষের Conference নয়, একদিন মেয়েদেরও Conference মধ্যেও বক্তৃতা পাঠ ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বক্তৃতায় হৃদয় তৃপ্ত হইল না। বিদেশিনী ভগিনীগণ আমাকে হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিলেন যে এবার যখন কলিকাতায় কংগ্রেস হইবে তখন একদিন আমাদের শুধু নিমন্ত্রণ করিও। মনে করিবেন না এটী শুধু মেয়েলী ভাব। অনেক বার কংগ্রেসের বক্তৃতার মধ্য হইতে আমাদের পরিচিত আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া আমাদের Campএ বসিয়া পরস্পরের সহিত সুদুর মিলনের আনন্দে প্রীতি গল্পে কাল কাটাইতেন। হঠাৎ মনে হইত, এটা কর্ত্তব্য হইতেছে না, তখন উঠিয়া আমাদের কংগ্রেসে যাইতেন। সুতরাং

কংগ্রেসের বক্তৃতা স্তূপের দ্বারা না রাজার মন গলিতেছে, না প্রজার লাভ হইতেছে। এ স্থলে আবেদনটী ছাড়িয়া দিয়া যাহা'তে দেশের লোককে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহাদের কাজ তাহাদের দ্বারা করাইতে পারেন সেই উপায় কংগ্রেসের অবলম্বনীয়। কংগ্রেস শিক্ষিত কয়েকজন লোকের জন্য নয়, দেশের লোকের জন্য একথা তাহাদের বুঝাইতে হইবে। যখন কাশীর গঙ্গার ঘ'টে বিচিত্র প্রকাণ্ড কংগ্রেস মন্দির উঠিল, তখন মন্দির বহুল কাশীর লোক দলে দলে তাহা দেখিতে আসিল। কিন্তু হায় যেমন লাট সাহেবের দরজা আমাদের নিকট বন্ধ, কংগ্রেসের দরজাও তেমনি তাহাদের নিকট বন্ধ। ১ টিকিট দিয়া প্রবেশ করা আর বন্ধ থাকা তাহাদেব পক্ষে সমানই কথা। যদি বা কেহ ১ টিকিট দিয়া প্রবেশ করিত, তবে দিল্লীব লাড্ডু খাওয়া হইত।

মুক্ত আকাশতলে শ্যামলদূর্ব্বাদলে আমাদের কংগ্রেসের সভা করিতে হইবে। ছোট বড় সকলকে ডাকিয়া লইতে হইবে। আবেদন ছাড়িয়া আমরা নিজে কি উপায়ে কাজ করিতে পারি, আর সাধারণ লোককে কবাইতে পারি, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। সে পদ্ধতি কি হইতে পারে? এইখানে সম্পাদকের প্রশ্নটি একটী হেঁয়ালী। ইহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি তিনি অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, কংগ্রেস তাহাতে কর্ণপাত না করায় তিনি কি প্রশ্ন স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া সকলের নিকট তাহাই উত্তর স্বরূপ আদায় করিয়া কংগ্রেসের মনোযোগ আকর্ষণ কবিতে চাহেন? তিনি তাঁহার স্বদেশী-সমাজ প্রবন্ধে* দেশের জনসাধাবণকে তাহাদেব কর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য যে মেলা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, আমার মনে হয় এই কার্য্যটী কংগ্রেসেরই বিশেষভাবে গ্রহণ করা উচিত। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের প্রদেশে বৎসরে ১২টী মেলা করিবার ভার লইবেন। তাহা হইলে তিন দিনে কংগ্রেসের কাজ শেষ না হইয়া সম্বৎসরে তাহার কার্য্য চলিতে পারিবে। যে ১২টী মেলা হইবে প্রতিমাসে এক একটী স্থানে হইবে আর, যদি কোন চলিত মেলা থাকে তবে তাহাকেই কার্যোপযোগী করিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু সাধারণ লোককে রাজা প্রজার সম্বন্ধ বুঝাইবার পূর্ব্বে তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা আবশ্যক। সুতরাং তাহাদের নিকট কংগ্রেসের অনুরূপ বক্তৃতা দিলে চলিবে না। সহজ ভাষায় যাহাতে তাহাদের উপকার হয়, সেই কথা বুঝাইতে হইবে। যেমন স্বদেশী জিনিস ব্যবহার— কৃষির উন্নতি— শিল্পের উন্নতি— ব্যাঙ্ক স্থাপন— চাঁদা স্থাপন (জলাশয় প্রভৃতির

* *স্বদেশী সমাজ* (ভাদ্র ১৩১১)। — **সংকলন-সম্পাদক**

জন্য) Provident Fund — (অনাথ শিশুদের জন্য) ইত্যাদি। শুধু বোঝান নয়, যাহাতে তাহারা এইগুলি করিতে পারে তাহার উদ্যোগ করিয়া দিতে হইবে।

কংগ্রেসের সহিত যে exhibition হয় তাহার সঙ্গেও একটী মেলা রাখা হোক। Exhibition এর ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ১৲ টিকিট আছে, থাক। সকাল হইতে ২টা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নে সাধারণের জন্য /০ হোক, কিন্তু প্রতিদিন নিয়মিত সংখ্যার অধিক টিকিট বিক্রীত হইবে না। কংগ্রেস যদি আবেদন সকল ছাড়িয়া দেশের উপকাব, নিজে আমরা কিরূপে করিতে পারি এইটি গ্রহণ করেন তবে social conference কে অত স্বতন্ত্র করিলে চলিবে না। এবারে social conference এ দেখিলাম যে কোন বাঙ্গালী রমণী নাই। কেন? সে সমাজে এর কি কোন উন্নতি আবশ্যক নাই? না তাহা নহে। আমাদের কেহ নেতা নাই,সমাজ নাই, যাহা ছিল তাহা লইয়া বসিয়া আছি, এক পা নিজে বাড়াইবার সাহস নাই। প্রভিন্সিয়াল conference এই নেতার কাজ গ্রহণ করুন। সম্পাদক তাঁহার ভারতবর্ষ পুস্তকে যে প্রস্তাব করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, বণিক সম্প্রদায় আর্য্য জাতি হইতে পুনরায় জাতি গুণানুসারে বর্ণ বিধান করা হউক— দয়ানন্দ সরস্বতী তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে তিনি অহিন্দুকে হিন্দু করিবার অধিকার দিয়াছেন। আর্য্যসমাজ হইতে দেশের যে কিরূপ মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা আমাদের বোধাতীত। যদি আমাদের দেশকে আবার উন্নত করিতে হয় ত এই সামাজিক ভিত্তিকে আগে দৃঢ় করিতে হইবে। সমস্ত ভারতবর্ষের মিলন ক্ষেত্র কংগ্রেস হইতেই তাহা সম্ভব।

পূজার লগ্ন

এখন আর দেরি নয়, ধর্‌গো তোরা
হাতে হাতে ধর্‌গো
আজ আপন পথে ফিরতে হবে,
সাম্‌নে মিলন-স্বর্গ।

ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে
খুল্‌ল দুয়ার মন্দিরে যে,
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই,
কোথায় পূজার অর্ঘ্য।

এখন যার যা কিছু আছে ঘরে
আন্‌ আপনার থালা ভরে,
আন্‌ আরতির প্রদীপ জ্বেলে
আন্‌রে বলির খড়্গ।

আজ নিতেও হবে দিতেও হবে,
দেরি কেন করিস্‌ তবে,
বাঁচ্‌তে যদি হয় বেঁচে নে
মরতে হয়ত মর্‌গো।।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাণ্ডার ।। চৈত্র ১৩১২

মায়ার পথ ও মুক্তির পথ

দেশের প্রকৃত কল্যাণ যদি চাই, তবে যে দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপনার সামান্য শক্তির দ্বারা ইংরেজ এই সুবিশাল ভারতসাম্রাজকে ইঙ্গিতে শাসন করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা প্রাণপণে চ্ছেদন করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহয়নায়—মুক্তির আর অন্য কোনো পথ নাই।

ইংরেজ শক্তিশালী সত্য, কিন্তু তার এত শক্তি নাই যে সে সেই শক্তি প্রয়োগে এত বড় একটা সাম্রাজ্যকে আত্মবশে রাখিতে পারে। ইংরেজের শক্তি ইংরেজের নহে—আমাদের। ইংরেজ এদেশ জয় করিয়াছে—গোরার সঙ্গিণের জোরে নয়, সিপাহীর তরবারির বলে। ইংরেজ আপনার শক্তিতে এ দেশ শাসনও করে না, তার এই বিরাট ও জটিল শাসন যন্ত্রের পরিচালকও আমরাই। ধর্ম্মাধিকরণে—আমরাই ধর্ম্মাবতার, শাসন-বিভাগে—আমরাই ডেপুটী; শান্তিরক্ষায়—আমরাই প্রধান সহায়, কনেষ্টবল, বরকন্দাজ, জমাদার, দারোগা। সর্ব্বত্রই কাজ করি আমরা, কেবল নাম সহি করিয়া বাহিরে কর্ত্তৃত্ব করে ইংরেজ। আমাদের বেতন অল্প, কিন্তু শ্রম বেশী। আমাদের পদ সামান্য, কিন্তু দায়িত্ব গুরুতর। আমরা যদি একবার বলি—ইংরেজ তোমার কল তুমি চালাও, আমরা আর তোমার সঙ্গে নাই; এই যে অবিরাম ভ্রাম্যমান ব্রিটীশ-শাসন-চক্র চক্ষের নিমেষে তাহাও একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়ে।

সংখ্যায় ইংরেজ মুষ্টিমাত্র—আমরা সাগরতুল্য। দেহ-বলেও যে ইংরেজ ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলা যায় না। আমাদের শিখ, মারাটা পুরবী, গুরখা, পাঠান, তৈলঙ্গী ও তামিল সিপাহীদের তুলনায় ইংরেজ গোরা যে অপরিসীম শক্তিশালী এমন বোধ হয় না। আর মনের বল, ইংরেজেব অপেক্ষা আমাদের শতগুণ, সহস্রগুণ বেশী। হিন্দুমুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না, দুঃখক্লেশকে গ্রাহ্য করে না। ইংরেজও অকুতোভয়ে সমরক্ষেত্রে মৃত্যুসম্মুখীন হয়, কিন্তু একটা আকস্মিক উত্তেজনা বলে। দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা সে মৃত্যুকে, যন্ত্রণাকে, ভোগবিলাসের ব্যাঘাতকে, সহস্রগুণ অধিক ভয় করিয়া থাকে।

এদেশে ও বিদেশে, এই দুই বৎসর কাল ইংরেজের হইয়া কে লড়াই করিয়াছে?

চীনে, ব্রহ্মে, আফগানিস্থানে, কাফ্রিভূমে—কে ইংরেজের পতাকা ধারণ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রাণ দান করিয়াছে?—সে ইংরেজ নহে, ভারতবাসী; গোরা নহে, সিপাহী। ব্রিটীশসাম্রাজ্য ভারতের শোণিতপাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাবতের শৌর্য্যবীর্য্যেই এখনো স্থির হইয়া রহিয়াছে।

এমন ফাঁকি দিয়া ইতিপূর্ব্বে কোনো জাতি কখনো এত বড় সাম্রাজ্য লাভ করে নাই। আর এমন ফাঁকা প্রতাপের বলে, এমন বিশাল জলধি সম প্রজাপুঞ্জকে কোনো রাজশক্তি এমন ভাবে সুশাসিত করিতে পারে নাই। ইহাকে মায়ার খেলা ভিন্ন আর কি বলিব?

ইংরেজ বিদেশী, দূরাৎসুদূর হইতে, উড়িয়া আসিয়া এত বড় দেশটা মুষ্টিমেয় লোকে একেবারে জুড়িয়া বসিয়াছে, ইহা মায়িক ভিন্ন আর কিইবা হইতে পারে? ইংরেজ এদেশে কটিই বা আছে? কিন্তু এই গোটা কত শুধু প্রহরি পাহারাই সৈকত ভূমে বালুকাকণার তুল্য, ভারতের অসংখ্য প্রজাপুঞ্জকে অবলীলাক্রমে আপনার পদানত করিয়া রাখিয়াছে—ইহাকে ইন্দ্রজাল ভিন্ন আর কিইবা বলা যাইতে পারে? তাঁর নিজের দেশে এক বত্তি ভূভাগ ও একমুষ্টি লোককে শাসন করিতে ইংরেজরাজকে যে উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়, ভারতের তেত্রিশকোটী প্রজাকে শাসনাধীনে রাখিতে তার শতাংশের একাংশ বেগও পাইতে হয় না, ইহাও কি এক অত্যদ্ভূত মায়িক ব্যাপার নহে?

এই বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়াই ইংরেজ আমাদিগকে একান্ত অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। এই মায়াপ্রভাবেই আমরা এতকাল ধরিয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অবস্তুকে বস্তু বলিয়া আদর করিয়াছি, বস্তুকে অবস্তু জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছি। অবিদ্যার রাজ্যে জীব যত কিছু সাধন ভজন করে, তৎসমুদায়ই যেমন, আপাততঃ সুখকর বা কল্যাণকর হইলেও, চরমে মুক্তির সাহায্য না করিয়া, বরং ব্যাঘাতই উৎপন্ন করে, সেইরূপ ইংরেজের মোহে অভিভূত হইয়া, এতকাল ধরিয়া ইংরেজের শাসনগ্রন্থিকে শিথিল ও কোমল করিবার জন্য আমরা যত কিছু চেষ্টা করিয়াছি, তৎসমুদায়ই আমাদের বন্ধনদশাকে আরো বর্দ্ধিত ও বদ্ধমূল করিয়াছে।

আমরা বহুকাল হইতে গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইযয়াছি—দেশে রাজনৈতিক স্বত্ব-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য। ইংরেজের মায়াতে অভিভূত হইয়া তাহারই হাত ধরিয়া জাতীয় জীবনের সফলতা লাভের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ জ্ঞান আমাদের জন্মায় নাই যে, এক্ষেত্রে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধিতে

ইংরেজের বিপদ, আমাদের শক্তি বৃদ্ধিতে তাহার শক্তিহানি, আমাদের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্যক সম্প্রসারণে, তাহার প্রতাপের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজ আমাদের কল্যাণকামনায় কখনো আমাদিগের শক্তি-সম্পদ-স্বত্ব-স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিয়া আপনি আত্মহত্যা করিতে চাহিবে না।

কিন্তু এক সময়ে আমরা সত্যই ইংরেজকে দেবতা মনে করিতাম। ইংরেজ তাহার শিক্ষাদীক্ষা দিয়া, তাহার আপনার শাস্ত্রসাহিত্য পড়াইয়া, স্বহস্তাঙ্কিত আত্মছবি দেখাইয়া, আমাদিগকে এমনি ভুলাইয়া রাখিয়াছিল যে দেবতায় যা অসম্ভব, ইংরেজের পক্ষে তাহাও সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করিতাম। তাই ইংরেজের হাত ধরিয়া জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম।

ইংরেজের হাত ধরিয়াই আমরা এতকাল রাজনৈতিক সাধনের চেষ্টা করিয়াছি সত্য, কিন্তু ইহাতে মূলে ইংরেজের এই অদ্ভুত মায়া বিদ্যমান থাকিলেও পঁচিশ বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনায় যে এই মায়া কিছুই কমে নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না। একদিকে যেমন এই মায়ার বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছে, অন্যদিকে বোধ হয় তাহা তেমনি অবার আরো শতগুণ কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না।

রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য—শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন। কোনো বিষয়ের সংস্কার সাধন করিতে গেলেই, নিরন্তর তার দোষ, ত্রুটি, অপকারিতা, প্রভৃতি অসদ্‌গুণের আলোচনা করিতে হয়। আমরা ভারতে ব্রিটিশ শাসন-যন্ত্রের সংস্কার প্রার্থনা করিতেছি; এই প্রার্থনা সমর্থন করিবার জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে এই যন্ত্রের অপূর্ণতা ও অপকারিতা প্রমাণ করিতে হইয়াছে। এই দোষনির্দ্দেশ হইতে রাজা-প্রজায় বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। রাজপুরুষেরা আত্ম-সমর্থন করিয়াছেন, দেশের নেতৃবর্গ তাঁহাদের প্রমাণযুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপে রাজনৈতিক আন্দোলন এদেশে জন্মাবধিই যথেচ্ছভাবে ব্রিটীশ শাসনের দোষ কীর্ত্তন করিয়া, তাহার প্রাচীন মায়িক প্রভাবকে স্বল্পবিস্তর নষ্ট করিয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে কংগ্রেসী নেতা—কৌন্সলী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কলিকাতায় ফিরিঙ্গী দৈনিক পত্র ডেলি নিউজের একজন লেখককে বলিয়াছিলেন যে ব্রিটিশশাসনকে লোকচক্ষে হেয় ও হীন করা কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য। সকল কংগ্রেসীনেতা হয়ত একথা স্বীকার করিবেন না। আর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর কথার দৌড় কত, ইহা তলাইয়া দেখিয়াছিলেন কি না, ঠিক বলা যায়

না। কিন্তু লক্ষ্য তাঁর যাহাই থাকুক না কেন, ফলে আমাদের গত ত্রিশ বৎসরের রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশপ্রভুশক্তির মায়িক প্রভাব যে কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আর যে পরিমাণে এই মায়াজাল ইহার দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনাদিও সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা যদি প্রথমাবধি আমাদের স্বত্বস্বাধীনতা লাভের চেষ্ট পরিত্যাগ করিয়া, স্বত্বস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে এ মায়া এতদিনে আরো অনেক কাটিয়া যাইত। এখনো "লাভ" ছাড়িয়া "প্রতিষ্ঠার" প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভের আশু সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা "লাভের" লোভ ছাড়িতে পারি কৈ? — "লাভ" আর "প্রতিষ্ঠার" পার্থক্য এই লাভ ভিক্ষাতেও সম্ভব হয়, শক্তি ভিন্ন প্রতিষ্ঠা অসাধ্য।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসনের দোষকীর্ত্তন অপরিহার্য্য, রাষ্ট্রধর্ম্মভ্রষ্ট প্রাজারঞ্জনবিমুখ অত্যাচারী ও অনাচারী রাজাকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায়, প্রজাবর্গ সংহত হইয়া সংহার করিবে—এমন বিধি শাস্ত্রে আছে সত্য; কিন্তু কার্য্যত রাজার দোষকীর্ত্তনে ভারতের প্রজাবর্গ ইতিপূর্ব্বে কখনো অভ্যস্ত ছিল না। এই জন্য সহসা ব্রিটিশশাসনাধীনে রাজনৈতিক স্বত্বস্বাধীনতা লাভের লোভে রাজদোষকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়া, আমাদেব স্বার্থ ও সংসারবুদ্ধি তৃপ্ত হইলেও ধর্ম্মবুদ্ধি যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, ইহা স্থির নিশ্চয়। অতএব রাজভক্তির সঙ্গে এই দ্রোহীভাবাত্মক, রাজদোষকীর্ত্তন-নিরত, রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা সামঞ্জস্য সাধন আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রয়োজন নিবন্ধনই আমরা ইংরেজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, ইংরেজের হাত ধরিয়া, ইংরেজের শাসনযন্ত্রের যথাযোগ্য সংস্কার সাধনের দ্বারা আপনাদের স্বত্বস্বাধীনতা বৃদ্ধির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপে একদিক দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনায় ধীরে ধীরে ইংরেজের মায়াজাল যেমন অল্পে অল্পে ছিন্নগ্রন্থি হইতে ছিল, অন্য দিক দিয়া, ইংরেজের নেতৃত্বে ও সাহায্যে সেই মায়াজাল আরো ঘনতর ও ঘননিবিষ্টতর হইতে আরম্ভ করিল। এই জন্যই ত্রিশ বৎসর কাল বিবিধ ভাবে ইংরেজ শাসনের দোষকীর্ত্তন করিয়াও আমরা আজি পর্য্যন্ত আত্মশক্তির সন্ধান ও আত্মনির্ভরের শিক্ষা লাভে সমর্থ হইলাম না।

আমাদের প্রাচীন রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনাতে ইংরেজ জাতিকে দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য ও প্রভেদ

কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। এক শ্রেণী ইন্দ-ইংরেজ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, যাঁরা এদেশে আসিয়া ভারতের শাসন বা শোষন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল;—ইহারা ক্ষুদ্রমতি, অল্পবুদ্ধি, সংকীর্ণচেতা, অত্যাচারপ্রবণ, লোকহিতৈষীর উদার-আদর্শ-চ্যুত। ভারত শাসনের যাবতীয় দোষ ও অবিচার অত্যাচারের মূলে এই ইন্দ-ইংরেজ বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দল রহিয়াছে। আর এক শ্রেণী আলেহী বিলাতী ইংরেজ, তাঁহারা বুদ্ধিমান, উদারমতি, স্বাধীনতা-প্রিয়, লোকহিতৈষিতায় তাহাদের প্রাণ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ভারতের দুঃখ দুর্গতির কথা তাঁহারা জানেন না,—সুতরাং এ দুঃখ দুর্গতি ঘোচে না। এদেশের ইংরেজ রাজা নহে, রাজভৃত্য মাত্র। আদত আমাদের রাজা বিলেতী ইংরেজসমাজ। রাজমন্ত্রিগণ ভারত শাসনের রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, এ সকল কর্ম্মচারী আপনাদের কর্ম্মাকর্ম্মের জন্য মন্ত্রীসমিতির নিকট দায়ী। আর বিলাতের প্রজাবর্গ নির্ব্বাচন করে ফলতঃ রাজমন্ত্রীদলকে, তাঁহারা ইংরেজ প্রজা সাধারণের অনুগ্রহাপেক্ষী, তাহাদের মনস্তুষ্টির উপর ইহাদের মন্ত্রিত্ব নির্ভর করে। ঐ সকল বিলাতী ইংরেজই ভারতের প্রকৃত রাজা। আর তারা উদারমতি, স্বাধীনতা-প্রিয়, লোকহিতৈষী; ভারতের অবিচার অত্যাচার কাহিনী একবার ভাল করিয়া তাহাদের কর্ণগোচর ও বুদ্ধিগম্য হইলে, আর আমাদের কোনো প্রকারের দুঃখ দুর্গতি থাকিবে না।

একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশ প্রভূশক্তির মায়াপ্রভাব অল্পে অল্পে হ্রাস হইতেছিল, অন্যদিকে বিলাতী ইংরেজ চরিত্রের উপরে একটি অতি প্রাকৃত আস্থা জন্মিয়া ব্রিটিশ জাতির এক অভিনব মায়াপ্রভাব আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। এই মায়াজালে আবদ্ধ না হইলে, আমাদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদি এতদিনে অদ্ভুত শক্তিবীর্য্যলাভ করিয়া, এক অভিনব পথে জাতীয় শক্তিকে পরিচালিত করিয়া, জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সফলতা লাভের চেষ্টা করিত।

এদেশে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে যে আমাদের কিছু মাত্র স্বত্বস্বাধীনতা লাভের আশা ভরসা নাই—একথা এখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত বিলাতের আশা সকলে ছাড়িতে পারেন নাই।

এবিষয়ে প্রথমাবধিই আমরা একটা বৃহৎ কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি। প্রথম ভুল—এদেশী ইংরেজ ও বিলাতী ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য কল্পনা করা। এদেশী ইংরেজরা আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে বিলাতের ইংরেজ সেরূপ করে

না সত্য; কিন্তু এই বৈষম্যের কারণ দেশকালে অন্বেষণ করিতে হইবে, ব্যক্তিগত চরিত্রে নহে। ইংরেজ যতদিন স্বদেশে থাকে, ততদিন সে আপনার সমকক্ষ লোকের মধ্যেই বসবাস করে। জনসাধারণের স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা সেখানে এতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কেহ কাহারো যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া সমাজে চলিতেই পারে না;—সে চেষ্টা করিলে, হাতে হাতে তার প্রতিফল পাইতে হয়। এই জন্য, এই স্বাধীনতার হাওয়া সমাজে নিত্যপ্রবাহিত বলিয়া ইংলণ্ডের লোকে পরাধীন অভ্যাগতের প্রতিও সসম্মান ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা তাহার সমাজ-ধর্ম্ম, আত্ম-ধর্ম্ম নহে।

এই সৌজন্য ও উদারতা যদি সত্য সত্যই ইংরেজের চরিত্রগত হইত, তাহা হইলে বায়ু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিগত এই সৌজন্য ও উদারতা বিলোপ প্রাপ্ত হইত না। ইংলণ্ডে ইংরেজ ভাল মানুষ বটে, কিন্তু যেই সে অন্যদেশে যায়, অমনি এমন উদ্ধত হইয়া উঠে কেন? আফ্রিকার ইংরেজ কি মূর্ত্তিতে বিহার করে, জানে কাফ্রি; অষ্ট্রেলিয়ায় সে কি বিগ্রহ ধারণ করিয়াছে—জানিয়াছে তাহা সেই ভূভাগের প্রাচীন অধিবাসিগণ; ভারতে, ব্রহ্মে, ইংরেজ কি রূপ ধরিয়াছে—জানি আমরা সকলে। এ কেন হয়?

বিলাতী ইংরেজ হইতে ভারতের ইংরেজপ্রবাসীদিগকে পৃথক করিতে যাইয়া আমর' কখনো এ প্রশ্ন উত্থাপন করি নাই। যদি করিতাম তবে এই শ্রেণীবিভাগের দ্বারা আমরা আপনাদিগের জাতীয় চরিত্র, সাধনা ও সভ্যতাকে কতটা যে হীন বলিযা প্রচার করিয়াছি, ইহা বুঝিতে পারিতাম।

বিলাতী ইংরেজ ভাল, এদেশের ইংরেজ মন্দ—কেন? বীজের পার্থক্য দুয়ের মধ্যে কিছুই নাই। তবে সেই স্বাধীনচেতা, উদারমতি, লোকহিতৈষী, সৌজন্যভূষিত, ইংরেজ এদেশে আসিয়া এমন সংকীর্ণ, এমন স্বার্থপর, এমন দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠে কেন? সেই বিড়ালই যদি বনে গিয়া বন বিড়াল হয়, তবে এই রূপান্তরের কারণ বিড়াল একেলা নহে, বনই তার মুখ্য কারণ।

বিলাতী ইংরেজ ভাল, ভারতে আসিয়াই যদি যে মন্দ হইয়া যায়, তবে আমরাই তাকে মন্দ করিয়া তুলি। দোষ আমাদের, তার নহে। এই যুক্তি অবলম্বনে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার অবিচারের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, ইংরেজ নহে। ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণ ও রাজকর্ম্মচারীসকল এ অন্যায় অবিচারের কর্ত্তা নহেন, কেবল নিমিত্ত মাত্র হইতেছেন।

এ কথাটা যে নিতান্ত অসঙ্গত বা অসত্য, তাও বলা যায় না। সর্ব্বত্রই প্রজার দোষগুণের দ্বারা রাজার চরিত্র দুষ্ট বা বিভূষিত হইয়া থাকে। যেমন রাজা তেমনি তার প্রজা হয়, আবার যেমন প্রজা তেমনি তার রাজাও হয়। এই ক্ষেত্রে বিধাতা পুরুষ সর্ব্বথাই যোগ্যং যোগ্যেন যোজনা করিয়া থাকেন। প্রজা যেখানে দুর্ব্বল, নির্ব্বীর্য্য, আত্মরক্ষাতে পরাঙ্মুখ বা অপারগ হয়, রাজা সেখানে রাজনীতির দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিধানেই, প্রজারঞ্জনবিমুখ, প্রজাস্বত্ববিনাশী, প্রজাধনাপহারী, অবিচার ও অত্যাচারপ্রবণ হইয়া উঠে। আর প্রজা যেখানে সবল, বীর্য্যবান, আত্মরক্ষণে সপারগ ও সচেষ্ট, সেখানে রাজা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রজারঞ্জনতৎপর, ন্যায়বিচারক ও সৌজন্যপরায়ণ হইয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে রাজমন্ত্রিদল ও রাজা সকলেই প্রজার মনোরঞ্জনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন, এই জন্যই সেখানে প্রজামণ্ডলী শক্তিশালী, সংযোগশীল, রাজার অনিষ্টপাতে সক্ষম। ভারতে সেই ইংরেজ রাজপুরুষেরাই অত্যাচারী হয়, এই জন্যই এখানে প্রজা দুর্ব্বল, নির্ব্বীর্য্য, সংযোগহীন ও রাজার অনিষ্টসাধনে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। ব্রিটিশশাসনের অবিচার অত্যাচারের জন্য ইংরেজ দায়ী নহে, দায়ী আমরা, ভারতের ত্রিশকোটী মোহাচ্ছন্ন, অজ্ঞানান্ধ, নির্ব্বীর্য্য ও নিশ্চেষ্ট প্রজাপুঞ্জ।

প্রজাচরিত্রের বৈচিত্র নিবন্ধন বিলাতের শাসনযন্ত্র ও শাসনতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে সত্য; এবং এই প্রভেদের জন্য যদি দোষ কাহারো হয়, সে দোষ আমাদের ইহা মুক্ত কণ্ঠে শতবার স্বীকার করি;—কিন্তু এই পার্থক্য নিবন্ধন বিলাতী ইংরেজের সঙ্গে ভারতের ইংরেজ সম্প্রদায়ের কোনপ্রকারের চরিত্রগত বা প্রকৃতিগত শিক্ষা বা সাধনাগত পার্থক্য আছে, ইহা কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে। ফলতঃ ইংরেজ এখানে যেমন সেখানেও সেইরূপই। সে সর্ব্বত্রই আপনার গণ্ডা বোঝে; পরের ধনে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে। ইংরেজ-ইতিহাসে কবে আমরা তাহার বিশ্বপ্রেমের বা সর্ব্বজনীন উদারতার প্রমাণ পাইয়াছি? ইংরেজ সর্ব্বদাই প্রতিদ্বন্দী [প্রতিদ্বন্দ্বী] সাম্রাজ্য সকলের দোষ ঘোষণা করিয়া, আপনার উন্নত চরিত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে—আত্মসংশোধনের প্রতি কখনো দৃক্‌পাত করে নাই। দক্ষিণ মার্কিনে কাফ্রিদাসদিগকে অধীনে রাখিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, কাহারা?—ইংরেজ কুঠিয়ালগণ। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণলোভে দুইটী স্বতন্ত্ররাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে কে?—ইংরেজ খনিওয়ালাগণ। আর ভারতেও বণিকবেশে আসিয়া, ছলেবলে কৌশলে, হিন্দু-মুসলমানের রাজত্ব

কাড়িয়া লইয়াছে, সেই ইংরেজ। ইতিহাসে ইংরেজের পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত পাইলাম কোথায়? ব্রহ্মজয়ে, না চীন সমরে—কোথায় ইংরেজের লোকহিতৈষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়?

মোট কথা এই—এদেশের ইংরেজ ও বিলাতী ইংরেজ সকলেই এক শ্রেণীর জীব। সকলেরই চরিত্র ও স্বার্থসন্ধান একই রূপ। মুখে একদল আর এক দলকে গালি দেয়—কিন্তু মূলে কারোই ভুল হয় না। স্বার্থসাধনে সকলেই সমান তৎপর।

এইটী আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এইটী বুঝিতে পারিলে, এদেশী ইংরেজের মোহ যেমন কাটিয়াছে, বিলাতী ইংরেজের মোহও সেইরূপ সহজে কাটিয়া যাইবে। আর তখন সত্যই আত্ম-নির্ভরের পথে যাইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিব।

ইংরেজের মায়াজাল ছেদন করা-বর্ত্তমান সময়ে আমাদেব সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এই মায়জাল কাটাইতে হইলে, সর্ব্বাদৌ হিউম, কটন, ওয়েডারবরণ, প্রভৃতি প্রথিতনামা ভারত-বন্ধুগণের সাহায্য ও সহানুভূতি উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এ মায়ার প্রধান অবলম্বন এখন ইহারাই।

ইহারা লোক মন্দ, এমন কথা বলি না। ইঁহাদের সকলকেই আমি জানি, দু একজনের নিকট বন্ধুতা ঋণে আবদ্ধ আছি। ইঁহারা আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা যাহা চাই, ইঁহারা ঠিক আমাদের জন্য তাহাই যে চান, এমন কথা কখনই বলিতে পারি না।

প্রথমতঃ, ইঁহাদের লক্ষ্য—সুশাসন, উপলক্ষ্য—স্বায়ত্ত-শাসন। আমাদের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—আমরা চাই স্বায়ত্ত-শাসন আগে, সুশাসন পরে। স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের লক্ষ্য, সুশাসন উপলক্ষ্য মাত্র।

ইঁহারা সুশাসন চান, প্রধানতঃ ইংরেজের রাজত্বের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য। প্রজার সন্তোষ ও ভক্তির উপরে যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ ভারতে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি নিতান্ত মায়িক প্রভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজ কখনো বা শক্তি প্রকাশে, কখনো বা অসাধারণ ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া, ভারতের প্রজাবর্গের চিত্তকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের স্বতঃস্ফূরিত স্নেহানুকূল্যের উপরে আপনার প্রভুশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই আনুকূল্যই ইংরেজ সিংহাসনের পাদপীট [পাদপীঠ]—ইহাই ইংরেজ প্রভুত্বের দুর্ভেদ্য দুর্গ। এই

ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। বুদ্ধিমান ইংরেজেরা ইহা জানেন, তাই তাঁহারা প্রজারঞ্জনরত হইয়া, স্বজাতীয় রাজপুরুষদিগকে, ভারতে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির স্থায়িত্বসাধনে নিযুক্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করেন।

আমরা হৃষ্ট পুষ্ট সুস্থ সবল নরপশু হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ব্রিটিশাধীনে বাস করি, উদারতম ইংরেজেরও ভারত শাসনের চরম লক্ষ্য ইহা। মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা সর্ব্বতোভাবে, আত্মস্থ ও জাতীয় জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হই, — এমন ইংরেজ কজন আছে জানি না, যারা আন্তরিক ভাবে এমন সাধু ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকে।

অন্যত্র* একথা বলিয়াছি যে হিউম অস্ত্রআইন রদ হউক, ইহা কখনোই ইচ্ছা করেন নাই। যে একবার আমাদের সিপাহীরা ক্ষিপ্ত হইয়া ইংরেজের শোণিতে ভারত ভূমিকে সিক্ত করিয়াছিল বলিয়া, যে আমাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিতে চাহে সে ব্যক্তি যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সর্ব্বান্তঃকরণে কখনো সমর্থন করিতে পারিবে, এরূপ কল্পনা করাও মুর্খতা।

যেমন হিউম, সেইরূপ কটন, সেইরূপ ওয়েডারবরণ সকলেই। ইঁহারা আমাদের বন্ধনরজ্জুকে মকমলে মুড়াইয়া দিতে চান, একেবারে ছেদন করিতে কখনো রাজি হইবেন না। কটন সে দিনও বলিয়াছেন—একটু সহানুভূতি দিলেই ভারতবাসীজনগণকে শাসন করা নিরতিশয় সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তিনি এই সহানুভূতির বন্ধনে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে চান। ওয়েডারবরণ প্রমুখ সকলেরই মূল কথা ঐ—সুশাসন, সহানুভূতি এবং সুশাসনের জন্য যতটুকু স্বায়ত্তশাসন অত্যাবশ্যক ততটুকু স্বায়ত্তশাসনও আমাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে,—ইঁহাদের এই মত, এই আদর্শ।

আমাদের পক্ষে ইহা মৃত্যুর পথ, অমৃতের পথ নহে—শক্তি ও জীবনের পথ নহে। এপথ সুখকর, কল্যাণকর নহে। সুখ যে চায় সে ও কোমল পথে চলুক। কিন্তু যে শ্রেয়ের জন্য লালায়িত হয়, শ্রেয়ের জন্যই সমুৎসুক—সে ও পথ বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া. অন্য পথ অবলম্বন করুক। প্রাচীন বন্ধুতার খাতিরে, মাতৃ-হত্যাতে যেন নিযুক্ত না হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

---

* . দ্রষ্টব্য পরপৃষ্ঠাতেই কংগ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে বিপিনচন্দ্র পালের উত্তর। — সংকলন-সম্পাদক

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

কংগ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা— যদি হইয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহা সাধন করিতে হইবে।*

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল

কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, একদল লোক কিছুদিন হইতে একথা বলিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁ'র' এ কথা কখনো বলেন নাই, বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধীয় আন্দোলনে বিফল মনোরথ হইয়া তাঁরা পর্য্যন্ত এখন ধীরে ধীরে ঐ সুর ধরিয়াছেন। তবে এখনো লোকের মনে আমাদের নূতন রাজনৈতিক আদর্শ বা কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে যে কোনো ঠিক ও স্থির ধারণা জন্মিযাছে, এমন কথা বলিতে পারা যায না।

কি আদর্শ লইয়া কংগ্রেস জন্মিয়াছিল, তাহা একদিকে বলা সহজ, কারণ প্রায় সকলেই তাহা জানেন; আর একদিকে বলা কঠিন, কারণ এখন যেমন, তখনো সেইরূপই, দুইটা বিভিন্ন আদর্শ আমাদেব মধ্যে জাগিয়া ছিল। যে আদর্শ আজ পরিস্ফুট হইয়া কংগ্রেসের ভাব ও প্রণালীর পরিবর্ত্তন চাহিতেছে, সে কালেও সেই আদর্শ কংগ্রেসের মধ্যেই অঙ্কুরাবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

আমাদের মধ্যে একদল লোক কংগ্রেসের জন্মাবধিই, ইহাকে ভারতের ভবিষ্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রজা-প্রতিনিধি সভার বীজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন আমরা প্রায় সকলেই বিলাতের মোহে পড়িয়া ছিলাম, বিলাতী ও বিদেশী ছাঁচেই আমাদের চিন্তা, ভাব ও আদর্শ তখন গড়িয়া উঠিতেছিল; সুতরাং সে সময়ে আমরা সহজেই কল্পনা করিয়াছিলাম যে ইংরেজের যেমন পার্লামেন্ট আমাদের দেশে কালে কংগ্রেস

---

* ফাল্গুনের প্রশ্নেরই পুনবাবৃত্তি। — **সংকলন-সম্পাদক**

সেইরূপ দাঁড়াইবে। আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনের আকাঙক্ষা পরিণামে কংগ্রেসের দ্বারাই সম্যক্-রূপে পরিপূর্ণ হইবে।

তখনো ইংরেজের সঙ্গে পরিণামে আমাদের কি সম্বন্ধ দাঁড়াইবে,— এ প্রশ্ন উঠে নাই। তবে মোটামোটি ইংরেজও এ দেশে থাকিবে, আমরাও আত্মশাসনের অধিকার পাইব, এবং আত্মশাসন ও ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সাধিত হইবেই হইবে, এরূপ একটা ভাব যেন সকলের প্রাণেই বিদ্যমান ছিল। যেমন এই আকাশে, সেইরূপ জনসমাজের শাসনসংরক্ষণের বিধিব্যবস্থাতেও যে স্থিতিবিরোধের অলঙঘ্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, রাজশক্তির সংকোচ ভিন্ন যে প্রজা-শক্তির সম্প্রসারণ অসম্ভব,— এ কথাটা তখনো আমরা ভালো করিয়া বুঝি নাই। আর যতটুকু বুঝিয়াছিলাম, তাহাতে ইংরেজকে এতটাই উদার ও সদাশয় বলিয়া মনে করিতাম যে, সে যে আমাদের উন্নতির কখনো অবরোধ করিবে, এ কল্পনাও চিত্তে স্থান পায় নাই।

যাঁরা কংগ্রেসের জন্মদাতা ও তদবধি যাঁহারা কংগ্রেসকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন— তাঁদের আন্তরিক অভিপ্রায় যে কি ছিল, ইহাও নির্দ্ধারিণ করা একান্ত অসাধ্য নয়। হিউম কংগ্রেসের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে হিউম তদানিন্তন [তদানীন্তন] বড়লাট ডফারিণের সঙ্গে এ বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ ও বিচার-আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহাত এখন সকলেই জানেন। হিউম উদারমতি সদাশয় লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তিনি ইংরেজ। ভারতের প্রতি তাঁর যত কেন মমতা থাকুক না, ইংলন্ডের প্রতি যে তদপেক্ষা কম ছিল, এখন কথা কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। যেখানে ইংলন্ডের স্বার্থের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার সাংঘাতিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, সেখানে তিনি যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংলন্ডের প্রাণপ্রিয় স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

আমরা যা চাই হিউম ঠিক যে তাহাই চান না— একথা বহুদিন পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ১৮৮৭ সালে মান্দ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে, অস্ত্র-আইন রদ্ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিউম প্রাণপণে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। এরূপ করিবার দুইটা হেতু থাকিতে পারে, এক অস্ত্র-আইন রদ্ হউক হিউম ইহা ইচ্ছা করেন নাই; অপর, ইচ্ছা থাকিলেও এমন প্রগল্‌ভ প্রস্তাব সহসা সরকারের নিকট উপস্থিত করিলে, কি জানি তাঁরা ভয় খাইয়া যান, এজন্য আপাতত অতটা দাওয়াদাবী না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি জানি যে এই দ্বিতীয় কারণে হিউম এ প্রস্তাবের

প্রতিবাদ করেন নাই; কারণ অস্ত্র আইন রদ্ হউক ইহা কিছুতেই তিনি ইচ্ছা করিতেন না।

মান্দ্রাজের কংগ্রেসের পরে, প্রয়াগে কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতেও ঐ অস্ত্র-আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, হিউম তখনো তার প্রতিবাদ করেন। প্রয়াগ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে, এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা-বার্ত্তা হয়। সে সময়ে তিনি, কেন যে আমাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইহা খুলিয়া বলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী এদেশে ছিলেন, ও যাঁহারা স্বচক্ষে তখনকার ভীষণ দৃশ্য সকল দেখিয়াছেন, তাঁরা কখনো অস্ত্র আইন রদ্ হউক এরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন না।

ভারতে ব্রিটিশ প্রভুশক্তিকে প্রজাবর্গের সুখ সন্তোষ ও স্নেহমমতার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হিউমের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। ব্রিটিশ প্রভুশক্তির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য প্রজার আনুকূল্য লাভ করা অত্যাবশ্যক; কারণ কোথাও কোনো রাজশক্তি প্রজার আনুকূল্য ব্যতীত স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে সর্ব্বত্রই প্রজামণ্ডলী মধ্যে কোনো একটা বর্ণ বা শ্রেণী বা শক্তিশালী দলকে আপনার সহায় ও অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতেই হয়, নতুবা তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা অসাধ্য হইয়া পড়ে। রুশীয় স্বেচ্ছাতন্ত্র এই জন্য রাজবংশী ও অভিজাত বর্গের স্বার্থ ও স্নেহমমতার উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আপনার শক্তি ও গৌরবে ইহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া, ইহাদের শক্তি ও আধিপত্যের সহায়ে আপনার সিংহাসনকে সুরক্ষিত করিতেছে। ভারতে ব্রিটিশতন্ত্রও একান্ত স্বেচ্ছাচারী; তাহাতে প্রজাসাধারণের মতামত ও স্বত্ব-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কোনই উপায় ও উপকরণ নাই। অথচ শুদ্ধ পশুবলের বা বাহুবলের উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এতকাল ইহা প্রজার আনুকূল্যেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিন্তু এ আনুকূল্য বেশী দিন থাকিবে কি না কে জানে? এই আনুকূল্য রক্ষার জন্য এদেশে একদল ব্রিটিশভক্ত নেতৃবর্গের সৃষ্টি করা আবশ্যক। ইহারা ইংরেজের সভ্যতা, ইংরেজের সাধনা, ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া, ইংরেজ রাজশক্তিকেই আপনাদের ইংরেজী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী সাধনা ও সভ্যতার সম্প্রসারণের একমাত্র সহায় ও যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রতি অনুরক্ত হইবে। রুশে যেমন রাজবংশীয় ও অভিজাতবর্গ, প্রাচীন ইংলন্ডে যেমন লার্ট ও ব্যারণগণ, সেইরূপ ব্রিটিশ-ভারতে ইংরেজি শিক্ষিত ভারতবাসিগণ জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া

ও ব্রিটিশ-ভক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, অভেদ্য দুর্গরূপে ব্রিটিশসিংহাসনের চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। রিপণের, হিউমের, কটনের, ওয়েডারবরণ প্রমুখ সমুদায় ভারতবন্ধু ইংরেজের ব্রিটিশ-ভারতের শাসননীতির নিগূঢ় মর্ম্ম ইহাই। এবং ইহাই সনাতন কংগ্রেসী নীতি। আজন্মকাল কংগ্রেস ভারতে ব্রিটিশ-প্রভুশক্তিকে জনগণের আনুকূল্য, স্নেহমমতা ও সহানুভূতির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ব্যাবস্থাপক সভার সংস্কার ও সম্প্রসারণ, রাজকার্য্যে বহুল পরিমাণে উপযুক্ত ভারতবাসীর নিয়োগের প্রার্থনা, ভূরাজস্ব সংস্কারের প্রস্তাব, পুলিশের অত্যাচার অবিচার নিবারণের জন্য বিবিধ নির্দ্ধারিণ, বিচার প্রণালীর সংশোধন— আজি পর্য্যন্ত কংগ্রেস যে কিছু চেষ্টা করিয়াছে, তৎসমুদায়ের লক্ষ্য এক এবং সে লক্ষ্য ব্রিটিশ-শাসনকে কোমল ও সুখবহ করা। কংগ্রেস চিরদিনই সুশাসনের জন্য —Good Government এর জন্য-ব্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু সুশাসন যে রাজব্যবস্থার চরম লক্ষ্য নহে, জাতীয় রাজনীতির চরম আদর্শ কখনো হইতে পারে না— এ ভাব এখনো কংগ্রেসী নেতৃবর্গের প্রাণে জাগিয়া উঠে নাই।

কিন্তু দেশের শিক্ষিত সাধারণের প্রাণে ধীরে ধীরে একথা জাগিয়াছে। অনেকে এখন বুঝিয়াছেন যে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায়, কংগ্রেস যাহাকে সুশাসন বলেন, তাহা মৃত্যুর পথ, অবসাদের পথ, অমৃতের পথ, শক্তির ও জীবনের পথ নহে। জাগতিক সর্ব্ববিধ ব্যাপার ও বিধিব্যবস্থার একটা সনাতন, নিত্য, পারমার্থিক লক্ষ্য আছে। সমাজগঠন ও সমাজবন্ধনের উদ্দেশ্য, বন্ধন নহে, কিন্তু মুক্তি। কারণ আমরা সমাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপন আপন অহংভাবকে সংকুচিত করিয়া চিত্ত শুদ্ধি অভ্যাস করিয়া থাকি। পরিণামে যখন এই সমাজবন্ধনই আত্মার কল্যাণের জন্য আত্মকৃত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তখন আর সে বন্ধন থাকে না, তাহা মোক্ষ-হেতু হইয়া দাঁড়ায়। রাজনীতিরও লক্ষ্য তাহাই। রাজ্য বা রাজশক্তি যে সকল বিধিব্যবস্থা দ্বারা প্রজাগণকে আবদ্ধ করেন, তাহারও লক্ষ্য বন্ধন ও শাসন নহে, কিন্তু চরমে মুক্তি ও পরিণামে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। প্রজা যখন আপনি সজ্ঞানে আত্মবুদ্ধির পরিচালনা, আত্মশক্তির প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া, আপনি আপনাকে রাজবিধির দ্বারা আবদ্ধ করে—তখন রাষ্ট্র বন্ধনও আর বন্ধন থাকে না, মোক্ষহেতু হইয়া দাঁড়ায়। তখন রাজশক্তির পরিচালনায় প্রজার মনুষ্যত্বের হানি হয় না, কিন্তু বৃদ্ধি ও বিকাশই হইয়া থাকে। এই মনুষ্যত্বের বিকাশসাধনের জন্য সর্ব্বদা যে সুকোমল শাসন আবশ্যক, তাহা নহে। প্রত্যুত কোমল শাসনে প্রজাকে মোহাচ্ছন্ন ও অবলাম্বভাব করিয়া, অনেক সময়েই তাহার শক্তি ও বুদ্ধি হরণ করিয়া থাকে। এই জন্য আমাদের

মধ্যে একদল লোক আর এখন ইংরেজের কোমল হস্তের পরামর্শন সুখ-সম্ভোগের জন্য লালায়িত নহেন। কিন্তু তাহার কঠোর মুষ্টির আঘাতে সুষুপ্ত জাতীয় চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিবারই জন্য ব্যস্ত। ইঁহারা সুশাসন চান না, স্বায়ত্ত-শাসন চান।

এতকাল কংগ্রেস সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র ছিল; ইহারা বলিতেছেন যে ইহাকে এখন স্বায়ত্তশাসনের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে সুশাসন পাইতে হইলে,— রাজার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেই হইবে। কারণ শাসনকে ভাল করিবার শক্তি ও অধিকার কেবল রাজারই আছে। শাসনযন্ত্রের অনন্য প্রতিযোগী প্রভু ও চালয়িতা একমাত্র তিনি। স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রজার প্রতি চাহিতে হইবে। প্রজার জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ, প্রজার বাসনাকে প্রজ্বলিত, প্রজার শক্তিকে সংহত ও রাজশক্তির সমক্ষে ও সমকক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই নূতন আদর্শের অনুসরণ করিতে গেলে কংগ্রেসকে এখন রাজদরবার ছাড়িয়া প্রজার পল্লিপথে দাঁড়াইতে হইবে। রাজার অনুকম্পা লাভের বিফল প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া, প্রজার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ভাজন হইবার জন্য স্বদেশসেবায় একাগ্র মনে নিযুক্ত হইতে হইবে। এজন্য কংগ্রেসকে সহর ছাড়িয়া গ্রামে যাইতে হইবে এবং গ্রাম্যজীবনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে, একটা বিরাট প্রজাতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। এরূপ করিলে আবার কংগ্রেসের শক্তি জাগিয়া উঠিবে এবং প্রজাশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, এ শক্তি আর কখনো বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে, কখনো ভাবে, কখনো জ্ঞানে, কখনো ব্যবসা বাণিজ্যে, বা কৃষিশিল্পে, কখনো বা রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রযুক্ত হইয়া এই বিশাল প্রজাশক্তি পরিণামে, আমাদের জাতীয় জীবনের সফলতা সম্পাদন করিবে। কি উপায়ে, কি প্রণালীতে, কোন্ দৈবমন্ত্রে যে প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে ইহার প্রভূত ইঙ্গিত পাইয়াছি। ঐ ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া চলিলে সত্বরেই এ বিষয়ে আমরা কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব। ইহার আর সবিস্তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বুদ্ধিমান লোকে সে পথ দিব্যচক্ষে দেখিতেছে। নির্ব্বোধেরা তাহা কখনো বুঝাইলেও বুঝিবে না। কারণ ব্যক্তিগত মুক্তি সম্বন্ধে যাহা, জাতীয় জীবনের মোক্ষসাধনেও ঐ কথাই সত্য — এ বিষয়ে উপদেশ দেয় এমন লোক অল্প, উপদেশ শুনিয়া বুঝিতে পারে, এমন লোকও অতি অল্প।

আশ্চর্য্য বক্তা দুর্ল্লভশ্চ শ্রোতা,
আশ্চর্য্য শ্রোতা কুশলানুশিষ্ট।

অলমতি বিস্তরেণ— ইতি—

কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি?*

ভারতের মিয়মান বিভিন্ন জাতিগুলি স্বকীয় শক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া স্বাবলম্বন দ্বারা সভ্য জগতে এক বিরাট জীবন্ত জাতিরূপে পরিণত হইবে। ইহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে কংগ্রেসের সৃষ্টি মনে হয়। পরমুখাপেক্ষী হইয়া কখন কোন জাতি, উন্নত হইতে পারে নাই, পারিবেও না. তবে স্বকর্ম্ম দোষে কোন জাতি পতিত হইলে, তাহার সুপ্ত আত্ম-শক্তি পুনরায় জাগ্রত করিতে পরের সাহায্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমরা এতদিনে আত্ম-শক্তি বিস্মৃত হইয়া, জগতে ধিকৃত ও নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, ভগবান আত্ম-প্রতিষ্ঠ স্ববলদৃপ্ত, তেজস্বী জাতির সংস্পর্শে আনিয়া, তাহার ও জগতের বন্দনীয়, অপর বিভিন্ন জাতির উত্থানের সূত্রগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া, যাহাতে আত্ম-নির্ভর মূল মন্ত্র করিয়া আমরা উদ্ধার পাইতে পারি, তাহারই সূচনা করিয়াছেন। কংগ্রেসকে এই জাতীয় উত্থানের অথবা পুনরুত্থানের মূল যন্ত্র করিয়া লইতে হইবে, ইহাই যেন বিধাতার ইঙ্গিত, অনেকের মনেই বোধহয় এই ধারণা জন্মিয়াছে। বাস্তবিক একবিংশতি বৎসর কত আশা করিয়া কত প্রার্থনা, কত যাচ্ঞা, কত নিবেদনই করিলাম! ইহা দ্বারা আমাদিগের কি কিছু উন্নতি হইয়াছে? মানিলাম, টেবিলের প্রান্তগত কুকুরকে, দুই এক সিক্কা রুটীর ন্যায় আমাদিগকেও কিছু দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কি, আমাদিগের কোন রূপ জাতীয় বলবিধানের পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছে? উল্লেখ যোগ্য বিশেষ ত কিছুই দেখি না কেহ হয়ত বলিবেন কেন? ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনয়নের ক্ষমতা পাইয়াছি, তাহা কি কিছুই নহে? আজ পর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি তাহা লাল চুষণী বই কিছুই নহে। ইহাতে জাতীয় বল সঞ্চয়ের কোন উপাদান দেখিতে পাই না। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা যে কোন কালে হইবে তাহারত কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। বরং বিপরীত লক্ষণই দেখিতেছি। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলির একটিতেও ত আজ বিংশতি বৎসর পরীক্ষার পরেও চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইল না। গবর্ণমেন্ট স্বায়ত্ত-শাসনের সুব্যবস্থা করিবেন; এ আশা এখন দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। যদি কোন দিন এ বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী হন, তাহার সুফল তাঁহারা

---

* যদিও মূলে ২ নম্বর দেওয়া নেই, আসলে এই নিবন্ধটি কংগ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিষয়ক প্রশ্নেরই দ্বিতীয় উত্তর। — সংকলন-সম্পাদক

ভোগ করিবেন। তাঁহাদিগের কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে আলোচনা কংগ্রেসের গৌণ কর্ত্তব্য। আমরা কি ভাবে আপনাদিগের মধ্যে স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহারই আলোচনা, তদভিমুখ কার্য্যপ্রণালী নিৰ্দ্ধারিণ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন কংগ্রেসাধিষ্ঠিত সভ্যগণের মুখ্য কর্ত্তব্য।

আত্মপ্রতিষ্ঠার পত্তন করিতে সম্প্রতি স্বদেশী ব্রত, স্বায়ত্তশিক্ষা ও বিচার এবং স্বাধীন জীবিকার সুবিধান সম্বন্ধে কংগ্রেসের নিৰ্দ্ধারিণ আবশ্যক। গত অধিবেশনে স্বদেশী ব্রত সম্বন্ধে কোন মন্তব্য স্থির না করিয়া নেতৃবৃন্দ ভাল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যেমন আমেরিকার কংগ্রেস বিলাতীবর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমাদের কংগ্রেসেও সেই রূপ বিলাতী ও বিদেশী বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করা বিধেয়। জাতীয় মহাসমিতিতে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা হইলে তাহা হইতে যেরূপ জাতীয় শক্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে তদ্রূপ অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন, আমরা কংগ্রেস না করিয়া অন্য কনফারেন্সে ইহা করিব। তাহার উত্তরে বলিতে চাই যে, ভারতবাসী জনসাধারণ কংগ্রেসকেই জাতীয় উত্থানের কেন্দ্র বলিয়া মনে করেন। কোন কন্‌ফারেন্সই তাহার স্থান অধিকাব করিতে পারে না। জাতীয় মহাসমিতি, এই ভাবে এক একটি আদেশ করিবেন, বিভিন্ন প্রদেশ তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিয়া তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ কংগ্রেসের নিকটে প্রত্যেক বৎসর উপস্থিত করিবেন। এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য চলিলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, আশা করি। জাতীয় শিক্ষাবিধান, সালিশী সমিতিগঠন, বিবিধ শিল্প কলা শিক্ষাগারস্থান সম্বন্ধে কংগ্রেস মূল সূত্র নিৰ্দ্ধারিণ করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ী প্রাদেশিক সমিতি থাকিবে, তাঁহারা ঐ সূত্রগুলি তাঁহাদিগের অধীন জিলা সমিতি সহ স্বকীয় অবস্থানুসারে কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন। প্রত্যেক জিলায় এক একটি সমিতি থাকিবে, তাঁহারা তাঁহাদিগের চক্রের মধ্যে সাধ্যানুসারে, তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। তাঁহারা কি কি কার্য্য করিলেন— যথা, কটি গ্রামে সালিশী সমিতি গঠিত হইয়াছে, তদ্দারা কি পরিমাণ বিবাদ মীমাংসা হইয়াছে, কত লোক স্বদেশী ব্রত স্থির অটল ভাবে পালন করিতেছে, স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য কোথায় কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, স্বাধীন জীবিকার উপায় করিবার জন্য কিরূপ কোথায় শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ছাত্র সংখরা কত, কতগুলি বিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভুক্ত হইল, তাহাদিগের কি অবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাদেশিক সমিতিকে অর্দ্ধ বৎসর কি

পূর্ণ বৎসরান্তে জানাইবেন। প্রাদেশিক সমিতি তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রদেশের বিবরণ জাতীয় মহাসমিতির নিকটে উপস্থিত করিবেন। তাঁহারা উহার আলোচনা করিয়া যথা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

গৌণ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাই বলিব যে, যাহা সম্প্রতি আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে, যে যে বিষয়ে গবর্ণমেন্ট ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তাহার মাত্র দুই একটি বিষয়ে কংগ্রেসে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিব। কতকগুলি বিষয় লইয়া বহুসংখ্যক নির্দ্ধারিণ করিলে তদ্বারা কোন্ ফল হইতে পারে না। আমাদিগের সহস্রাধিক কষ্টের কারণ থাকিলে ও মাত্র দুই একটি বিষয় লইয়া জাগ্রত জীবন্ত ভাবে গবর্ণমেন্ট নিকটে উপস্থিত হইলে কিছু ফল হয়ত পাইতে পারি। দেশময় তুমুল আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিয়া, ইহাদিগের নিকটে দুই একটি বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত জন মর্‌লী আমাদিগের নির্জীবতার নাম করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত হইলেন না। যদি মর্‌লী বুঝিতেন যে, বঙ্গ বিভাগ জনিত কষ্টে, ব্যথায়, ক্রোধে বঙ্গদেশ অগ্নিময় হইয়া রহিয়াছে, বিলাতী বর্জ্জনব্রত তীব্র হইতে তীব্রতর ভাব ধারণ করিতেছে, তাহা হইলে কখনও এরূপ উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন না।

এইরূপ আন্দোলন ও স্বাবলম্বন এবং স্বায়ত্ত-শাসনের অনুষ্ঠান করিতে লোকশিক্ষার প্রয়োজন। সাধারণ জনমণ্ডলী যাহাতে উজ্জীবিত ও পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তজ্জন্য কংগ্রেস কিম্বা স্থায়ী প্রাদেশিক সমিতি হইতে প্রচারক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ১৮৯৭ সনে কংগ্রেস হইতে লোকশিক্ষার জন্য প্রচারক নিয়োগের নির্দ্ধারিণ হইল। ১৮৯৮ সনে তাহা পুনবায় আলোচিত হইয়া দৃঢ়তর ভাবে নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু এই সাত বৎসরে তদনুসারে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট কোন পরিচয় পাইতেছি না। স্বদেশের উন্নতি বিধানের জন্য এইরূপ প্রচারক নিয়োগ অপেক্ষা যে গুরুতর কোন কর্ত্তব্য আছে আমি বুঝিতে পারি না। উক্ত প্রস্তাবানুসারে প্রচারক নিযুক্ত হইলে, এই সাত বৎসরে সাধারণ জনমণ্ডলীর কত উন্নতি সাধিত হইত? পরমুখাপেক্ষা আমাদের মজ্জাগত হওয়ায় এতদিন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

প্রচারক নিয়োগ ও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কংগ্রেস ও তদন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির কিরূপ গঠন হইবে তাহার আলোচনা করিতেছি। এই কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক গ্রামে একটি সভা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও উপদেশ আদান-প্রদানের

জন্য মহকুমায় এক একটি সভার প্রয়োজন ও মহকুমার সভাগুলির সাহায্যার্থ জিলার প্রধান নগরে একটি সভা থাকিবে। জিলায় সর্ব্বপ্রধান সভাগুলির সাহায্যার্থ প্রাদেশিক সমিতির উপরে জাতীয় মহাসমিতি থাকিবে। মহকুমার উপনগরের জনসমূহ ও গ্রামস্থ সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া মহকুমা সমিতি গঠিত হইবে। প্রধান নগরের জনসমূহ ও মহকুমা-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জিলা-সমিতি গঠিত হইবে। প্রাদেশিক রাজধানীর জনসমূহ ও বিভিন্ন জেলাসমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া প্রাদেশিক সমিতি স্থাপিত হইবে। বঙ্গদেশ বলিতে অবশ্য অবিভক্তবঙ্গই বুঝিব। কিন্তু জাতীয় মহাসমিতি গঠন করিতে প্রাদেশিক সমিতি ও জেলাসমিতি সভ্য মনোনয়ন করিবেন। প্রাদেশিক, জেলা, মহকুমা ও গ্রাম্য সমিতিগুলি বিশিষ্টরূপে কার্য্যকারিণী সভা হইবে। জাতীয় মহাসমিতি মাত্র ব্যবস্থাদায়িনী ও কার্য্যপর্য্যবেক্ষিকা হইবে বলিয়াই জেলা ও প্রাদেশিক সমিতি উভয়ের পক্ষে সভ্যনির্ব্বাচন বাঞ্ছনীয়। এই সভার মন্ত্রণায় উপদেষ্টা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়েরই সম্মিলন আবশ্যক। তবে জেলার লোকসংখ্যা বিবেচনায় প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির করিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ হয়। এখন যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়, কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশনের পর এরূপ ভাব রক্ষা করা, বোধ হয়, কেহই যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন না। উপরিলিখিত নিয়মে সমিতিগুলি গঠিত হইলে, সভ্যদিগের পদগৌরবের বৃদ্ধি পাইবে এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বত্রই স্বদেশসেবক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই নির্ব্বাচিত হইবেন না।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত

ভাণ্ডার ।। বৈশাখ ১৩১৩

ছাত্রদিগের বিশেষ সুবিধা

দেশের ভবিষ্যত [ভবিষ্যৎ] আশা ও প্রকৃত কর্ম্মী ছাত্রদিগের মধ্যে যাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ভাণ্ডার নামক মাসিক পত্রের বহুল প্রচার হয় তাহার জন্য আমরা ছাত্রদিগকে এই বৎসর ভাণ্ডার ১।।০ দেড় টাকা মূল্যে দিতেছি। এই কারণে অনেকেই ভাণ্ডার গ্রহণ করিতেছেন, আর যাঁহারা ভাণ্ডারের গ্রাহক হইতে অভিলাষী দয়া করিয়া সত্বর হইবেন, কেন না আমরা যাহা ছাপিয়াছি, তাহা প্রায় শেষ হইয়া উঠিয়াছে।

ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূজনীয় সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংখ্যায় "সূত্রধরের [সূত্রধারের] কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"প্রকাশকের মুখে যখন জানিতে পারিলাম, আমাদের এই কাগজটাতে একটা মানসিক সামাজিকতা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, দেশের পাঁচজন ভাবুককে একটি বৈঠকে আমন্ত্রণের উদ্যোগ হইতেছে, তখন কৌতূহলে আমার মন আকৃষ্ট হইল

আমাদের এই কাগজখানি যাহাতে অধিকাংশ লোকের অবসরের উপযোগী হয় ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাণ্ডারের কর্ম্মকর্ত্তা নানা ছোট লেখা সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। সেই সঙ্গে যদি দেশের উপকার হয় সে ত ভালই।...."

আমাদের এই কাগজখানিতে কেবল দেশের কথা ও কাজের কথা অধিক থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

লেখকগণের তালিকায় দেখিবেন, আমাদের দেশের শ্রদ্ধেয় নেতৃগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ইহার লেখক। তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের চিন্তা, পরস্পর বিরোধী উভয় পক্ষের মত যাহাতে সাধারণে প্রকাশ হইয়া একটা ঠিক ধারণা দেশে জন্মিয়া যায়, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রকাশক

৩৭ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন

কলিকাতা

দেশনায়ক*

এবারে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙ্গালী খুব একটা আঘাত পাইয়াছে। সে কথা সকলেই জানেন। ভাতে মারার চেয়ে হাতে মারাটা গুরুতর বলিয়া উপস্থিতমত মনে হয়। আইন কলের রোলারের মত নির্ম্মমভাবে আমাদের অনেক আশা দলন করিতে পারে, কিন্তু পুলিশের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বলিতে কি বুঝায়, সশরীরে তাহার অভিজ্ঞতালাভ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সদাসর্ব্বদা ঘটে না। এবারে অকস্মাৎ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা প্রতিকারের পথ একটা কাজ করিবার ক্ষেত্র না পাইলে, বেদনা নিজের প্রতি উত্তেজনার সমস্ত বেগ আকর্ষণ করিয়া অসংযত হইয়া অপরিমিতরূপে বড় হইয়া উঠে। আমরা জানিতাম, ব্রিটিশরাজ্যে আইন জিনিষটা ধ্রুব—এইজন্য সকল উপদ্রবের উপর আইনের দোহাই পাড়িতাম। কিন্তু আইন স্বয়ং বিচলিত হইয়া উপদ্রবেব আকার ধারণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও মনকে শান্ত করিবার কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্যে তুফান উঠিলে লোকে ডাঙার দিকে ছোটে— কিন্তু ভূমিকম্পে ডাঙা যখন স্বয়ং দুলিতে আরম্ভ করে, যাহাকে অচল বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে যখন চঞ্চল হইতে থাকে, তখনি বিভীষিকা একেবারে বীভৎস হইয়া উঠে।

এইরূপ সাধারণ চঞ্চলতার সময় সৎপরামর্শের সময় নহে। আমিও এই দেশব্যাপী ক্ষোভের সময় স্থিরভাবে মন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। কাল — যিনি নীরব, যিনি বিধাতার সুদৃঢ় দক্ষিণহস্ত, যিনি সকল ফলকে ধৈর্যের সহিত পাকাইতে থাকেন, আমিও নিষ্ঠার সহিত তাঁহারই নিগূঢ় নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু একটি মহান আশ্বাস এই অসময়েও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে কর্তৃপুরুষদের সহিত সংঘাতে বাঙালী জয়ী হইয়াছে। এই সঙ্কটকালে বাঙালী যে বলের পরিচয় দিয়াছে, সেই বলের দৃষ্টান্তই তাহার সম্মুখে স্থিরভাবে ধরিব বলিয়া এই সভাস্থলে আমি অদ্য উপস্থিত হইয়াছি।

সেদিনকার উপদ্রবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নায়কবর্গের অবিচলিত স্থৈর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। যে

* গত ১৫ই বৈশাখ রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাড়ীতে মহাসভায় সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত। [— ভাণ্ডার প্রকাশক]

উৎপাত কোনোমতে আশা করা যায় না, তাহা সহসা মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িলে তখনি মানুষের গভীরতর প্রকৃতি আপনাকে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলে। সেদিন বাঙালী নিজেকে যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের লজ্জার কোনো কারণ ঘটে নাই।

আপনারা সকলেই জানেন, সেদিন সভাপতিকে লইয়া যখন প্রতিনিধি ও সভাসদ্‌গণ মন্ত্রণাসভার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নায়কবর্গের আদেশ অনুসারে যাত্রিগণ কেহ একটি যষ্টিও গ্রহণ করেন নাই। এবং পুলিশ যখন নিরস্ত্র-তাঁহাদের উপর পড়িয়া আঘাত-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনো নায়কদের উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সমস্ত সহ্য করিয়াছেন।

আমি জানি, এ সম্বন্ধে অবিচারের আশঙ্কা আছে।

"তেজস্বিন্যবলিপ্ততা মুখরতা বক্তর্য্যশক্তিঃ স্থিরে" তেজস্বিতাকে অহঙ্কার, বাগ্মিতাকে মুখরতা এবং স্থৈর্য্যকে অশক্তি বলিয়া নিন্দুকে নিন্দা করে। সময়বিশেষে স্থৈর্য্য অশক্তির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যখন তাহা বীর্য্য হইতে প্রসূত হয়, তখন তাহা বীর্য্যের শ্রেষ্ঠলক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। বরিশালে কর্ত্তৃপক্ষ অসংযমের দ্বারা হাস্যকর কাপুরুষতা এবং আমরা স্থৈর্য্যের দ্বারা শক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়াছি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই যে সাময়িক উৎপাতের দ্বারা আত্মবিস্মৃত না হইয়া সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে আমরা উদ্বেল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখিয়াছিলাম, ইহার দ্বারাই আশান্বিত হইয়া উত্তেজনাশান্তির পূর্ব্বেই অদ্যকার সভায় আমি দুই-একটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রকৃতির উপস্থিত চরিতার্থতা সাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি তবে ক্ষণিক উত্তেজনা— ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুড়িয়া মারে, তবে তখনি ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না— কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি, তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোটবড় বহুতর

বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না— তবে ক্ষণে ক্ষণে এক একটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে,— যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্ম্মণ্যের এক প্রকার আত্মবিনোদন। আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে "বয়কট্" শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সঙ্কোচজনক কথা আর নাই। বয়কট্ দুর্ব্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্ব্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভাল করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভাল করিতে বসিয়াছি, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈস্বরে বলিতে শুনিয়াছি— "আমরা য়ুনিভার্সিটিকে বয়কট্ করিব?" কেন করিব? য়ুনিভার্সিটি যদি ভাল জিনিষ হয়,তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারো নাই। যদি য়ুনিভার্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্টফল দান না করে, তবে তাহাকে বর্জ্জন করাকে বয়কট্ করা বলে না। যে মনিব বেতন দেয় না, তাহার কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়াকে বয়কট্ করা বলে না। কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৈর্য্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন; জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ— তাহার পর সংগ্রহ কার্য্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে। দেশের কাজে রাগারাগিটা কখনই লক্ষ্য হইতে পারে না। দেশের কাজের মাহাত্ম্য যদি আমরা মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, তবে তাহারই উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনা আমরা উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যপথে স্থির থাকিতে পারিব।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট্ তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্যোগের আহ্বান মাত্রে দেশ এক মুহূর্ত্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জ্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না; জগতে কার্জ্জন এত-বড় লোক নহে; এই আহ্বান দেশের শুভবুদ্ধির সিংহদ্বারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এত দ্রুত এমন সমাদর পাইয়াছে। আজ আমরা

দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয়, তবে দেশের কাপড়ের এত বড় অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।

আরও লজ্জার কারণ এই যে, বয়কটের মধ্যে আমরা যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছি, সেই স্পর্দ্ধার শক্তিটা কোথায় অবস্থিত? সে কি আমাদের নিজের গায়ের জোরে, না ইংরেজশাসনতন্ত্রের ক্ষমাগুণে! যখনি সেই ক্ষমাগুণের লেশমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখি, যখনি মানবধর্ম্মবশত স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালীর আক্রোশ আইনের বেড়ার কোনো একটা অংশ একটুমাত্র আল্‌গা করিয়া ফেলে, অমনি আমরা বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি এবং তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করিয়া দিই যে, পরের ধৈর্য্যের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই আমরা পরকে উদ্বেজিত করিতেছিলাম। আমাদের স্পর্দ্ধা যদি যথার্থ আমাদেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইত, তবে অপরপক্ষের স্বাভাবিক রোষ এবং শাসনের কাঠিন্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম, তবে উদ্যতমুষ্টি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা মিন্টো-মর্লির দোহাই পাড়িতে ও আদালতের আব্‌দার কাড়িতে ছুটিতাম না।

এ কথা মানিতেই হয় যে, স্বভাবের নিয়মে স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সক্ষমের ক্রোধ কোনো-না-কোনো উপায়ে হিংসার আকার ধারণ করে। যদি আমরা ইংরেজকে বলি, "তোমাকে জব্দ করিবার জন্যই আমরা দেশের ভাল করিতেছি" এবং তার পরে ইংরেজ রক্তচক্ষু হইবামাত্র বলি, "বাঃ আমরা দেশের ভাল করিতেছি, তোমরা রাগ করিতেছ কেন," তবে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হয়।

জব্দ করিতে পারার একটা সুখ আছে, সন্দেহ নাই— কিন্তু দেশের ভাল করিতে পারার সুখ যদি তাহার চেয়ে বড় হয়, তবে তাহারই খাতির রাখিতে হয়। আমরা বয়কট্ করিয়াই দেশীকাপড় চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা বলিবামাত্র দেশীকাপড় চালানো বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে, সুতরাং জব্দ করিবার সুখভোগ করিতে গিয়া ভাল করিবার সুখ খর্ব্ব করিতে হয়। দেশীকাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ কথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার, তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিকাল্ আখ্‌ড়ায় টানিয়া আনিতে হয়; ইংরেজ তখন এই উদ্যোগকে কেবল নিজের দেশের তাঁতীর লোকসান বলিয়া দেখে, তাহা নয়, এই হারজিতের ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল্ সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে ফল হয় এই যে, নিজের দুর্ব্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আমরা স্বদেশের

হিতকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই। আমাদের দেশে ত অন্তরে-বাহিরে, নিজের চরিত্রে ও পরের প্রতিকূলতায় বিঘ্ন ভূরিভূরি আছে, তাহার পরে আস্ফালন করিয়া নূতন বিঘ্নকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আনিব, এত বড় অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়ের উপযুক্ত সঞ্চয় যে আমাদের কোথায় আছে তাহার সন্ধান ত আমি জানি না।

বড়-বড় স্বাধীনজাতিকেও বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়— শুদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। স্বজাতির মঙ্গল সম্বন্ধে যাহাদের দায়িত্ববোধ আছে, তাহারা তেজস্বী হইলেও অনেক লাঙ্গুলমর্দ্দন বিনম্রফণায় নিঃশব্দে স্বীকার করে— ইংলন্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। জাপান চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হইয়াও রাশিয়ার চক্রান্তে লড়াইয়ের ফল যখন ভোগ করিতে পারে নাই, তখন চুপ করিয়া ছিল— আজ রাশিয়াকে পরাস্ত করিয়াও বন্ধুদের মধ্যস্থতায় যখন রক্তপাতের পুরামূল্য আদায় করিতে পারিল না, তখন হাস্যমুখে বন্ধুগণকে ধন্যবাদ জানাইল। কেন? ইহার কারণ, অসহিষ্ণু হইয়া তেজ দেখাইতে যাওয়াই দুর্ব্বলতা, দেশের মঙ্গলকে শিবোধার্য্য করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকাই যথার্থ বীরত্ব। যদি ইংলন্ড, ফ্রান্স জাপানের পক্ষে এ কথা সত্য হয়, যদি তাহারা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিয়া উন্নতির যাত্রাপথে স্বজাতির বোঝা বাড়াইয়া তুলিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হয়, তবে আমাদের এই অতিক্ষুদ্র কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল কথায়-কথায় সশব্দে তাল ঠুকিয়া বেড়ানই কি আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? যথাসাধ্য মৌন থাকিয়া,— স্তব্ধ থাকিয়া আমাদের চলিবার পথের বিপুলকায় বিঘ্নদৈত্যগুলিকে নিদ্রিত রাখাই কি আমাদের কর্ত্তব্য হইবে না? অবশ্য, কারণ ঘটিলে ক্ষোভ অনুভব না করিয়া থাকা যায় না— কিন্তু অসময়ে অকিঞ্চিৎকরভাবে সেই ক্ষোভের অপব্যয় করা না করা আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত।

একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দিরভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মত এমন কঠোর সত্য— এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কি আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না— তাহাকে ফাঁকি দিবার জো কি, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশ মাত্র নাই— সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণকঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত

করিয়া না থাকে তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে। যাহা খাঁটি নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন? ইংরেজজাত যে, এ সম্বন্ধে জহুরী, তাহাকে ফাঁকি দিবেন কি করিয়া? আমাদের দেশহিতৈষণার উদ্যোগ তাহাদের কাছে শ্রদ্ধালাভ করিবে কি উপায়ে? আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবী করিতে পারি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, কে আমরা কি করিয়াছি? দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদের মধ্যে যাহাদের সুখের সম্বল আছে, তাহারা সুখেই আছি; যাহাদের অবকাশ আছে, তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই,— ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আর্ত্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশ-সেবার চর্চ্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর— হয় বিধাতা, নয় গবর্ণমেন্ট, করিবেন, এই ধারণাকেই আমরা সর্ব্ব-উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমরা যে দলবদ্ধ,— প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারি, এ কথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশের দুঃখের সঙ্গে আমাদের চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশানুরাগ বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না— সেই জন্যই চাঁদার খাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারো সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক কুড়ি বৎসর হইল, প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়িতে ছাত্র সম্মিলন উপলক্ষ্যে যে গান রচিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি ঃ—

মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।
পরের পায়ে ধরে' মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে' পরের পিছুপিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও
প্রাণ আগে কর দান।

সেদিন হইতে কুড়ি বৎসবের পরবর্ত্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহ বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের থালা নামাইযা ত হাত খোলাসা করিয়াছি, আজ ত আমরা নিজের কাজ নিজে করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি ত ভালই, কিন্তু পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি— যেখানে অভিমান আছে, সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবী রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মত বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদিগকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই, কথায়-কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে কেন! আমরা কেন মনে করি, শত্রু-মিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে সুদুস্তব, একথা জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ—

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কেবল কি আমরাই— এই দুরত্যয় পথ যদি অপরে সহজ করিয়া, সমান করিয়া না দেয়— তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব— এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, তবে আমরা নিজের তাঁতের কাপড় নিজে পরিব, নিজের বিদ্যালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব! এ সমস্ত কি অভিমানের কথা!

আমি জিজ্ঞাসা করি সর্ব্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারো কি অভিমান মনে আসে— মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারো কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে! আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে সুরু করিয়াছি! আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না,— আমরা সত্যই মরিতেছি। যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্রলোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না, তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ

হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ্ এক রাত্রির অতিথির মত আসিল, তার পরে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্ত পিপাসার নিবৃত্তি হইল না। যে বাঘ একবার মনুষ্যমাংসের স্বাদ পাইয়াছে, সে যেমন কোনোমতে এই প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, দুর্ভিক্ষ তেম্‌নি করিয়া বারংবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈবদুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব? সমস্ত দেশের উপরে মৃত্যুর এই যে অবিচ্ছিন্ন জাল নিক্ষেপ দেখিতেছি ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি।

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বদ্ধমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এম্‌নি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে— আমরাও যে দেশব্যাপী মৃত্যুর আক্রমণ হইতে বিনা চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব, এমন ত কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যে, যেসব জাতি সুস্থ সবল, তাহারাও প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিক্ষণে লড়াই করিতেছে— আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে মৃত্যুর পুনঃপুনঃ নখরাঘাতসত্ত্বেও বিনা প্রয়াসে বাঁচিয়া থাকিব?

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ্-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র— মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম— আমাদের হাটে, বাটে, গ্রামে, পল্লীতে আমরা একভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনো আমরা সম্পূর্ণ আপোস করিয়া লইতে পারি নাই— এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে সকল জাতি মরিয়াছে, তাহারা এম্‌নি করিয়াই মরিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে, এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা দেশ— বন-জঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্ব্বে বেশিই ছিল এবং কোনদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়— সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত মারীশত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্দ্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের জন্য কাহারো

অপেক্ষা করিতে হইত না— পল্লীর ধর্ম্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল এবং পানীর জল যখন শোচনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কি? এইরূপে প্লেগও সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে— কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালীযোগে অন্ন বাহিবের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে— আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইযাছিলাম তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্ল্লভ, ঘি দুর্ম্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব্ব-অভ্যাস-বশত সরিষাব তেল বলিযা নিজেকে সান্ত্বনা দিই— তা ছাড়া, যেখানে জলকষ্ট, সেখানে মাছের প্রাচুর্য্য নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিঙ্কোনা সস্তা হইযাছে। এইরূপে একদিনে নহে, দিনে দিনে সমস্ত দেশের জীবনীশক্তির মূলসঞ্চয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয হইয়া যাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তখনো শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন যে মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিত্য হইয়া উঠে— আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া, প্লেগ, ওলাউঠা, দুর্ভিক্ষ একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনোকালে তাহাদের দেনা শোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে, আমাদের ঘরবাড়ীতে নিত্য হইয়া বসিয়াছে। বিনাশ যে এম্‌নি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না?

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভায় দুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি ত কর, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে? ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিশের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ইতিমধ্যে চোখের সাম্‌নে যখন স্ত্রী-পুত্র পুড়িয়া মরিবে, তখন দারোগার শৈথিল্য সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিবার জন্য বিরাট্ সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করা যায়? আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি। আমরা যে মরিতেছি। আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা

করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি, তাহাই করিবার জন্য এখনি আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে, সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই— চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারো দ্বারা কোনোদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কখনই সত্য নহে এবং নিজের পাপেব প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব ইহাও কোনোমতে আশা করিতে পারি না

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানাস্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে,—'কি করিব, কেমন করিয়া করিব?' আজ আমরা কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হইতেছি— এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদিগকে সেই দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ইষ্টিম্ উচ্চস্বরে বাঁশী বাজাইবার জন্য হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্যই হইয়াছে। বাঁশী বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড় করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে— কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। একথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি* সেও বেশিদিনের কথা নহে।, সেই অল্পদিনের মধ্যে সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তখনো আমরা কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার জন্য মনের মধ্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এইজন্য তখনো আমরা তর্কবিতর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজাল ছেদন করিয়া প্রশস্ত কর্ম্মপথে মুক্তিলাভ করিবার জন্য

* 'এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই'—বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ মাত্র বছর দেড়েক আগে, ভাদ্র ১৩১১-য় রচিত *স্বদেশী সমাজ* প্রবন্ধে। *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত ওই প্রবন্ধ অবিলম্বে *আত্মশক্তি* (১৩১২) গ্রন্থে স্থান পায়। — **সংকলন-সম্পাদক**

কোনো অভাব অনুভব করি নাই। তখনো ডিবেটিং সোসাইটির দ্বারাতেই দেশের কাজ চালানো যায়, এইরূপ একটা বাল্যসংস্কার আমাদের মনে ছিল। আজ কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে উদ্যত হইয়াছি; আজ এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্তত একটুও বুঝিয়াছি যে, দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদ বিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্ব স্ব কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

অল্পকাল পূর্ব্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন প্রথম জোয়ার আসিয়াছিল, তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারিদিকে "নেতা" "নেতা" "নেতা" রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত সুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মত সাহিত্য-রসবিহ্বল অকর্ম্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিতান্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের তখন এমনি বিপদেব দিন গেছে যে, "আমি নেতা নই" বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠগড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দ্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।

হঠাৎ সমস্ত দেশের এইরূপ উৎকট 'নেতা' বায়ুগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে, কাজের হাওয়া দিবামাত্রই স্বভাবের নিয়মে সর্বপ্রথমে নেতাকে ডাক পড়িবেই। সে ডাকে প্রথম ধাক্কায় বাজারে ছোট-বড় ঝুঁটা-খাঁটি বহুবিধ নেতার আমদানি হয় এবং লোকে প্রাণের গরজে বিচার করিবার সময় পায় না,— নেতা লইয়া টানাটানি-কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে করিয়া অনেক মিথ্যার,— অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আসল সত্যটুকু এই যে, আমাদের নিতান্তই নেতা চাই— নহিলে আমাদের আশা-উদ্যম-আকাঙক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক্, একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভার সভাপতিকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন "নেতা নেতা" করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্ব্বার সর্ব্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ সম্বন্ধে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও

অবশেষে যাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে, তাঁহার পরিচয় অদ্য যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জানি, এই সভাস্থলে, দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ম্বরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান— আজ বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মত বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আজ আহ্বান করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন ইংরেজি-শিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন— সেই বন্দরের নাম রাজপ্রসাদ। সেখানে আছে সবই— লোকে যাহা কিছু কামনা করিতে পারে, অন্নবস্ত্র-পদমান সমস্তই রাজভাণ্ডারে বোঝাই করা রহিয়াছে। আমরা ফর্দ্দ ধরিয়া ধরিয়া উচ্চস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম— ডাঙা হইতে উত্তর আসিল, "এস না, তোমরা নামিয়া আসিয়া লইয়া যাও।" কিন্তু আমাদের নামিবার ঘাট নাই; আর আর সমস্ত বড়-বড় জাহাজে পথ আটক করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এক ইঞ্চি নড়িতে চায় না। এদিকে ফর্দ্দ আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের গলা ভাঙিয়া গেল— দিন অবসান হইয়া আসিল। কখনো বা রাগ করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি, কখনো বা চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেহ নিষেধও করে না, কেহ পথও ছাড়ে না; বাধাও নাই, সুবিধাও নাই। আর-আর সকলে দিব্য কেনা-বেচা করিয়া যাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, আলো জ্বলিতেছে, ব্যাণ্ড্ বাজিতেছে। আমরা সন্ধ্যাকাশের অবিচলিত নক্ষত্ররাজি ও রাজবাতায়নের অনিমেষ দীপমালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে আমাদের "দরিদ্রানাং মনোরথাঃ' অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম।

এইভাবে কতদিন কত বৎসর কাটিত, তাহা বলিতে পারি না। এমনসময় এই নিঃসহ নিশ্চলতার মধ্যে বিধাতার কৃপায় পশ্চিম আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড়-রকম ঝড়

উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পূবের মুখে হু হু করিয়া ছুটাইয়া চলিল— অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম, সে যে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যান্ড্ বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে হুলুধ্বনি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এতদিন অভুক্ত থাকিয়া পরের পাকশালা হইতে কেবল বড়-বড় ভোজের গন্ধটা পাইতেছিলাম, আজ যে দেখিতে দেখিতে সম্মুখে পাত পাড়িয়া দিল। আমরা জানিতাম না, এ যজ্ঞে আমাদের মাতা আমাদের জন্য এতদিন সজলচক্ষে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনিই আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে সুরেন্দ্রনাথের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আপন কোলের দিকে টানিয়াছেন। আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিমবন্দরের শাদা-পাথরে-বাঁধানো সোনার দ্বীপে এমন সুস্নিগ্ধ সার্থকতা একদিনের জন্যও লাভ করিয়াছেন?— এমন আশাপবিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন?

বিধাতার কৃপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহার নাম আত্মশক্তি। এইখানে যদি আমরা কেনাবেচা করিতে পারিলাম, ত পারিলাম— নতুবা অতলস্পর্শ লবণাম্বুগর্ভে ডুবিয়া মরাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় হইবে। কাপ্তেন্, এখানকার প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে আমাদের বিস্তর লেনাদেনা করিবার আছে— শিক্ষাদীক্ষা, সুখস্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, সমস্ত আমাদিগকে বোঝাই করিয়া লইতে হইবে— এবারে আর সেই রাজ-অট্টালিকার শূন্যগর্ভ গুম্বজটার দিকে এক দৃষ্টিতে দূরবীণ কষিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা আজ যে-যাহার ছোটখাট মূলধন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি— এবারে আর বাঁধাবন্দরে পুনঃপুনঃ বন্দনাগীত গাওয়া নয়,— এবার পাহাড় বাঁচাইয়া, ঝড় কাটাইয়া আমাদিগকে পার করিতে হইবে কাপ্তেন্— তোমার উপরে অনেকের ভরসা আছে— হাল ধরিয়া তোমার হাত শক্ত, ঢেউ খাইয়া তোমার হাড় পাকিয়াছে। এতদিন যে নামের দোহাই পাড়িতে পাড়িতে দিন কাটিয়া গেল, সে নাম ছাড়িয়া আজ যথার্থ কাজের পথে পাড়ি দিবার বেলায় ঈশ্বরের নাম কর, আমরাও এককণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে তোমার চতুর্দ্দিকে সম্মিলিত হই।

আজ অনুনয় সহকারে আমার দেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না— কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গলসাধনের গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন বাংলার পার্টিশন্‌টা আজ খুব একটা বড় ব্যাপার নহে। আমরা তাহাকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোট করিয়াছি? এই পার্টিশনের আঘাত উপলক্ষ্যে আমরা সমস্ত বাঙালী মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেম্‌নি ফিরিয়া চাহিলাম, অম্‌নি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল। আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া স্বহস্তে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে! কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন্‌ ও প্রোটেষ্ট্‌, বয়কট্‌ ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশন্‌ই বৃহৎ হইয়া উঠিত,— আমরা ক্ষুদ্র হইতাম,—পরাভূত হইতাম। কার্লাইলের শিক্ষাসার্ক্যুলর আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে! আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি করিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে ত তাহাকে বড় করা হইত। আজ আমরা নিজেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি— ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ, আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা সকল ক্ষতি, সকল লাঞ্ছনার উপরে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ঐ লইয়া যদি আজ পর্য্যন্ত কেবলি বিরাট্‌ সভার বিরাট্‌ ব্যর্থতায় দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সানুনাসিক নালিশকে সমুদ্রের এপার হইতে সমুদ্রের ওপার পর্য্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটকে ক্রমাগতই বড় করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহার কাছে নিতান্ত ছোট হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদের গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়— আমাদের সুরেন্দ্রনাথকে রাজ-অট্টালিকার তোরণদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহাকে আমাদের কুটীরপ্রাঙ্গণের পুণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিনযাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না— তাহার চেয়ে উপরে উঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনস্বীর কর্ত্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত, গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন কবে আমাদের কার সহিত কি

ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কিনা, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের ফলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না ফেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই— তাহা ঈশ্বরদত্ত— স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন্ পরিয়া বিচার করুন, কখনো বা অনুকূল কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারো নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি, তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্ত্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ কবি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা! মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল— সমস্ত স্বার্থসঙ্কোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না,— কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন!

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের কর্ত্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশ-সেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ কর। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই— তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজেব যে শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অদ্য আমরা শান্তসমাহিত পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে প্রত্যেকে স্বস্ব প্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া প্রত্যেকের হস্ত করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশের এই

মঙ্গল-মহাসনে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক করি। জানি, এরূপ কোনো প্রস্তাব কখনই সর্ব্ববাদিসম্মত হইতেই পারে না, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে, তাহার বেশি আর কিছুই হইবে না। যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহারা এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত ক্ষুদ্রবন্ধন হইতে মুক্ত করুন, তাহাকে দেশনায়কের উপযুক্ত গৌরবরক্ষার সামর্থ্য দিন, সকলের যোগ্যতা মিলিত করিয়া তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়া তুলুন।

যাঁহারা পিটিশন্ বা প্রোটেষ্ট্, প্রণয় বা কলহ্ করিবার জন্য রাজবাড়ীর বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল রাজপথের শুষ্কবালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানি। ইহাও দেখিয়াছি, মৎস্যবিরল জলে যাহারা ছিপ ফেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের, মাছ পাওয়া নয়, ঐ আশা করিয়া থাকাই, একটা নেশা হইয়া যায়, ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পরে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্য সুরেন্দ্রনাথকে আমি দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার দেশের প্রতিনিধি; দেশের অভিপ্রায় অনুসারেই তিনি দেশকে চালনা করিয়াছেন। দেশের যদি মোহ্ ভাঙিত, দেশের আকাঙক্ষা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত, তবে তিনিও নিশ্চয় তাহাকে সেই দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধ পথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কি, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্ত্তব্য চালনা করা,— ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রম-সংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর—বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল্ অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি— নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব মোচন হইয়াছে। কখনই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারম্বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়, তেম্‌নি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে,

নহিলে তাহাব জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারম্বার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন— গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায়, সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিযা অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটী সম্পূর্ণ বুঝিবাব জন্য বহুদিনের বিফলতা গুরুব মত কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন যাহাবা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে— আর যাহারা ঘরে পড়িযা থাকে, তাহাবা বাটেরও নয মাঠেরও নয়, তাহাবা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও সকল আশার,—সকল সদ্‌গতির বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথেব সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম কবিবাব জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকাব করিয়া দৃঢ় নিয়মেব অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত কবিতে হইবে,— নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণেব এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

যাঁহারা সাধক, যাঁহারা দেশের গুরু, তাঁহারা খ্যাতি প্রতিপত্তির অপেক্ষা না রাখিযা, বিবোধ-অবমাননার আশঙ্কা স্বীকাব করিযাও দেশের মতি ফিবাইতে চেষ্টা করিবেন— আব যাঁহারা দেশের নায়ক, তাঁহারা দেশকে গতিদান করিবেন। যে সকল জাতি স্থির হইযা বসিয়া নাই, যাহারা চলিতেছে, তাহারা এইভাবেই চলিতেছে। এক দল উপর হইতে তাহাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছে, আর এক দল বক্ষের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রাণশক্তি-গতিশক্তিকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। এই উভয় দলের পরস্পরে অনেক সময়েই একমত হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা চালাইতেছে, তাহাদিগকে বসিয়া থাকিলে চলে না। কারণ, শিক্ষা শুধু উপদেশে নহে, চলার মধ্যেই শিক্ষা আছে।

অতএব এতদিন যে সুরেন্দ্রনাথ বিনা নিয়োগে নিজের ক্ষমতাবলেই দেশকে সাধারণহিতের পথে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে নিয়োগপত্র দিয়া নায়কপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। নিয়োগপত্র দিলে তাঁহার ক্ষমতা সুনিশ্চিত এবং তাঁহার দায়িত্ব গভীরতর হইবে এবং তিনি কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংরেজি বিদ্যার অভ্যস্ত বুলির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া

আমাদের এই পুরাতন দেশের চিরন্তন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেন— যে সকল পদার্থ পরদেশের সজীব কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথাস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে এদেশে যাহা অসঙ্গত-আবর্জ্জনারূপে গণ্য হইবে, অনুকরণের মোহে তাহাকে তিনি আদর করিবেন না,— বিরোধমূলক যে সংগ্রামশীলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বভাবগত, যাহা কখনই এদেশের মৃত্তিকায় মূলবিস্তার করিয়া ফলবান্ হইবে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মঙ্গলময় মিলনপরতা, যে অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তাহাকেই বর্ত্তমানকালের অবস্থান্তরের সহিত তিনি সঙ্গত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন না করিবেন, এস্থলে তাহা অনুমান ও আলোচনা করা বৃথা— কেবল ইহাই সত্য যে, তাঁহার করার মধ্যে আমাদেরই কর্ম্ম প্রকাশ পাইবে, দেশ তাঁহারই মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবে, তাঁহারই একহস্ত দ্বারা নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করিবে ও তাঁহারই অন্য হস্ত দ্বারা নিজের দান বিতরণ করিবে— ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে, সত্যকে লঙঘন না করিলে ইঁহার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করিব না এবং এই নিয়ম ও নিয়ন্তাকে স্বেচ্ছাকৃত সুতরাং অলঙঘ্য বাধ্যতাসহকারে মান্য করাই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আত্মসম্মান বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সমস্ত বলক্ষয়কর দ্বিধা ও সমস্ত আত্মাভিমানের কুশকণ্টক সবলে উৎপাটিত করিয়া যদি একের মধ্যে আমরা আমাদিগকে নিবিড়ভাবে একত্র করিতে পারি. তবে আর আমাদিগকে নিজের শক্তির অহঙ্কার করিবার জন্য সর্ব্বদা আস্ফালন করিতে হইবে না, পরের বিমুখতাকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে অত্যুক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে না— তবেই আমরা শান্তভাবে বলিষ্ঠ, ও ধীরভাবে মহৎ হইতে পারিব এবং নিজের দেশের মধ্যে নিজের যথার্থ স্থানটি অধিকার করিয়া কর্ম্মগৌরবের মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া পোলিটিকাল্ ধনুষ্টঙ্কারের অত্যুগ্র আক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইব— আমরা সুস্থ হইব, স্বাভাবিক হইব, সংযত-আত্মসংবৃত হইব এবং নিজের চাপল্যবিহীন মর্য্যাদার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরের উপেক্ষাকে অকাতরে উপেক্ষা করিতে পারিব।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ নেতাদের উপর বরিশালে পুলিশি জুলুম উপলক্ষে লিখিত এই বক্তৃতা *বঙ্গদর্শন* প্রত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল পরের মাসেই (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩)। প্রচারিত হয় আলাদা একটি পুস্তিকার চেহারাতেও। পরে *সমূহ*-তে গ্রন্থিত হওয়ার সময় লেখাটি থেকে সুরেন্দ্রনাথের নাম ও নানা গুণকীর্তন বাদ পড়েছে। —**সংকলন-সম্পাদক**

ভাণ্ডার ।। আষাঢ় ১৩১৩

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন স্বার্থবিরোধ আছে কি না?

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রশ্নেব উত্তব অতি সহজ বলিযা বোধ হয। কাবণ এক্ষণে হিন্দু বা মুসলমান এদেশেব বাজা নহে। ইংবাজ রাজা, ও তাঁহাদিগেব অধীনে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই প্রজা। রাজ্যের শাসনকার্য্য পবিচালন সম্বন্ধে উভযেবই ক্ষমতা বা ক্ষমতার অভাব একই প্রকারের। কে ভাবতে বাজনীতি ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, তৎসম্বন্ধে উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কোনও প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই এবং হইবাবও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোক শীর্ষস্থানীয় হইয়া স্বীকৃত বিধি বা আইন দ্বারা অপর সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি করিতে একেবারেই অক্ষম। সুতবাং একরূপভাবে দেখিলে, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বা তদুত্তরে বিশেষ কোনও জটিলতা দেখা যায় না।

কিন্তু ভারতে হিন্দু, মুসলমানদিগকে লইয়া রাজনীতি শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থ কি বুঝায় দেখা যাউক। ইংলন্ডে বা ইউবোপের অপরাপর দেশে এ শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝা যায়— এ দেশে কি সেরূপই বুঝিতে হইবে? ঐ সকল দেশে শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণোপলক্ষে দলাদলি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাজ বা জাতিগত পার্থক্য বা কর্ত্তৃত্ব লইয়া নহে— সমাজ বা শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সমগ্র দেশের বা সমাজের উপকারকল্পে দেশের লোকের মত গঠন করিবার চেষ্টায়। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি কোনও দল কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যতদিন দেশের লোকে সেই দলের মতে মত দিয়া কার্য্য করিবে ততদিন সেই দল দেশশাসনকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব কবিতে থাকিবে। এইসকল দলের

মতামতে এমন কিছুই নাই, যাহাতে সমগ্রদেশের জাতীয়তারক্ষার কোনোরূপ প্রত্যবায় ঘটিতে পারে। দল থাকিলেও প্রায় সকল দলই একভবে সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেছে যে, কিসে জাতীয়তা রক্ষা হইবে। এই সকল দলের পরস্পর বিরোধের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ এই টুকু যে, যদি কোনো দল শাসন কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে নিজ দলকে কর্ত্তৃত্বপদে সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইলাম বলিয়া মনে করে। এবং সেই দলস্থিত কর্ত্তৃপক্ষগণ শাসনকার্য্য পরিচালন কার্য্যে পদলাভ করিয়া নিজ নিজ পারিশ্রমিক স্বরূপ বেতন গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধভাবের মধ্যে কোনারূপ মৌলিক পার্থক্য নাই। যদি ইংলন্ডের কথা পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে দেশের ধর্ম্ম, সমাজগঠন বা আচার ব্যবহারাদি প্রায় একইরূপ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা সাম্প্রদায়িকতা আছে বটে, কিন্তু সে সাম্প্রদায়িকতা এক ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণের সাম্প্রদায়িক ভাব মাত্র। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সাম্প্রদায়িক বা বৈরীভাব নহে। আমাদিগের দেশে হিন্দুসমাজে শাক্ত বা বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পরের সাম্প্রদায়িক ভাব পর্য্যালোচনা করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহা যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় ইংলন্ডের খৃষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব অনেকটা সেইরূপ মনে করিতে হইবে। কিন্তু সেরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা জাতি বা সমাজ রক্ষা বিষয়ে কোনোরূপ ইতর বিশেষ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল দেশে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মসাধনপ্রণালী বা অপরাপর বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও জাতীয়তা রক্ষা বিষয়ে সকলে এক প্রাণ হইয়া উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে।

কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি প্রখর করিয়া তুলিলে এক ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যেই বিবাদ, কলহ, এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহাদি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া সমাজ ছিন্ন ভিন্ন ও জাতীয় ভাব খণ্ডীকৃত হইয়া যায়। শিয়া, সুন্নিকে মুসলমান ভাই বলিয়া ভাবিতেও পারেন— আবার অতীতকালের ঘটনা স্মরণপূর্ব্বক বৈরীভাবের উদ্দীপনা করিয়া একের বিরুদ্ধে অপর সমরসজ্জায় সজ্জিতও হইতে পারেন। ইংলন্ডেই অতীত কালে রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্টান্ট ও পিয়ুরিটান সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ বা বৈরভাবাপন্ন হইয়া পড়াতে কি না হইয়া গিয়াছে! কিন্তু সেই সকল সম্প্রদায়ই আবার আজকাল শান্তভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবলম্বিত পথ অনুসরণ পূর্ব্বক সকলেই দেশের মঙ্গলের জন্য মন -প্রাণ সমর্পণ করিয়া কেবল যে জাতীয়তা

রক্ষা করিয়া যাইতেছে এমন নহে, জাতীয় ভাব এরূপ প্রবল করিয়া তুলিয়াছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কিন্তু অনেকে এরূপ বলিতে পা'রেন যে, ইংলন্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র বিভিন্ন প্রকৃতির। ভারতে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য বিভিন্ন প্রকারে গঠিত ধর্ম্ম ও সমাজগত। সুতরাং সে পার্থক্য মৌলিক পার্থক্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি এক ধর্ম্মাবলম্বীগণ [...] বিশ্বাস হেতু স্বীয় ধর্ম্মের রক্ষা, প্রচার বা শ্রীবৃদ্ধি করিতে যান, তাই হইতে স্বতই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের সহিত নানা প্রকারে স্বার্থবিরোধ আসিয়া পড়ে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধহয় যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এরূপ স্বার্থবিরোধ আসিয়া পড়া সম্ভব নহে। কারণ প্রথমতঃ, এক্ষণে যে রাজশাসনাধীনে আমরা দিনপাত করিতেছি, সে শাসন যতদিন বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোনো ধর্ম্মাবলম্বীগণ নিজধর্ম্মপ্রচার বা বদ্ধমূল করিতে যাইয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণের স্বার্থের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবে না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্যে ক্রমশঃ এরূপ বিশ্বজনীন ভাব আসিয়া পড়িতেছে যে, তাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতার ভাব অতি শীঘ্রই অপসৃত হইয়া যাইতেছে। তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বাপেক্ষা আমরা যতই নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পরিতেছি, ততই দেখিতেছি যে, সঙ্কীর্ণতাভিত্তির উপর কোন ধর্ম্মই স্থাপিত নহে। হিন্দুধর্ম্মমতে সাধনার চরম অবস্থা "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"। যখন ভাবে, ধ্যানে ও কার্য্যে আমিত্বের প্রসার হইয়া লোকে সর্ব্বভূতে পরমাত্মার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে তখনই হিন্দুধর্ম্মমতে হিন্দুভাবের পূর্ণ বিকাশ হইবে ও হিন্দুর ধর্ম্মসাধনার সিদ্ধিলাভ হইবে। মুসলমান পণ্ডিতগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে মুসলমান ধর্ম্মেরও চরম উদ্দেশ্য তাহাই। কেবল দেশকালপাত্রভেদে ধর্ম্মপ্রণালী ও ধর্ম্মসাধনার বাহ্য আকার কতকটা বিভিন্ন প্রকারের। আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষা যতই প্রশস্ততা লাভ করিতেছে, ততই আমরা দেখিতেছি যে, বাহ্য আচারাদি উভয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কাহারও মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অন্তর্নিহিত গূঢ়ভাব উভয় সম্প্রদায়েরই এক প্রকার। হিন্দুদিগের গীতা বলিতেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"।

আমার বিশ্বাস যে, যদি আরবী জানিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শ্লোকের

অনুরূপ শ্লোক বা বচন মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহরম বা বকরাইদের সময় উভয়ের মধ্যে সময় সময় যে দাঙ্গা উপস্থিত হয় তাহা ধর্ম্মের জন্য নহে। তাহা শুদ্ধ ধর্ম্মের নামে গুণ্ডামির ফল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মসাধনার প্রণালী সম্বন্ধে পার্থক্য ধরিয়া যদি তিলকে তাল করিয়া তোলা যায়, তথাপি সে পার্থক্য আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশে কোনোরূপ স্বার্থবিরোধ উপস্থিত করিতে পারে না। যদি উহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বার্থবিরোধের কি আর কারণ থাকিতে পারে? আমরা উভয়েই একদেশবাসী— একই প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি, জীবনসংগ্রামসমস্যা একই উপায়ে পূরণ করিতেছি। আমাদিগের উভয়েরই স্বদেশ সম্বন্ধে আশা এক। সামাজিক উন্নতিসম্বন্ধে ও জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে উভয়ের একই পথ। একই মূলোদ্ভূত রাজনৈতিক শৃঙ্খলতার সাহায্যে আমরা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি। এজগতে একভাবে দেখিতে গেলে যেমন একজনের স্বার্থ অন্যের স্বার্থ হইতে পৃথক তেমনই এক সমাজের স্বার্থ সেই ভাবে অপর সমাজের স্বার্থ হইতে পৃথক। যদি আমি নিজে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জন করি, তাহা হইলে অপরে এরূপও বলিতে পারে যে, আমি অপরের, এমন কি, আমার নিজ আত্মীয়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছি। সে বলিতে পারে যে, আমার আত্মীয় যাহা উপার্জ্জন করিত, আমি উহার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইতেছি। সুতরাং আমি ও আমার আত্মীয়ের মধ্যে যথেষ্ট স্বার্থবিরোধ আছে। এইরূপে ভেদবুদ্ধি প্রবল করিয়া তুলিয়া, এমন কি, স্ত্রী স্বামীর সহিত ও পুত্র পিতার সহিত স্বার্থ বিরোধ উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু এ সকল তুচ্ছ বিষয়কে বড় করিয়া না তুলিয়া অযথার্থকে যথার্থ মনে না করিয়া, লোকে আপনাপন বিভিন্ন গন্তব্য পথে থাকিয়াও একত্র মিলিত হইয়া এক বৃহৎ সমাজগঠন করিয়া তুলিতে পারে ও তুলিতেছে; এবং সেই সমাজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। যদি উভয় সমাজকে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, অন্ন বস্ত্রাদি আহরণ ও অপরাপর সমস্ত বিষয়ই একই প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে হইল, যদি সেই সমস্ত বিষয়ে জাতীয় উন্নতি বা অবনতি একই রাজশক্তি প্রসূত বিধি বা নিয়মাদির ফলাফলের উপর অবস্থিত হইল, তাহা হইলে কি কেবল দুই একটা বড় চাকরির লোভ অথচ অনেক সময় ব্যর্থ আশায় স্বার্থবিরোধের অবতারণা করিয়া দেশব্যাপী মঙ্গলের বিপরীতাচরণ করিব? কিন্তু সে চাকরিরই বা আশা কি? লক্ষ লোকের মধ্যে

একজনও বড় চাকরি পাইবে না। তবে কি এই নিমিত্ত অবশিষ্ট ৯৯৯৯৯ জনের মঙ্গল একজনের স্বার্থেব জন্য বলি দিব? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, একজনের বা দশজনের বড় চাকরিতে হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ কিছুই নাই। সুতরাং যদি কেহ বলেন যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বার্থবিরোধ আছে, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, তিনি কেবল নিজেব কোনও বিশেষ সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য এরূপ অলীক বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া জাতীয় উন্নতির পথে বাধা দিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনই স্বার্থবিরোধ নাই।

২। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস পালচৌধুরী

ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু কিম্বা মুসলমান। হিন্দু সংখ্যায় অধিক, মন্ত্রণায় পটু, কিন্তু নিস্তেজ, মুসলমান সংখ্যায় হিন্দুদিগের অপেক্ষায় অনেক কম— কিন্তু তেজস্বী। ইংরাজ চতুর এবং সূক্ষ্মদর্শী, ভারতসাম্রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াই ইংরাজ দেখিল, হিন্দুর মন্ত্রনাবল ও মুসলমানের তেজস্বিতা মিলিত হইলে তাহাদের ভারতে সুখে রাজত্ব করার কতক ব্যাঘাত জন্মিতে পারে— অতএব এরূপ সম্মিলন হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। নির্দ্দোষ মনুষ্য নাই— নির্দ্দোষ জাতিও নাই— ইংরাজের অনেক দোষ থাকিতে পারে— কিন্তু তাহার অনেক গুণও আছে, ইংরাজ সহিষ্ণু— যে কার্য্য একবার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, তাহা প্রাণপণ যত্নে করে, কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই ছাড়ে না— ইংরাজের ইহাই একটি উন্নতির প্রধান কারণ। ইংরাজ যখন দেখিল যে, হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব সংস্থাপন করাই তাহার কর্ত্তব্য, তখন তাহার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল। হিন্দু ও মুসলমান যদি আপনাদের স্থায়ী প্রকৃত স্বার্থ বুঝিত, হয়ত ইংরাজ অদ্যাপিও সেই উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইত না; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিল না— অসারগর্ভ, অস্থায়ী চাকচিক্যে ভুলিল— ইংরাজ সহজেই কৃতকার্য্য হইল। কাহাকে কোন মন্ত্রে বশীভূত করিতে হইবে তাহা স্থির হইল, mild হিন্দুকে ভয়প্রদর্শনে কিম্বা আবশ্যক হইলে বলপ্রয়োগে এবং fanatic মুসলমানকে প্রলোভনে। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে ধরিয়া ইংরাজ বলিল, "দেখ মুসলমান বড় রাজভক্ত— আমরাও তোমাদের ভালবাসি— হিন্দু রাজদ্রোহী ও তোমাদের

চিরশত্রু— তোমরা হিন্দুর সঙ্গে মিলিও না— তোমাদের উপর ইংরেজের অনুগ্রহ অটল থাকিবে" তাঁহারা ইহাই বেদবাক্য মনে করিলেন এবং গৃহে গৃহে, সভাস্থলে এবং সংবাদপত্রে এই সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক সরলবুদ্ধি মুসলমান ভুলিল কিন্তু সকলে নহে। শিক্ষিত, সূক্ষ্মদর্শী, স্বদেশবৎসল মুসলমানেরা এই সুসমাচারের অর্থ কি বুঝিলেন— তাঁহারা ভুলিলেন না। এখন মুসলমানের মধ্যে মতভেদ— যাঁহারা ইংরাজের অনুগ্রহাকাঙক্ষী তাঁহারা বলেন, ইংরাজ ভালই করুক আর মন্দই করুক, ইংরাজের প্রতিবাদ করা হইবে না, তাহা হইলে ইংরাজের বিরাগভাজন হইতে হইবে। অপর দল যাঁহারা ইংরাজের অনুগ্রহ-নিগ্রহের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে বদ্ধপ্রতিকর— তাঁহারা বলেন আমাদের ও হিন্দুদের রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বার্থ এক। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ ইংরাজের অনুগ্রহাকাঙক্ষী মুসলমানদিগের তর্ক অযৌক্তিক নহে— প্রতিবাদ করিলে ইংরাজের বিরাগভাজন হইতে হইবে এবং অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশাও থাকিবে না। এখন জিজ্ঞাসা অনুগ্রহের মূল্য কি? এবং তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের কি দিতে হয়? অনুগ্রহের মূল্য যাহাই হউক, উহার পরিবর্ত্তে যাহা দিতে হয় তাহা অমূল্য— তাহার নাম মনুষ্যত্ব। সামান্য অনুগ্রহের জন্য আমাদের মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়— অনুগ্রহপ্রার্থী সকল সময়ে স্বাধীনভাবে কার্য্য করা দূরে থাকুক, নিজের মতামতও সকল সময় স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে পারে না— অনুগ্রহদাতার মতই তাঁহার মত এবং অনুগ্রহদাতার সকল কার্য্যই তাঁহার প্রশংসনীয়।

হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইংরাজ শাসনাধীন— যে অধিকার মুসলমানের আছে— হিন্দুরও তাহাই আছে— যাহা হিন্দুর নাই তাহা মুসলমানেরও নাই; একটি বন্দুক রাখিতে হইলে হিন্দুকেও license লইতে হইবে, মুসলমানেরও তাহাই— ইংরাজের পদাঘাতে স্বর্গপ্রেরিত হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্লীহা কিম্বা যকৃৎ বৃহদাকার। বিচারালয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই বিচার; পুলিশের নিকট একরূপেই সম্মান, কারাগারে বা গভর্ণমেন্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে হিন্দু ও মুসলমানের আহারের ও শয়নগৃহের বন্দোবস্ত একই প্রকার, প্রভেদ কোথায়— হয়ত কতগুলি অনুগ্রহাকাঙক্ষী মুসলমানদিগের কল্পনায়, আর ইংরাজের বাক্যে।

যখন ভারতে মুসলমান রাজা ছিল তখন রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থের বিরোধ ছিল— এখন ভারতে ইংরাজ রাজা— রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানের এখন স্বার্থের কোন বিরোধ দেখিতে পাই না।

৩। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

আমার মতে, রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানে কোন স্বার্থবিরোধ নাই এবং থাকাও উচিত নয়। উভয় সম্প্রদায়ই পরাধীন, ইংরেজগণ জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, স্বীয় স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, 'কর-ভার' সমানভাবে বহন করি— উভয়ের রক্ত একভাবেই শোষিত হয়, পরাধীন জাতিব রাজনৈতিক অধিকার আকাশ-কুসুমবৎ কল্পনারই সামগ্রী; সুতরাং অধিকার লইয়াও যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কলহ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সম্ভাবিত নহে। 'অধিকার' বলিয়া যে অবাস্তব পদার্থ লইয়া, সময়ে সময়ে কলহ উপস্থিত হয, তাহা উভয় সম্প্রদায়েরই নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ। খেলার সামগ্রী লইয়া শিশুগণের কলহের সহিত ইহা উপমিত হইতে পারে। ধর্ম্মগত ও সামাজিক পার্থক্য সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু এই পার্থক্যসত্ত্বেও যে রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে পারেন, ইহাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিবেন। প্রচণ্ডঝটিকা-বিতাড়িত তরণী যখন মগ্নপ্রায়া, তখন কি আর আরোহীরা পরস্পরের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজগত মতবিরোধ লইয়া কলহ করে? না— সমস্ত ভুলিয়া নৌকাখানি রক্ষার চেষ্টা করে। আমাদের জাতীয়-জীবন-তরিও মগ্ন-প্রায়, সুতরাং এখন ত আর বিরোধের সময়ই নাই। রাজপুরুষেরা যে ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসমীচীন হইলেও, আমি বিশ্বাস করি, তাহা হইতে শুভফল প্রসূত হইবে। মুসলমানেরা রাজদ্বারে সম্মানিত, রাজানুগ্রহে রাজকার্য্যে লিপ্ত হইলেই, তাহাদের শিক্ষার পথ অনেক পরিমাণে অনর্গল হইবে এবং তাহারা যতই শিক্ষিত হইবে, ততই এই ভ্রাতৃ-বিরোধ নিরাকৃত হইবে, সুতরাং শিক্ষিত হিন্দুগণের রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ না হইয়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়াতে, আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মুসলমানগণও অচিরে, উভয় সম্প্রদায়ের ভালবাসা ও সখ্যই যে জাতীয়-জীবন উন্নত করিবার একমাত্র উপায়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুগণ বেশি শিক্ষিত হইলে, তাহাদেরই অধিক ত্যাগশীল ও ক্ষমতাশীল [ক্ষমাশীল] হইতে হইবে।

৪। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

ধর্ম্মমতের প্রভেদে যে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন স্বার্থ-বিরোধ ঘটিতে পারে, তাহাত বুঝিতে পারা যায় না। রোমান কাথলিক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যখন স্পেন হইতে আর্ম্মাডা সাজিয়া আসিয়াছিল, তখন প্রটেস্টান্ট এবং রোমান ক্যাথলিকেরা তুল্যরূপে স্বদেশ-উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হইয়া, আর্ম্মাডা ধ্বংস করিয়াছিলেন। আজি আমি হিন্দু, কাল যদি আমি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করি, তাহা হইলে কি দেশের কথায় হিন্দুদের সঙ্গে আমার মতভেদ ঘটিতে পারে?

মুসলমানেরা যদি নির্ধন, বা অনুন্নত হয়েন, তাহার জন্য কি গভর্ণমেন্ট কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন, না বিশেষ ব্যবস্থার জন্য মুসলমানেরা কোন আবেদন করিতে পারেন? অমুক মুসলমান, বা অমুক খৃষ্টান শুনিয়া কি গভর্ণমেন্ট কোন সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী হইতে পারেন? হিন্দুর মধ্যেও কোন সম্প্রদায় উন্নত, কোন সম্প্রদায় অনুন্নত। সে জন্য কি রাজনৈতিক স্বার্থ বিরোধ ঘটে, না গভর্ণমেন্ট কিছু করিয়া থাকেন?

গভর্ণমেন্ট জানেন যে, মুসলমানেরা সাধারণতঃ একটু অবুঝ এবং উদ্ধত; সেইজন্য তাহাদিগকে আদরের ছলে ভুলাইয়া বশ করিতে চাহেন। অস্ত্রাদি যাহাদের নাই, তাহারা সকলেই এখন মৃতপ্রায়। তথাপি মুসলমানেরা অজ্ঞতার ফলে অনেক সময়ে মরিয়া হইয়া উঠিয়া দলবদ্ধ হয়। এটুকু উড়াইয়া দিতে পারিলে, একই শান্তির ক্রোড়ে সকলকে শায়িত করা চলে।

ধর্ম্ম লইয়া হউক, পদ লইয়া হউক, কোন একটা ছল ধরিয়া গভর্ণমেন্ট যদি দেশের লোকের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেন্টের বিশেষ মঙ্গল। মুসলমানেরা যদি সেই ছলে ভুলিয়া যান, তবে কপাল!

বঙ্গদেশের মুসলমানেরা ত অধিকাংশ দেশের অতি প্রাচীন লোক; কেবল নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান। বিদেশী হইলেও কিছু নূতন কথা উঠিত না, কারণ এখন সকলেই এক দেশের প্রজা; এই অতি সহজ কথা লইয়া ঘন ঘন তর্ক উঠে কেন? মুসলমানেরাই বা স্বার্থবিরোধ ভাবেন কেন? দেশের স্বার্থের একতা বুঝাইয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা সহজ; অনেকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, তাহাও জানি। আবার সেই সকল কথা লইয়া দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া কি হইবে? মিলনটা যে তর্ক যুক্তির অভাবে ঘটিয়া উঠিতেছে না, একথায় আমার বিশ্বাস নাই। যে কথায় মিলন বাধিয়াছে, তাহার উল্লেখ এ প্রশ্নের উত্তরে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা বর্ত্তমান যুগে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক উন্নতির সহায় কি প্রতিবন্ধক?

যাঁহার মতে উক্ত প্রথা উন্নতির প্রতিবন্ধক, তাঁহার মতে কি উপায়ে ইহা দূরীভূত হইতে পারে?

অপর পক্ষে যাঁহার মতে ঐ প্রথা উন্নতির সহায় তাঁহার মতে কি উপায়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা হইতে পারে?

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা জাতীয় সমৃদ্ধি এবং বাজনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক নহে— ঐ প্রথা উন্নতিব প্রধান সহায়। বর্ণাশ্রম যে এক্ষণে কার্য্যতঃ একপ্রকার লোপই পাইয়াছে তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান ইংরাজের কাছে চাকুরী। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যখন জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়— তখন উহা ব্যবসার শ্রেণীভেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন সমাজের গুরু ছিলেন ব্রাহ্মণ— সমাজ-শিক্ষার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। বৈশ্যগণ কৃষি ও অপর শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই তিন শ্রেণীর পরিচর্য্যার ভার শূদ্রের উপরই ছিল। বর্ত্তমান ইংরেজ-রাজত্বকালে ঐ প্রকার শ্রেণীবিভাগ এক কালেই লোপ পাইয়াছে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ এক্ষণে গুরুর সম্মানকর আসন ত্যাগ করিয়াছেন, জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য যাহা পাইতেছেন তাহাই করিতেছেন। কেহ বা অধ্যাপক, কেহ বা উকীল, কেহ বা ডাক্তার, কেহ বা রাজসরকারে উচ্চপদস্থ চাকুরে। কোনো ব্রাহ্মণ আবার ব্যবসা ধরিয়াছেন— সে ব্যবসার নির্ব্বাচনবিষয়ে তিনি এককালে বিচারশূন্য। ব্রাহ্মণ এখন ডাক্তার— উকীল—বণিক—কৃষক—যাহা বলিবেন তাই। মেডিক্যাল কলেজের উদার আনুকূল্যে বৈদ্য এক্ষণে নিরুপায় হইয়া

নিজের পেশাতে ইস্তফা দিয়া যাহা-তাহা করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিতেছেন। কায়স্থ— রাজকর্ম্ম করা যাঁহাদের পেশা ছিল— এক্ষণে ঐরূপই যা' পাইতেছেন তাই করিতেছেন। অপর জাতির ত' কথাই নাই— কুমার ছেলেকে মেডিক্যাল কলেজে দিয়াছে— হাঁড়ীগড়া আর সম্মানকর এবং লাভজনক বলিয়া মনে হয় না। তাঁতী এখন আপিসে ঢুকিয়াছে— তাঁত বুনিয়া আর দিন চলে না। কর্ম্মকার এখন 'দাস' পদবী লইয়া যা হোক একটা করিতেছে— বাপপিতামহের কাজে এবং নামে তাহার এখন লজ্জা বোধ হয়। এখন কলু, মালী, চাষী, শুঁড়ী University প্রসাদাৎ মাষ্টারী অথবা প্রফেসারী করিতে সুরু করিয়াছেন। শূদ্রেরা ত' কলকারখানার কল্যাণে দিব্য বাবু বনিয়া গিয়াছে— ৮টার সময় ভাত না খাইলে অজীর্ণরোগ উপস্থিত হয।

এমনি করিয়া চারিটা জাতি পরস্পরে এমন খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে যে তাহা আর কহতব্য নহে। জাতিভেদের যাহা মূলপত্তন তাহাই কাটা পড়িয়াছে। ইহার উপর ধরুন আর এক বিধম ব্যাধি সাহেবি-আনা। এই ব্যাধির প্রচণ্ড বিষে হিন্দুসমাজ ভিতরে ভিতরে জর্জ্জরিত হইযা উঠিয়াছে। আমার মনে পড়ে একজন দেশভক্ত অমায়িক ব্রাহ্মণ ব্যারিষ্টার কোন স্থানে স্বদেশীশিল্পসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন— উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্রই একজন দর্শক বলিয়া উঠিলেন— "কোট্‌টা খুলে"— তিনি সেই টিপ্পনী শুনিতে পাইয়া বিনম্রলজ্জার সহিত বলিলেন— "যদিও কার্য্যগতিকে আমার পোষাকটা সাহেবী হইয়া পড়িয়াছে তথাপি আমার এই পোষাকের যা কিছু উপকরণ— সমস্তই দেশ হইতে আহরণ করিয়াছি।" ইহা মাতৃভক্তের কথা বটে— কিন্তু ব্যারিষ্টার মহাশয়েরা আদালতের বাহিরে যদি কাপড় চাদরে আস্থা রাখিতেন তাহা হইলে বক্তামহাশয় এ লজ্জার হাতে পড়িতেন না।

এই অবস্থায় আমরা পড়িয়াছি। দেশে এই জাতিভেদের যথার্থ অভাবে ব্যবসায় বিশৃঙ্খলা বিলক্ষণ ঘটিল— শিল্পীদের নিজ নিজ শিল্পে অনাস্থা প্রযুক্ত দেশের শিল্প লোপ পাইয়া গেল— তাহার স্থানে বিলাতী মালের প্রাদুর্ভাবে বাজারসমূহ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। এদিকে তাঁতী তাঁত বন্ধ করিল— ব্রাহ্মণ বস্ত্র বিক্রয় ধরিলেন, তাঁতী মাষ্টার হইয়া পড়াইতে গেল। এমনি করিয়া একের ব্যবসায় অন্যে প্রতিযোগী হইয়া আপনিও নষ্ট হইলেন— পরকেও নষ্ট করিলেন। সকল কাজে সকল জাতির পরস্পর আনুকূল্য চাই। কিন্তু এক্ষণে এ উহার অন্নের পথ, অর্থের পথ জুড়িয়া বসিয়া আপনি অর্থলাভের চেষ্টা করায় একটা প্রকাণ্ড কিম্ভূৎ হুজগজ ব্যাপার বাধিয়া জনসাধারণকে উৎসন্নের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

এইজন্য আমার বিনীত মত এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমাদের সমস্ত শক্তি প্রেরণ করিলেই মঙ্গল আসিবে। যে সকল উপায়ে বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব, তাহার কতকগুলি আমি উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব'।

ব্রাহ্মণ চাকুরী এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার অব্রাহ্মণোচিত (অব্রাহ্মণ অর্থে আমি ব্রাহ্মণেতর জাতি বলিতেছি) পেশা ত্যাগ করিবেন। সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারিবেন না। অনাচার এবং অখাদ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শূদ্রান্ন অথবা মুসলমানের স্পৃষ্ট আহার্য্য তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল অনুষ্ঠানে তাঁহাদের সমাজে শ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হইবে। বিলাসিতা এবং তদুপলক্ষে সকল প্রকার বিলাতী দ্রব্য তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। কেবলমাত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং অধ্যাপনাই তাঁহার কর্ম্ম হইবে।

বৈদ্যগণ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিবেন। অপর কোনো জাতি তাঁহার এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন না।

কায়স্থগণ রাজকার্য্য গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন। কায়স্থেতর জাতি কোনো প্রকার রাজকার্য্যের চেষ্টায় দরখাস্ত হাতে লইয়া উমেদারী করিয়া তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করিয়া তুলিবেন না।

কামার, কুমার, তেলী, তাঁতী, ইত্যাদি জাতীয় ব্যক্তিগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। একের বৃত্তি অপরে গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিকল করিতে চেষ্টা পাইবেন না।

এবং ব্রাহ্মণ এই সকল জাতির শিক্ষাগুরু হইবেন। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" একথা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু অনেকে বলিতে পারেন, "সকল জাতির উপর গুরু হইবেন এমন ব্রাহ্মণ কই?" কিন্তু "নাই" বলিয়া উড়াইয়া দিলে কিছুই থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ হীন হইয়াছেন— একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ ইহার জন্য নিজে যে পরিমাণে দায়ী অপর সমস্ত সম্প্রদায়ও কি ঠিক সেই পরিমাণে দায়ী নহেন? অপর সমস্ত সম্প্রদায় যদি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ আবার তাঁহার পূর্ব্ব গৌরবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। কারণ, সামাজিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করা লৌকিক ব্যবহারের উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। অনেকে এ কথাটাকে অযৌক্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা যাঁহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া

রাখা যায় তিনি কখনো নীচে নামিতে পারেন না। পূর্ব্বে রাজারা ব্রাহ্মণকে গৌরবের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন— এখন সে রাজা নাই— ব্রাহ্মণের সে গৌরবও চলিয়া গিয়াছে।

সেইজন্য এখনো জোর করিয়া একথা বলা যায় যে, অপর সম্প্রদায় মনে করিলে ব্রাহ্মণকে আবার ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিতে পারেন। ব্রাহ্মণকে পূজার অর্ঘ্য দিলে ব্রাহ্মণ এখনো তাঁহাকে অপার্থিব কল্যাণ দিতে পারেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পতিতা" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন—

"তুমি যদি দিতে পূজাব অর্ঘ্য,
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা"।

এই দুইটি ছত্রের ভিতব নিগূঢ়ভাবপূর্ণ একটি মহা সত্য নিহিত রহিয়াছে। এ সত্যের প্রতি যাঁহাবা দৃষ্টিপাত করিবেন— তাঁহারা আমাব কথা কখনো মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ যদি বুঝিতে পারেন যে, তিনি সমাজেব শীর্ষস্থান অধিকাব করিয়া আছেন, তাহা হইলে তিনিও সমাজকে এখন জিনিস দিবেন যাহা, নিত্যকাল আনন্দ এবং কল্যাণ বর্ষণ করিতে থাকিবে।* অপর শ্রেণীর লোক— যাঁহারা ব্রাহ্মণের আসন দখল করিয়া গুরুগিরি করিতেছেন—তাঁহারা সরিয়া গিয়া নিজ নিজ জাতীয কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন ইহাতে সামাজিক শৃঙ্খল' এবং জাতীয় অর্থাগম দুইই হইবে। সুপণ্ডিত লেখক Frederick Harrison বলিযাছেন "civil society is held together by a conventional respect for the legalised authority". বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেও এক্ষণে এই নীতির প্রবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপে আমাদের সমাজে নূতন জীবন সঞ্চাব হইলে শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদির পথ সরল ও সুগম হইবে। তাহাতে আভ্যন্তরীণ শক্তি— শিক্ষাপ্রভাবে তেজ এবং সাহেবদিগের চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্ফূর্ত্তি-যুক্ত স্বচ্ছন্দতা আসিবে। তখন আমাদের বিজেতৃবৃন্দও আমাদিগকে চাকুরে জাতি বলিয়া ঘৃণা করিতে সাহস করিবেন না। যখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, আমরা স্বায়ত্তাধীন জাতি— আমাদের আত্মনির্ভরের ক্ষমতা আছে— আমরা কাহারো দ্বারে প্রার্থী নহি— তখন রাজনৈতিক শক্তি আমাদিগকে খুঁজিতে থাকিবে— তাহাকে খুঁজিবার জন্য আমাদিগকে লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'শিক্ষা-সমস্যা' নামক প্রবন্ধ দেখুন।

২। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুদূর নর্ম্মদার উপত্যকায় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্তুপীকৃত রাশি রাশি প্রস্তর ফলকের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রস্তর-ফলকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে লিপ্ত সমাজভুক্ত মানবের পরিশ্রমের আদিম-নিদর্শন। এইখানে নিশ্চয়ই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। জগতের কোন অংশ, কোন জনসমষ্টি যে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে বিভক্ত হইয়া, স্বকৃত দ্রব্যের সহিত পরকৃত দ্রব্যের বিনিময় করিয়া জীবনযাপন করিতে না শিখিয়াছে, সে পর্য্যন্ত সে জনমণ্ডলীর মধ্যে বর্ব্বরতা, অসভ্যতা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অসভ্য জাতিসমূহ এই প্রস্তাবের প্রমাণ। শিকার কি বিহার, যুদ্ধ কি আহার তাহারা সকলে একত্র হইয়া এক একটি কার্য্য একই সময়ে করে। সকলে একত্র হইয়া যদি একই কাজ করিতে হয় তবে জীবনে দু'চারটির বেশী কাজ করা সম্ভব হইয়া উঠে না, এবং সে দুচারটি কাজের জন্য যতটুকু মানসিক পরিচালনা ও উৎকর্ষের দরকার তদধিক মনের বিকাশও হয় না। অন্তর্নিহিত অন্য শক্তিগুলি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহাদের বিকাশের সুযোগ বা সম্ভাবনা হয় না। মানসিক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীব অজ্ঞান ও অসভ্যতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে।

কিন্তু যেখানেই মানুষ এই অন্ধ-সংহতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, যেখানেই তাহারা সমাজকে নানা কার্য্যে ও তন্নিবন্ধন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইয়া, নিজ নিজ পরিশ্রমের ফল পরস্পরের সহিত বিনিময় করিয়া একত্রে বাস করিতে পারিয়াছে, সেখানেই সভ্যতার প্রথম প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। আমি প্রস্তরফলক প্রস্তুত করি, তুমি বল্লমের ছড় প্রস্তুত কর, সে তীর নির্ম্মাণ করুক, আর একজন ধনুক গড়ুক, অপর এক ব্যক্তি কি দল শিকার করুক, আর আমরা সকলে স্বস্ব কৃত জিনিষ পরস্পরের সহিত অদল বদল করিয়া একই সমাজে নানা শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিব, এ প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় যেদিন মানুষ আরও করিতে পারিল, সেদিন হইতে জনসমাজে সভ্যতার বীজ প্রথম উপ্ত হইল, মানুষ অসভ্যতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিল। নানা প্রকার কার্য্য-উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক শক্তির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, এক এক ব্যক্তি বা দল এক এক কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে (skill) শিল্পকৌশলের প্রথম উন্মেষ, ও বিশ্রামের সময় লাভ করাতে মানুষের চিন্তা করিবার ক্ষমতা ও সেই সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের পথ পরিষ্কার হইল।

সভ্যতার আর এক স্তর উপরে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবসমাজ রাজা-প্রজা, পুরোহিত-যজমান, প্রভু-দাস ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাও

ক্রমশঃ কার্য্যবিভাগ ও তৎসঙ্গে দল ও সম্বন্ধ বিভাগেরই ফল। প্রাচীন ভারতে এই বিভাগপ্রথা অতি পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই ভারতবর্ষ অতি সহজে ও সত্বরে সমস্ত জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই বিভাগের প্রথম অবস্থায় লোক কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে যাইতে পারিত; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে চলৎ শক্তি ছিল; (পরাজিত শূদ্র অবশ্য দাসত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারিত না)। এসময়ের সামাজিক অবস্থাকে class system বলা যাইতে পারে; জাতিভেদের— caste system এর— কঠোর নিগড়ে সমাজ এখনো বাঁধা পড়ে নাই। জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নিরূপণের এই বিষম সমস্যার সময়।

সমাজের এ অবস্থাতে heredity-র ফল মানবের নিকট সম্যক্ পরিস্ফুটিত হয়; দেখা যায়, পুরোহিতের কাজ পুরোহিত-পুত্র অন্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা ভাল করিতে পারে, পিতার বিদ্যা অন্য অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে; এইরূপ ক্ষত্রিয়ের পুত্র অপর অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যায় পটু; ব্যবসায়ীর সন্তান ব্যবসায়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ; শূদ্রের পক্ষেও তাই, তবে দাসবৃত্তি বিজেতৃগণের পক্ষে হেয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বভাবতঃই মনে করিলেন, এই Heredityকে চিরন্তন কার্য্যকরী করিতে পারিলেই সমাজের প্রভূত মঙ্গল, কারণ তাহা হইলে সমাজের সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহিত হইবে। এই মনোভাব হইতেই ভারতে জাতিভেদের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণগণ প্রচার করিলেন, চারি জাতি ব্রহ্মার মুখ, বাহু, নাভি ও পদ হইতে উদ্ভূত ও অঙ্গের অধোনিম্নতা অনুসারে সমাজে চারি জাতির ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণের প্রাধান্যানুগত ভারত অবনত মস্তকে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইল।

জাতিভেদের আশুফল ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার অলৌকিক অভ্যুত্থান; বিদ্যা ও বীর্য্যে ভারতের জগতে শ্রেষ্ঠতালাভ। ব্রাহ্মণ জীবনের অন্য সমস্ত কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া অনন্যমনে শুধু মানসিক বৃত্তিসমূহের স্ফুরণে নিবিষ্ট হইয়া, বুদ্ধি ও চিন্তাবৃত্তির অপরিসীম চালনা দ্বারা এক অদ্ভুত ও অনুপম দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন, ভগবৎ-তত্ত্বের চরমসীমায় উপনীত হইতে পারিলেন। সেই তত্ত্বের বহিঃসীমায়ও জগৎ আজ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। ক্ষত্রিয় অপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিল; বৈশ্য নানা কারুকার্য্যে চারু সাজে মাতৃভূমিকে সজ্জিত করিল; শূদ্র আদর্শ দাস হইয়া আর্য্যের সেবা করিয়া জীবন চরিতার্থ করিল। আর জাতিভেদাশ্রিত হিন্দুসভ্যতার বহির্ভূত ভারতবাসী ও অন্যান্য সমসাময়িক সন্নিকটস্থ জাতিসকল কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু আমাদের আর্য্যঋষিগণ ভাবেন নাই, কি ভাবিতে পারেন নাই যে, এই আশুসুগন্ধকুসুমিত বৃক্ষেই কালে ভারতে বিষময় ফল ফলিবে, এই জাতিভেদ পরিণামে ভারতের বিষম ও অসহ্য দুর্দ্দশা ঘটাইবে। এই জাতিভেদের আবরণে শত্রু ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ছিল। এখন আমরা বর্ত্তমান জ্ঞানালোকে দেখিতে পাইতেছি যে, জাতিভেদপ্রথা যদিও কিছু সময় পর্য্যন্ত নব চরিত্রের বিকাশ ও উৎকর্ষের সহায়, চরিত্রের ক্রমবিবর্ত্তনের সহিত এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন এই প্রথাই চরিত্রের পরিস্ফূরণের অলঙঘ্য প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ এক পরিবারে, এমন কি এক গোত্রে পর্য্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহার কারণ এই, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন সগোত্র-বিবাহে মানুষ হীনবীর্য্য ও হীনবল হইয়া পড়ে। শুধু তাঁহারা যদি এ বিষয়টি আর একটু তলাইয়া দেখিতেন ত বুঝিতে পারিতেন যে, এক জাতীয় শোণিতও যদি বিবাহ বন্ধনের দ্বারা সেই জাতিতেই নিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে এমন এক সময় আসিবেই যখন সমস্ত জাতি নিঃশেষিত-বীর্য্য ও বলহীন হইয়া পড়িবে। তাঁহারা জাতীয় hereditary গুণসমূহ রক্ষা করিতে যাইয়া জাতির অন্তর্গত মনুষ্যচরিত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছিলেন। এই রক্তস্বাতন্ত্র্য-রক্ষার চেষ্টা গ্রীক ও পৃথিবীর অন্য দু'চারটী জাতির সমুল বিনাশের একটি প্রধান কারণ। ভারতবাসী ধর্ম্ম ও কতগুলি সামাজিক নীতির আশ্রয়ে থাকিতে পারিয়াছিল বলিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক জীবশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ জগতে সভ্যতার ক্রমোন্নতির দুইটি হেতু নির্দ্দেশ করেন, এক heredity, (জীব মাত্রেরই বংশ-পারম্পর্য্য-রক্ষার স্বাভাবিক নিয়ম), অন্য tendency to variation (জীব মাত্রেরই বিশিষ্টতা লাভের স্বাভাবিক প্রয়াস); Heredity দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত গুণসমষ্টি মানবচরিত্রে সঞ্চিত হয়, আর Variation-এর নিমিত্ত চরিত্রে নূতন বৃত্তি, আকাঙক্ষা ও শক্তিনিচয়ের আবির্ভাব হয়। দুটির সম্মিলিত ক্রিয়া মনুষ্যচরিত্রের ক্রমবিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধন করে। জাতিভেদ heredityর ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বজায় রাখে, কিন্তু অন্য ক্রিয়ার বিশেষ বাধা ঘটায়। শুধু জাতির ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে যতটুকু সম্ভব variation কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু এত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ হইয়া variationও ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায়—একই জাতির একই কার্য্যের মধ্যে কত আর variation সম্ভব? অতএব জাতিভেদপ্রথা মানব-চরিত্রকে কতকটা দূর আনিয়া অবশেষে থামাইয়া

রাখে; বিশেষতঃ নিম্নস্থিত জাতিদিগের উর্দ্ধগামী ভাব, শক্তি ও বৃত্তিগুলিকে একেবারে চাপিয়া রাখে; ব্যক্তিগত ও জাতীয়-জীবনে একটা বৈচিত্রের অভাব আসিয়া পড়ে; জাতীয় এক পুরুষ অন্য পুরুষের পুনরাবৃত্তি মাত্র হইয়া পড়ে; সমাজের ক্রমোন্নতি একেবারে তিরোহিত হয়। কিন্তু যেখানে ক্রমোন্নতি নাই, সেখানে ক্রমাবনতি অনিবার্য্য; আমাদের দেশেও তাহাই হইয়াছে।

এই ক্রমাবনতির আরো অনেক কারণ আছে। প্রত্যেক জাতি এক একটি monopoly; সামাজিক একটি কার্য্য একচেটিয়া করিয়া রাখেন এবং monopolyর সমস্ত দোষ জাতিকেও কলুষিত করে। জাতিভেদপ্রথা যেমন ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রমুখ কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাজনকে জ্ঞানের চরম সোপানে উপনীত হইবার সামর্থ্য ও সুযোগ দিয়াছিল, তেমনি ব্রাহ্মণজাতির অধিক সংখ্যাকেই উদ্ধত ও আত্মাভিমানী করিয়া তুলিয়াছিল। এক মহান্ বিশিষ্ট জাতিভুক্ত বলিয়া মহাগর্ব্ব আজও ব্রাহ্মণকে জর্জরিত করিরা রাখিয়াছে, জাতিভেদের মধ্যে থাকিয়া যতদূর উন্নতি সম্ভব তাহার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির ক্রমশঃ অবনতি অনিবার্য্য ছিল একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার একটি বিশেষ কারণ এই যে, প্রতিযোগিতা নিবন্ধন উত্তেজনা ও উৎসাহের অভাবে প্রত্যেক জাতিভুক্ত ব্যক্তিগণের উন্নতির আকাঙক্ষা ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছিল; যখন কোন একটা কাজ কোন সম্প্রদায়বিশেষের monopoly হইয়া পড়ে তখন আর অপ্রতিহত উন্নতি ও উৎকর্ষ কতদিন সম্ভব? মানবচরিত্র সাধারণতঃ এমনি গঠিত যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়না ব্যতীত শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িতে চায়; জীবনে একথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ যখন দেখিতে পাইল, ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলেই জাতিগত সকল সম্মানের সে অধিকারী, তখন সে স্বভাবতঃই পরিশ্রমে নিরস্ত হইল; ক্ষত্রিয়ও ক্রমে হীনতেজা হইয়া পড়িল। জাতিভেদের ফলে ভারতের প্রধান দুই জাতি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিল; বর্ণাশ্রমের নিগড়ে নিবদ্ধ বৈশ্য ও শূদ্র তাহাদের স্থান অধিকার করিতে পারিল না। কাজেই ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া ভারত পরাধীনতার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদের নাগপাশকে শিথিল করিয়া দিয়া অধোগামী ভারতবর্ষকে কিছুদিনের জন্য পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থান আবার বিনাশের পথে চলিতে লাগিল।

জাতিভেদের বিষে জর্জ্জরিত ভারতে স্বাধীনতা আর কতদিন সম্ভব ছিল? নবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, বলদৃপ্ত মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত, বিলুণ্ঠিত হইয়া ভারত অবশেষে

স্বাধীনতা হারাইল। হৃতগৌরব ব্রাহ্মণ মুসলমানের নিকট নতজানু হইল, হৃতবীর্য্য ক্ষত্রিয় পরাস্ত হইল; বৈশ্য ও শূদ্র এক প্রভুর বদলে অন্য প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিল।

এখানেই আমরা জাতিভেদের সহিত জাতীয় জীবনের উৎকর্ষের ঘোরতর বিরোধ দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত দেশের শাসন প্রণালীতে আর কাহারো অধিকার ছিল না; বৈশ্য, শূদ্র citizenship হইতে সম্পূর্ণচ্যুত ছিল; এখন পরাধীন হইয়াও ভারতবাসীর দেশের শাসনকার্য্যে যোগ দিবার যতটা ক্ষমতা আছে, তাহাদের স্বাধীনভাবে থাকিয়াও তাহা ছিল না; তাহারা সারা জীবন শিক্ষায় [অশিক্ষায়] থাকিয়া শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপায় করিয়া জীবন কাটাইত। ইতর জাতিদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিবার জন্যও ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। যেদেশেই পুরোহিতরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানেই এই চেষ্টা হইয়াছে। ইউরোপে মধ্যযুগে যখন পুরোহিতগণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তাহারা অবিরত লোকদের বলিতেন Ignorance is the mother of devotion অজ্ঞতাই দেবভক্তির মূল।

সাধারণ জনসমাজ শিক্ষালাভ করিয়া চিন্তা ও যুক্তি করিতে সমর্থ হইলে তাহাদের সমস্ত কারসাজি বাহির হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে পুরোহিতগণ ইয়োরোপে কি ভারতে সর্ব্বত্রই শিক্ষাপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। Renaissance-এ যখন ইউরোপের জনসাধারণের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল সেদিন হইতে সেখানে অন্তঃসারহীন পৌরোহিত্যের শেষ হইল। আরো ৪০০ বৎসর পরে সেই জ্ঞানালোকে আলোকিত ভারতে আজ পৌরোহিত্যের বিনাশের সম্ভাবনা হইয়াছে।

দেশের শাসনপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে স্বদেশানুরাগ, patriotism কি সম্ভব ছিল? স্বাধীনতার গৌরব ও পরাধীনতার দুরপনেয় কলঙ্কের ভাব ইহাদের হৃদয়ে কখনো আসে নাই। কালের গতিতে যখন ব্রাহ্মণ হীনগতি ও ক্ষত্রিয় শৌর্য্যবীর্য্যহীন হইয়া পড়িল, তখন শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে বৈশ্য, শূদ্র নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন রহিল, তাহাদের অন্য কোন মনোভাবের ত কারণ ছিল না। এইজন্যই রোমানরা গ্রীসকে এবং মুসলমানগণ ভারতবর্ষকে এত সহজে ও অল্পসময়ে জয় করিতে পারিয়াছিল।

জাতিভেদাশ্রিত সমাজে শিক্ষা ও চরিত্রের উৎকর্ষ কি অপকর্ষের দ্বারা লোকের যোগ্যতা কি হীনতা নিদ্ধারিত হয় না; কেবল জন্ম, accident of birth এর

দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হয়। ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত বলিয়া এক ব্যক্তি শ্রেয়ঃ, আর শূদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া অপর ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা হেয়, যে সমাজে এই ভাব প্রতিষ্ঠিত, যে সমাজে মানুষ কেবল বংশের প্রাধান্যের নিমিত্ত স্বজাতিকে বিধাতার বিধানে অন্যজাতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবন কাটাইতে পারে, সে সমাজের লোক যে ঘোর আধ্যাত্মিক ও মানসিক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিকট পবাধীনতার শৃঙ্খল তো তুচ্ছ। এইরূপ জাতির পক্ষে জেতৃজাতিকে সচ্ছন্দে ও অম্লানবদনে দাসখত লিখিয়া দেওয়া ত স্বাভাবিক; আত্মা ও মনের ঘোর বন্ধন তাহাদিগকে পরাধীনতার বন্ধনের জন্য ত প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছে।

ভারতের আর্য্য ঋষিগণ যেমন জগতকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম দিয়াছেন, সেইরূপ ইয়োরোপও দুটী অমূল্য রত্নদানে জগৎকে ঝালা করিয়াছে, একটী Liberty, অন্যটী Equality; ইয়োরোপের জাতিসমূহ অশেষ উদ্যম, চেষ্টা, ত্যাগ ও রক্ততর্পণের ফলে এই দুইটী নীতির উপরে জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। All men are equal and all men are free এই দুইটী ভাবের পূর্ণ-যথার্থতা-লাভ ইয়োরোপের জাতীয়তার তাৎপর্য্য, ইয়োরোপের রাজনীতির চরম উদ্দেশ্য। জাতিভেদের প্রভাবে এই দুইটী মহান ভাব ভারতবাসীর হৃদয়ে কখনো অঙ্কুরিত হয় না এবং সেই জন্য আমাদের দেশে প্রকৃত স্বজাতিপ্রেম ও তদনুবর্ত্তী রাজনৈতিক উন্নতি হইতে পারে নাই। ইরোরোপের ও ভারতের সভ্যতার এই মূল পার্থক্য।

দেখা যাইতেছে, জাতিভেদপ্রথা জাতীয় জীবনের প্রকৃত স্ফুরণের সম্পূর্ণ অন্তরায়। অতএব ইহা প্রকৃত স্বদেশী ভাবের বিরোধী। এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? আমি বলিতে চাহি না যে, আমরা জাতিভেদপ্রথাকে সমূলে বিনষ্ট কবিতে না পারিলে স্বদেশী ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না; কারণ, শেষোক্ত যে দুইটি কারণে জাতিভেদ জাতীয় জীবনের প্রতিবন্ধক বলিয়াছি সে দুইটি কারণ আমাদের আধুনিক শিক্ষার দ্বারা প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। Liberty, citizen-ship এ সকলের সমান দাবী আমরা এখন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; আর শিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন আজ শুধু ব্রাহ্মণেরই নিজস্ব নাই; Tendency to intellectual variation আজ আর কেবল ব্রাহ্মণজাতির সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ নাই। জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা সমগ্র ভারতবাসী আজ জাতীয় একপ্রাণতা অনুভবে সমর্থ হইয়া প্রকৃত স্বদেশভক্ত

হইয়া উঠিয়াছে। আর পথে, স্কুলে, কলেজে, আফিসে, সভাতে সকলের সমান মর্য্যাদা ও অধিকার মানিয়া লইয়াছি। অতএব রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যতটা একতার ভাব দরকার তাহা প্রায় আমাদের হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ জীবনে অবশ্যি এখন আমাদের অনেক দোষ আছে। সামাজিক ভেদবন্ধন এখনো রহিয়াছে, এখনো বর্ণগত বিভিন্ন আচার, আহার, অসবর্ণ-বিবাহ [?] ইত্যাদি বজায় আছে। এই সব থাকিতে আমাদের জীবনের পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, এ সমস্ত দোষ দূর করা এত সময়ের দরকার যে, এই জন্য স্বদেশী আন্দোলনকে ছাড়িয়া দিলে আমাদের Political মুক্তি অত্যন্ত সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে। এখন স্বদেশী আন্দোলনকে ধরিয়া থাকিতেই হইবে; অর্দ্ধমৃত জাতিভেদ এখন আর বিশেষ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। পরন্তু কোন মহান্ জাতীয় উদ্দীপনার প্রেরণায় জাতিভেদের ভগ্নাবশিষ্ট একবারে লুপ্ত হইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আজ অনেক ব্রাহ্মণসন্তান ইতর জাতির পদধূলি লইতে প্রস্তুত হইয়াছে; হিন্দু-মুসলমান কোথাও কোথাও একত্র আহার করিয়াছে।

৩। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন

১। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তদ্দৃষ্টে আশঙ্কা হয় যে, এই সময়ে নেতৃগণ কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে যুগপৎ হস্তক্ষেপ করিতে গেলে প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। দেশের অবস্থা দেখিয়া নেতৃগণ যে সকল গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সে সকল এখন পর্য্যন্ত ১/১৬ ভাগও সংসাধিত হয় নাই। নেতৃগণের এক বৎসরব্যাপী বিশেষ যত্ন ও চেষ্টাতে এবং তাঁহাদের স্বর্গীয় আদর্শ দৃষ্টে জনসাধারণের মনে একটি "মহাজাতি সংগঠনী" ভাবের সঞ্চার হইয়াছে মাত্র। যাহাতে জনসাধারণ এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধীরে ধীরে মুখ্য উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নেতৃগণকে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবে, মোহমুগ্ধ বাঙ্গালীজাতি যেন পুনরায় মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া না পড়ে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে, নেতৃগণ এখন পর্য্যন্ত সেই উপায় উদ্ধাবন করিতে সম্যক্‌রূপে সক্ষম হন নাই। এখনও নেতৃগণমধ্যে অনেক গুরুতর বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। যতদিন নেতৃগণ এই সকল মতভেদ দূর করিয়া সকলে একমনপ্রাণ

হইয়া বাঙ্গালীজাতির উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য কোন গুরুতর বিষয়ে বিশেষতঃ যে সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া নূতন প্রতিষ্ঠিত একতার ভাব নষ্ট করিতে পারে এরূপ কোন বিষয়ের আন্দোলন না করাই বোধ হয় শ্রেয়ঃ। দেশ ও জাতি সংস্কারসম্বন্ধে এখনও বাঙ্গালী শিশু। এই শিশুব শারীরিক ও মানসিক বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার বিধান করিতে হইবে। যেরূপ সংস্কার এই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বলের উপযোগী না হইবে, সেরূপ সংস্কার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলে তাহার অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা রহিয়াছে। বিশেষতঃ, নেতৃগণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বল এই সময়ে একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত না হইলে তদ্বিষয়ের সৎ ও প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনের পক্ষেও অন্তরায় ঘটিতে পারে। এই সকল কারণে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে, যদিও এই প্রশ্নের নির্দ্ধারিণের উপর আমাদের জাতীয় উন্নতি কতক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তথাপি এই প্রশ্নের আন্দোলন ও নির্দ্ধারিণ করিবার উপযুক্ত সময় এক্ষণ উপস্থিত হয় নাই।

২। আপনার প্রশ্নসম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান যুগে জাতীয় সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক উন্নতির সহায় নহে। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজের যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশ ও কালের পরিবর্ত্তনে হিন্দুসমাজের সেই অবস্থা বিদ্যমান নাই। দেশ ও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ভবিষ্যতেও অনেক পরিমাণে ঘটিবে; সুতরাং পুর্ব্ব জাতিভেদপ্রথা দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সমীচীন নহে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে সমাজের লোকের ইচ্ছাবশতঃই হউক অথবা অনিচ্ছাবশতঃই হউক নীরবে জাতিভেদপ্রথা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও ভবিষ্যতেও হইবে; এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এই জাতিভেদপ্রথা একেবারেই উঠিয়া যাইবে। কিন্তু এই সময়ে কোন সভা-সমিতি কি কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া এই প্রথা উঠাইতে গেলে কেহ সক্ষম হইবেন কিনা তাহাতে গুরুতর সন্দেহ আছে; পক্ষান্তরে, উল্টাফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে এবং এই সময়ে আমরা যে দেশব্যাপী একতার কামনা করিতেছি, তাহা স্থাপনপক্ষে অনেক বাধা উপস্থিত হইবে। কারণ, এখন আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোক পূর্ণমাত্রায় জাতিভেদপ্রথা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এই প্রথা একেবারে উঠাইতে গেলে এই সকল শিক্ষিত লোক বিপক্ষ হইয়া পড়িবেন এবং দেশে একটি মহা দলাদলি, কোলাহল

ও অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ স্বদেশী আন্দোলন হইতে অন্য দিকে ধাবিত হইবে।

জাতিভেদপ্রথা আমি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করি না এবং এই প্রথা উঠিয়া গেলেই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইবে বলিয়া আমার কোন আশঙ্কা হয় না। কিন্তু, জাতিভেদপ্রথা আমাদের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমরা উহা আমাদের ধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেছি। আসল ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া এক্ষণ জাতিভেদপ্রথাকেই ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেছি। এমন কি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম পালন করেন না, যাঁহারা এক্ষণে হিন্দুসমাজভুক্ত নহেন, তাঁহারাও বিবাহাদিতে অনেক স্থলে পূর্ব্ব জাতিভেদপ্রথা অনেক পরিমাণে প্রতিপালন করিতেছেন। — দৃষ্টান্ত স্থল, অনেক বিদেশ-প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বজাতীয়ের কন্যা বিবাহ করিতেছেন ও স্বজাতীয়ের ছেলের সহিত কন্যাবিবাহ দিতেছেন। এইরূপ বিবাহ কেবল ব্যক্তিগত অবস্থাপ্রসূত বলিয়া আমার ধারণা নহে, পুরুষানুক্রমে বদ্ধমূল কু অথবা সু সংস্কারের আভাসও কতক পরিমাণে এই সকল বিবাহে বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, যখন এই শ্রেণীস্থ শিক্ষিত লোকই পূর্ব্বসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই, তখন হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ কিরূপে হঠাৎ এই বদ্ধমূল প্রথা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারি না। কাল ও দেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হিন্দুসমাজে নীরবে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহাই অবস্থানুসারে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এই স্রোতের গতিরোধ করাও যেরূপ অবিবেচনার কাজ হইবে, পক্ষান্তরে ইহার গতি হঠাৎ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টাও সেইরূপ অপরিণামদর্শিতার কার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয়। যখন দেশ ও কালের অবস্থার পরিবর্ত্তনে সমাজের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইবে যে, লোকে এই জাতিভেদ প্রথার দিকে একেবারে লক্ষ্যশূন্য হইবে, তখন এই প্রথা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে, অথবা উহার দূরীকরণ অতি অনায়াসসাধ্য হইবে। কিন্তু আমি একথা স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এই জাতিভেদপ্রথা অবলম্বন করিয়া আমাদের মধ্যে অন্য যে সকল প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা আবশ্যক। কিন্তু, আমার বিশ্বাস যে, তাহারা জোর জুলুম করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না এবং ঐরূপ কোন কার্য্য করাও দেশের উন্নতির অনুকূল নহে। তাঁহারা

নীরবে যেরূপ পরিবর্ত্তনের স্রোতের অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ঠিক সেইভাবে কার্য্য করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রথাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন বাড়িতে পরিবারস্থ অধিকাংশ লোকেই মুসলমান কি বিজাতীয় লোকের হস্তে প্রস্তুত করা সোডা, লেমোনেড্ ও বরফ অবাধে গলাধঃকরণ করিতেছেন, তখন তাঁহাদের জাত যাওয়ার ভয় হয় না; কিন্তু, যদি কোন ঘবে মুসলমান থাকে তবে সেই ঘরে এক গ্লাস জল পান করিতে বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হইতেছে; অথবা যে বিছানাতে হুকা রাখিয়াছে, সেই বিছানাতে একজন মুসল্মান কি অপব কোন জাতির লোক বসিলেই হুকার জল নষ্ট হইল বলিয়া মহা কোলাহল উপস্থিত হইতেছে এবং আমাদের এইরূপ আচরণে সেই মুসলমান কি অপর জাতীয় ভদ্রলোককে বিশেষরূপ অপ্রতিভ হইতে হয। কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহার হাতের জলপান নিষিদ্ধ, এরূপ লোক দধি, ক্ষীর ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে ও তাহা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিগ্রহণ করিতেছেন ও তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি ব্যাপার অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। আমার মতে, যখন সমাজ এই সকল অবস্থাতে কোন আপত্তি করিতেছেন না, তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকল পবস্পরবিরোধী প্রথা পরিত্যাগ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পাবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলে, বোধ হয়, অবশেষে জাতিভেদপ্রথা একেবারে উঠিয়া যাইতে পারে অথবা জাতিভেদপ্রথার দূষণীয় অংশগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জাতিভেদপ্রথা সম্যক্‌রূপে বজায় রাখিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিতে কি বাধা হইতে পারে? এবং ইংরেজ ও মুসলমানগণ যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, তাঁহারাও প্রকারান্তরে জাতিভেদপ্রথার অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, স্বদেশের উন্নতির সহিত ধর্ম্মের কি সম্পর্ক আছে? ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন কি পরস্পরবিরোধী হয় হউক, কিন্তু স্বদেশের উন্নতিসম্বন্ধে সকলে একমনপ্রাণ হইতে পারিব না কেন? একথা যে একেবারে অসার তাহা আমি মনে করি না। যদি প্রকৃত দেশহিতৈষণা কাহারও মনকে অধিকার করিয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে এরূপ ভাব সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে ঐরূপ ধারণা আসিতে পারে না। তাহার মনে জাতিগত বিদ্বেষই প্রবল হইয়া থাকে। সে বলিবে— এমন কি, এক্ষণে প্রতিদিন শত শতবার মুসলমানদিগের মধ্যে এইরূপ

কথা শুনিতে পাইতেছি যে— যদি তোমরা আমাকে ভাই বলিয়া ভাবিয়া গ্রহণ কর তবে ভাইএর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। কিন্তু, তুমি তাহা করিতেছ না, তুমি এখনও জাতিগত ঘৃণার চক্ষে আমাকে দেখিতেছ, আমি কিরূপে তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি? তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সরল ও সত্য কথা বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, ইহা মানবস্বভাবসিদ্ধ, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করি তবে সেও আমাকে ঘৃণা করিবে, অথবা আমার প্রতি দ্বেষপরবশ হইবে; সুতরাং ইহ'তে প্রকৃত জাতীয় একতার বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইতেছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে, এই যে এতকাল হিন্দুগণ পরাধীন অবস্থায় রহিয়াছে জাতিভেদপ্রথা তাহার মূল কারণ না হইলেও একটী প্রধান কারণ। এক সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলেই অপর সম্প্রদায়ে দ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, এরূপ পরশ্রীকাতরতাদোষ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে নিহিত রহিয়াছে। এই দোষ যখন ব্যক্তি ছাড়িয়া সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে তখন দেশের অনেক বিপদ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে জনসাধারণের মনে এই সাম্প্রদায়িকতার ভাব প্রবেশ না করিতে পারে, তাহারই বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু, জাতিভেদপ্রথা থাকিলে এই ভাব জনসাধারণের মনে আসিবে না। জাতিভেদপ্রথা যে, দেশের সমৃদ্ধির পক্ষে অনেক বাধা জন্মাইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন। এই প্রথার বশবর্ত্তী হওয়াতে দেশের অনেক প্রতিভাশালী লোক বিদেশে গমন করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছেন না, যাঁহারা জ্ঞানতৃষ্ণার বশীভূত হইয়া বিদেশে গমন করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন তাঁহাদিগকে আর সমাজ গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহারা বাধ্য হইয়া ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতেছেন এবং ক্রমে হিন্দুসমাজের সহিত সম্বন্ধ একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। এইরূপে সমাজ অনেক উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হারাইতেছেন এবং দিনে দিনে সমাজের অবনতি হইতেছে। বিদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও জাতিভেদপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অনেক লাভকর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সাহসী হইতেছেন না। ইহাতে দেশের উন্নতিপক্ষে বিশেষ বাধা জন্মাইতেছে। দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে, ইংরেজ ও মুসলমানদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা চিরস্থায়ী নহে। সত্য বটে, একজন ইংরেজ লর্ড অপর একজন সামান্য ব্যবসায়ী ইংরাজের সহিত আহার, ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাঁহার এই ভাব জাতিভেদ প্রথা প্রসূত নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, যখন সেই সামান্য ব্যবসায়ী ইংরেজ নিজ প্রতিভাবলে

ঐ ইংরেজ লর্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠেন, তখন আর সেই লর্ড তাহার সহিত আহার, ব্যবহার করিতে দ্বিধা করেন না। ইংরেজ ও মুসলমান দিগের মধ্যে এইরূপভাবে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এই ভাব তাঁহাদের মধ্যে পরশ্রীকাতরতার পরিবর্ত্তে একটি "স্বাস্থ্যকর" প্রতিযোগিতার ভাব আনিয়া উপস্থিত করে। তাঁহারা বেশ জানেন যে, যদি তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সমৃদ্ধিতে ঐ লর্ডের সমকক্ষ হইতে পারেন, তবে সেই লর্ডের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আর তাহাদের কোন বাধা হইবে না। কিন্তু, হিন্দুগণ জাতিভেদপ্রথার বশবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহাদের মনে এরূপ ভাব কখনই আসিতেপারে না। তাঁহারা জানেন যে, একটি নিম্নশ্রেণীর লোক সহস্রগুণে একটি উচ্চশ্রেণীস্থ লোক অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও সদগুণবিশিষ্ট হইলেও সমাজের নিকট তিনি হেয় এবং তাঁহার সহিত সমকক্ষভাবে ব্যবহার করা সমাজবিরুদ্ধ! পক্ষান্তরে, একটি উচ্চশ্রেণীস্থ লোক নানা দোষে দূষিত হইলেও তিনি সমাজের নিকট একজন পূজ্যব্যক্তি। হিন্দুসমাজের এই সকল কুপ্রথা যতই ধীরে ধীরে দূরীভূত হইবে ততই তাঁহাদের সমাজের ও দেশের উন্নতি সাধিত হইবে।

৪। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

বর্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মেব পুনঃ প্রতিষ্ঠা আমার মতে অসম্ভব, প্রাচীন কালে ইহার উপযোগিতা ও উপকারিতা যথেষ্ট ছিল, ইহাও বিশ্বাস করি। কিন্তু, বর্ত্তমান কালে, নানা সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির ঘাত প্রতিঘাতে ও অন্যান্য নৈসর্গিক কারণেই, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জাতিভেদপ্রথা শিথিল হইয়াছে এবং হইতেছে। তন্তুবায়ের পুত্র তন্তুবায় হইলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হয়— বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুসমাজ এখনও বিধ্বস্ত হয় নাই— ইহা স্বীকার করিলেও বর্তমান যুগে ইহার উপযোগিতায় সন্দিহান হইতে হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-contained) সমাজে জাতিভেদপ্রথা সমর্থনযোগ্য হইলেও, যে সমাজে বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সভ্যতার ভাবপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে, সেখানে জাতিভেদপ্রথা ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অক্ষুণ্নভাবে তিষ্ঠিতে পারে না। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। শূদ্রাদি জাতি ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিয়াছে। কালের মাহাত্ম্যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিলোপ হইয়া শূদ্রত্বে পরিণত হইতেছে, এই পরিবর্ত্তনের গতিরোধ করার সাধ্য কাহারও নাই, যাহা স্বাভাবিক তাহাকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে

গেলে সমাজের অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হইবে না। যাঁহারা জাতিভেদপ্রথার বিরোধী, তাঁহাদের চেষ্টাতেই যে জাতিভেদপ্রথার মূল শিথিল হইতেছে তাহা নয়, আমার মতে নৈসর্গিক কারণেই ক্রমে জাতিভেদ প্রথার মুলে কুঠারাঘাত হইতেছে। সমাজ শরীরের পুষ্টি বা ব্যাধি আহারের উপর নির্ভর করে। আমরা বর্ত্তমান যুগে যে শিক্ষা, দীক্ষা লাভ করিতেছি, যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছি, যে আদর্শের অনুসরণ করিতেছি, তাহাতে আমাদের সমাজদেহের পুষ্টির পক্ষে জাতিভেদ অনুকূল নহে। জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া আমরা অন্য জাতি, অন্য ধর্ম্ম ও অন্য দেশের সংশ্রবে আসিব; তাহাতে জাতিভেদপ্রথা নিশ্চয়ই শিথিল হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত আহার করিতে হইবে, একত্রে অবস্থান করিতে হইবে, ভাববিনিময় করিতে হইবে। নানাস্থানে, নানাদেশে গমন করিতে হইবে, সুতরাং পূর্ব্ববৎ জাতিভেদপ্রথার অনুসরণ অসম্ভব, রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষেও জাতিভেদপ্রথা একটি প্রধান অন্তরায়। সাম্যের অনুসরণ করিলে, যাহাতে বৈষম্য আনয়ন করে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের রাজনৈতিক আশা সাম্যমূলক। আমরা ইংরেজদিগের তুল্য অধিকার চাই। আমরা বলি আমরা তাহাদিগের সমান, ইংরেজগণ বলেন "কৈ তোমরা তো আমাদিগের সমান হইতে পার না। ব্রাহ্মণ শূদ্রের কত উপরে, আবার আমরা তোমাদের কত উপরে", একথার উত্তর নাই। সাম্য ও ভেদ একত্রে অবস্থান করিতে পারে না। জাতিভেদপ্রথা দূর করিবার জন্য কোন বিশেষ রাজবিধি কি সমাজবিধির প্রয়োজন নাই। নিসর্গ আপনা হইতেই বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী প্রথাকে আস্তে আস্তে পরিহার করিতেছেন। জোর করিয়া কেহ সমাজকে অগ্রগামীও করিতে পারে না, পশ্চাৎগামীও করিতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রথা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইতেছে। আমি আকস্মিক বিপ্লবের বিরোধী। আমরা সকলেই যদি আমাদের মতের অনুসরণ করি, তবে জাতিভেদপ্রথা আপনা হইতে আপনি শিথিল হইয়া পড়িবে।

ভাণ্ডার ।। আশ্বিন ১৩১৩ ষষ্ঠ সংখ্যা

জাতীয় বিদ্যালয়*

জাতীয় বিদ্যালয় ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল,† এখন, এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কি, সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর কোনো প্রয়োজন আছে?

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিষই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে, এ কথা বুঝাইয়া দিলেই যে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব ত অনেক আছে, অভাব আছে এই কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতরবিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড় জিনিষের সৃষ্টি করিতে পারে না। ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সের তালিকাযোগে লাভ, সুবিধা, প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুস্কিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ বল, আমাদের উপরে যে কিছু নির্ভর করিতেছে, একথা আমরা একরকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না বোঝা দুইই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি, দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের; অতএব আমাদের অভাব কি আছে না আছে, তাহা বোঝার দরুণ কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো

* ২৯শে শ্রাবণ [১৩১৩] কলিকাতা টাউন হলে জাতীয় বিদ্যালয়ের সভায় পঠিত। [—ভাণ্ডার প্রকাশক]

† বিপিন পাল - বর্ণিত "গোলামখানা" ছেড়ে বেরিয়ে-পড়া ছাত্রদের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় জাতীয় বিদ্যালয় চালু হলো ১৯১/১ বৌবাজার স্ট্রীটে (জুন ১৯০৬)। দুমাস পর ওই ঠিকানায় বসল কলেজ বিভাগ; অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অর্ধশতাব্দীর বিবর্তনে ওই প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। — **সংকলন-সম্পাদক**

সম্ভাবনা নাই। এমনতর দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরো বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্ম্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মী, এমন কি, অন্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক যতই আমাদের কর্ম্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে— এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব, তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে, পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে, পথ সেইখানেই। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথরচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না করা, সে অন্যের হাত— তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ, আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়ই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত-বড় অনুকূল, তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত-বড় শক্তি, ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালীর মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয়বিদ্যাব্যবস্থা আকারগ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালীর হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন— আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘকালেও হইবার নহে— পূর্ব্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক,

অসম্ভব, অসঙ্গত বলিয়া সবলে পক্কশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে, কত স্বল্পসময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেকদিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিতলাভ আছে, তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে— সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে, তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল, তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচজনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই— আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে— সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে— আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ কর— তোমরা অনুভব কর, বাঙ্গালীজাতির শক্তির একটি সফলমূর্ত্তি তাহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন— তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে, তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই যে জাতীয়শক্তির তেজ, ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর, তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড় বাড়ী, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গৌরব নহে, — তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালীর আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালীর ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালীর নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা— ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবেই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলি অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে-পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যদেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার

প্রবৃত্তি হয়— যেটুকু মেলে, সেইটুকুতেই গর্ব্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে, সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জ্জীবপদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিত বস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই যে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জ্জীব ব্যাপার নহে— আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল, সেইখানেই ইহার শেষ নহে— ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে— ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালী নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনো মতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না— সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীবসত্যের সেই সমগ্রমূর্ত্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব কর— সমস্ত বাঙ্গালীজাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে, তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি কর— ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবী করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোট হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধর— ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখ— ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে, সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড় নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ, ধর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো! কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না— ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না— কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া,

স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া, তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় নাই, সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইযা যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদেব দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না, তাহা নহে— কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরী করেন, ব্যবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্‌শন্ লইয়া ভাবিয়া পান না, কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে, তাহা নহে, দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, যে শক্তি আছে, সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজসরকারের চাকরীর ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়— কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দ্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালীজাতির চিরদিনের সম্বলের মত এই ভাণ্ডে, এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই? এই বিদ্যলয়ে দেখিতে [দেখিতে] যে সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্ত্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? একি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন, সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, একি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান

কবিবাব জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কবিবার জন্য করযোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে, সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগ স্বীকাব কবিতে পারে না। কেন পারে না? তাহাব কারণ, হিতকরকার্য্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মত কাজ আমাদের নিকটে বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমাদেব পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া বড় হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমবা এ পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গলেব জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্ত্তি ধরিযা আমাদেব প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত, তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পাবিতাম? ত্যাগস্বীকার মানুষেব পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবাব উপলক্ষ্য কেবল কথার কথা হইলে চলে না— চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠান-পত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে, প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ্য রচনা করিতে পারে নাই, তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট্ ও চাকরীর সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না—কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্ম্মেব মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে— সম্পূর্ণ সত্যেব প্রবল দাবী সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি— তাহাকে ভিক্ষুকের মত দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎভাব ও বৃহৎ কর্ত্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্র রূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায়, সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয়বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন, বাক্য এবং কর্ম্মের পূর্ণসম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতে হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড় হইয়া উঠে। অতএব জাতীয়বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে, তাহা নহে— কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত্ বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে, পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না— তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বদেশের মান্যব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব, তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না, তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথ দুর্গম— আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান্ জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্ব্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে অভিপ্রায় আর - কোনো দেশের আর - কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব, তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন, আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায় সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি, তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্ব্বহ দুঃখ কখনই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয়বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে— আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।

এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিকাল্ ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল্ ইকনমি। যাহাকিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে; সেই পড়াবিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে, যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল্ সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে, জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্‌গতি। যাহা অন্যদেশের শাস্ত্রসম্মত, তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্যদেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না! আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব— ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্ব্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র-দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকাল্ ইকনমিকে নিজের স্বাধীন-গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কি, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন, সেক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্ত্তি কিভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই!

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ

আমাদের চিন্তাকে নানাদিকে আঘাত করিতেছে— জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল— এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী এই মেলায় আমরা বালকের মত হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না;— সময় আসিয়াছে, যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথস্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই; বিদ্যারই কি, আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে— আচ্ছন্ন করে; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে, তখনি সে অমৃতলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে— নানা তথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে; পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ"— হে দেবগণ, আমরা কান্ দিয়া যেন ভাল করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি; "ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ"— হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়া দেখি— পরের বচন দিয়া না দেখি! জাতীয়বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরুবিদ্যার গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জ্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে, তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন কি, আমরা ভুল করিতেও সঙ্কোচবোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শতশত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভাল। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায়, সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক্, যেমন করিয়াই হউক্ শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব— আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকলবাঁধা দাঁড়ের পাখী হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠিত জাতীয়বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে— তাহারা যেন

অভয় প্রাপ্ত হয়— তাহারা যেন দ্বিধাবর্জ্জিত হইয়া নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে— তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"।

তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে—

"ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহা ভূমা, যাহা মহান, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই!

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে মন্ত্র বহুদিন এদেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন—

যথাপঃ প্রবতায়ন্তি, যথা মাসা অহর্জ্জরম্,
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন— স্বাহা।

সহং বীর্য্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য্য প্রকাশ করি।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু।

তেজস্বিভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক।

মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন*

হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা বর্ত্তমান যুগে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক উন্নতির সহায় কি প্রতিবন্ধক?

যাঁহার মতে উক্ত প্রথা উন্নতির প্রতিবন্ধক, তাঁহার মতে কি উপায়ে ইহা দূরীভূত হইতে পারে?

অপর পক্ষে যাঁহার মতে ঐ প্রথা উন্নতির সহায় তাঁহার মতে কি উপায়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা হইতে পারে?

বর্ত্তমানযুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

১। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতায় ভগবান বলিতেছেন ঃ—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

অর্থাৎ, গুণকর্ম্মের বিভাগদ্বারা আমা-কর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহার যেরূপ গুণকর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম্মের যোগ্যতা তদনুসারেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া, ভারতের আদিম নিবাসী বর্ব্বর দস্যুদিগকে প্ররাভূত করিয়া যখন এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বকীয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে যজনযাজনে প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইলেন; যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়পদবাচ্য হইলেন; যাঁহারা কৃষি ও পশুপালনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা বৈশ্যপদবাচ্য হইলেন; এবং সেই পরাভূত দস্যুরা— যাহারা তাঁহাদের দাসত্বে

---

* আশ্বিনের এই প্রশ্ন ভাদ্রমাসেরই পুনরাবৃত্তি। — **সংকলন-সম্পাদক**

নিয়োজিত হইয়াছিল— তাহারা শূদ্রনামে অভিহিত হইল। এইরূপ শ্রেণীবিভাগে, স্বাভাবিক নিয়মই অনুসৃত হইয়াছিল; এই চারিবর্ণের কর্ম্ম, গুণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং এই গুণ যাহাতে কুলপরম্পরাক্রমে স্থায়ী হয় তজ্জন্য শূদ্রেতর তিনবর্ণের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কালসহকারে শিক্ষাদীক্ষার অবনতিপ্রযুক্তই হউক, বা যে কারণেই হউক— গুণের প্রতি ততটা লক্ষ্য না করিয়া লোকে কুলের প্রতিই বেশী লক্ষ্য করিতে লাগিল; যে গুণের উপর কুলমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত, সেই গুণকে ভুলিয়া গিয়া, কুলকেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আমরা কোন বিশেষ কুলের গৌরব করি কেন?— না, যেহেতু, পরম্পরাগত শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে, সেই কুলে গুণের সম্ভাবনা বেশী। বিবাহের পাত্র নির্ব্বাচন সময়ে আমরা কুল খুঁজি কেন?— না যেহেতু সৎকুলে সদ্‌গুণ থাকাই সম্ভব— এই বিশ্বাসে। কিন্তু যখন আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অশিক্ষিত অসৎপাত্রকে— শুধু তার কুল ভাল বলিয়াই কন্যাদান করি, তখন আমরা কুলের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মর্য্যাদা ভুলিয়া যাই। গুণের স্বাভাবিক প্রভাব কমিয়া গিয়া, কুলের কৃত্রিম মাহাত্ম্য যতই বাড়িতে থাকে ততই সমাজকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধিবার দারুণ চেষ্টা হয়। কিন্তু কৃত্রিম নিয়মে সমাজকে বাঁধিতে যতই চেষ্টা কর, স্বভাবকে চিরকাল চাপিয়া রাখা যায় না; সময়ে সময়ে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিগত প্রতিভা অপ্রতিহতভাবে সমাজের মধ্যে আত্মশক্তি প্রকটিত করে। এই কারণেই আমাদের দেশে, দ্বিজেতর কুলেও তুকারাম, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সমাজের এইরূপ কৃত্রিম নিয়মে, নিকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে কত বড় প্রতিভা হয়ত অঙ্কুরেই বিদলিত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে! কৌলিকতার নিয়ম ও ব্যক্তিত্বের নিয়ম দুইই সামাজিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু যখন কৌলিকতার কৃত্রিম নিয়ম ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক নিয়মকে চাপিয়া রাখে তখনই তাহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

যাহাই হউক, পুরাকালে যে অবস্থায় বর্ণভেদপ্রথা আবশ্যক হইয়াছিল, সে অবস্থা এখন আর নাই। অবস্থা-অনুসারে ব্যবস্থা, প্রয়োজন-অনুসারে আয়োজন— ইহাই জগতের নিয়ম। যে সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি হয় সে সময়ে সমাজের শৈশবাবস্থা; সে সময়ে লোকসংখ্যা কম ছিল, অভাব কম ছিল, সুতরাং বৃত্তিসংখ্যাও কম ছিল; তাই চতুর্ব্বর্ণের দ্বারা সমাজের সমস্ত কাজই তখন সম্পন্ন হইত। এখন জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন সমাজের অভাব, প্রয়োজন বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি বৃত্তিসংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। পুরাকালে বিচারক, ব্যবস্থাপক, অধ্যাপক, যাজক— সমস্তই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারাই নিষ্পন্ন

হইত। এখন বিচারক হইতে হইলে, ব্যবস্থাপক হইতে হইলে, অধ্যাপক হইতে হইলে তাহার জন্য পৃথক্‌রূপে বিশেষ-শিক্ষার আবশ্যক। নিম্নস্তরের অনুন্নত জীবদেহে যেমন একটি প্রাণকেন্দ্র হইতেই সমস্ত জীবনীক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, এবং জীবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহে যেমন বিচিত্র যন্ত্রতন্ত্রের উদ্ভব হয়, সেই রূপ সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-শরীরের অবয়ববিভাগও ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে। অতএব, এখন আমাদের সমাজকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে বলাও যা', প্রৌঢ়কে শৈশবাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে বলাও তা'— একই কথা

পুরাকালে যে শিক্ষাদীক্ষার উপর বর্ণাশ্রমবর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই শিক্ষা-দীক্ষাই বা এখন কোথায়? অন্ততঃ উহার মধ্যে প্রাণ নাই; উহা অন্তঃসারশূন্য কতকগুলা বাহ্য চিহ্ন ও অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মনু বলেন ঃ—

—'ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং
ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যম্বু প্রসাদক
ন নাম গ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি'

অর্থাৎ— চিহ্নমাত্র ধর্ম্মের কারণ নহে, নির্ম্মলী জলে দিলে জল শুদ্ধ হয়, কিন্তু তার নাম-গ্রহণে হয় না। কিন্তু এখন আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মে নামগ্রহণমাত্রই সার হইয়াছে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ, ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণের পরিচয় আর কিছুতে বড় পাওয়া যায় না। মনু বলেন, বেদানভিজ্ঞ বিপ্রও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বিশুদ্ধ দ্বিজ এখন আর কোথায়? যে বেদাধ্যয়নের উপর দ্বিজত্ব নির্ভর করিত, যে বেদাধ্যয়ন দ্বিজজাতির অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে আদিষ্ট, সে বেদাধ্যয়ন কি এখন আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে? বঙ্গদেশে তো বেদবেদান্ত এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল বলিলেই হয়। রাজা রামমোহন রায় তৎপ্রতি আমাদের অনুরাগ দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। এখনো বেদ-উপনিষদের যাহা একটু চর্চ্চা আছে তাহা কেবল আর্য্যসমাজ ও আদিব্রাহ্মসমাজের মধ্যে; কেন না, উক্ত দুই সমাজে বেদ-উপনিষদপাঠ উপাসনার একটা অঙ্গ।

অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে প্রাচীন পত্তনভূমির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সাঙ্গবেদের অধ্যয়ন পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। কিন্তু সাঙ্গবেদের অধ্যাপনা সম্যক্‌রূপে করিতে পারেন এরূপ ব্রাহ্মণই বা কোথায়? তা'ছাড়া, দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থায় এই তীব্র জীবনসংগ্রামের দিনে, শাস্ত্রানুসারে জীবনের চতুর্থ ভাগ

কিংবা তদর্দ্ধভাগ অতিবাহিত করা কি সম্ভবপর? কিংবা ধন, বল, বিদ্যা, বুদ্ধি এখন কি কোন বিশেষ বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যাইতে পারে?— আবদ্ধ রাখিতে পারিলেও, এখন কি সমাজের পক্ষে তাহা হিতকর হইবে? এখনকাব শিক্ষার দ্বার সকলবর্ণের প্রতিই উন্মুক্ত;— সকলেই শিক্ষার অধিকারী। সুতরাং এখন যোগ্য ব্যক্তি সকলবর্ণের মধ্য হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং যতই লোকশিক্ষার প্রসার হইবে ততই এইরূপ যোগ্য ব্যক্তি আরো প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এখন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে বৃত্তিগত কোন ভেদ নাই। ব্রাহ্মণের কাজ শূদ্র করিতেছে, শূদ্রের কাজ ব্রাহ্মণ করিতেছে। একবর্ণের ধর্ম্ম অন্যবর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে সেকালে রাজাই তার দন্ডবিধান করিতেন। দণ্ডকারণ্যে শূদ্রমুনি শম্বুক কঠোর তপস্যা করিতেছিল বলিয়া রামচন্দ্র স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করেন। এখন আমাদের সে রাজাই বা কোথায়? এখন আমাদের রাজা বিদেশী। এখন ইংরেজের রেলগাড়ীতে, আদালতে, বিদ্যালয়ে, কর্ম্মস্থানে, বর্ণভেদনিরপেক্ষ সাম্যনীতিই অনুসৃত হইতেছে। যেরূপ কালের গতি, তাহাতে সাম্যতন্ত্রের দিকেই সমস্ত সমাজ অগ্রসর হইতেছে। এ স্রোত ফিরাইয়া দেওয়া কি কাহারও সাধ্যায়ত্ত? ইহা সত্ত্বেও যদি আমি এখন "বর্ণাশ্রম" "বর্ণাশ্রম" করিয়া চীৎকার করি, তাহা হইলে বোধ করি, আমাকে আপনারা আর এক আশ্রমে পাঠাইবার উদ্যোগ করেন— সেটি **বাতুলাশ্রম**!

পুরাকালে যখন আমাদের লোকসংখ্যা কম ছিল, জীবন-সংগ্রামের ততটা তীব্রতা ছিল না, তখন আমাদের সমাজের পক্ষে এই বর্ণাশ্রমপ্রথা উপযোগী ছিল সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, একালেও জাতিভেদপ্রথা, বৈদেশিকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব নিবারণ করিয়া, হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্য কতকটা রক্ষা করিয়াছে। জাতিভেদপ্রথার তেমন কড়াক্কড়ি না থাকিলে, বিজেতা মুসলমানেরা হয়ত আরো সহজে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিতে পারিত; এবং এইরূপে হিন্দুজাতি মুসলমানদিগের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়া, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইত। কিন্তু এই জাতিভেদপ্রথা, বৈদেশিকের ঘনিষ্ঠ সংস্রব হইতে সমাজকে যে পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে, সে পরিমাণে দেশকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই;— রক্ষা করা দূরে থাক; বরঞ্চ বৈদেশিকদিগের জয়সাধনে কতকটা সহায়তা করিয়াছে বলিলেও হয়। কেন না, আমাদের জাতীয়তা শুধু বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ থাকায়, আমাদের মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তা— জন্মভূমিগত জাতীয়তা— রাষ্ট্রিক জাতীয়তা তেমন স্ফূর্ত্তি পায় নাই। তাই আমাদের মধ্যে সে জাতীয় বল ছিল না, যাহাতে আমরা সমস্ত দেশের লোক এক হইয়া, বিদেশীর আক্রমণ হইতে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে

পারি। আজ বিধাতার অনুগ্রহে, একটা বিরাট জাতীয়ভাব আমাদের মধ্যে অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছে। এখন আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সমস্ত ভারতসন্তানকে লইয়া একটা বিরাট জাতিসংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই প্রকার জাতীয় একতার সহিত বর্ণভেদপ্রথা কি এখন খাপ্ খায়?

অতএব, চারিদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমার মতে, হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা, বর্ত্তমানযুগে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক উন্নতির সহায় হইতে পারে না। তবে আমা'র বিশ্বাস, "কিলিয়া কাঁটাল ভাঙ্গা" অপেক্ষা, কাঁটালকে কালের নিয়মে আস্তে আস্তে পাকিতে দেওয়াই ভাল।

২। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত

আমার মতে হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা আমাদের জাতীয় উন্নতির সহায় নহে। বরং শৃঙ্খলের ন্যায় আমাদের অগ্রগমনের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। শত শত ভিন্নবর্ণ কোন্ মহাত্মার ভেদনীতির ফল, তাহা জানি না। কিন্তু, ইহাতে জাতীয় একতা বিনাশ করিয়া অনেক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। সময়ে সময়ে আমরা এক এক বর্ণের ধর্ম্মঘটে তাহা টের পাইয়া থাকি। যদি কেহ ইহাকে Division of labour বলিয়া প্রশংসা করেন, তাঁহার নিকটে এই অনুরোধ যে, এইরূপ প্রথাবিভাগ থাকা সত্ত্বেও আহার ও বিবাহে কি পার্থক্য থাকিতে পারে? একথা জিজ্ঞাসা করি। এই বর্ণভেদ পূর্ব্বে যখন চারি অংশে বিভক্ত ছিল তখন কতকটা সহজ ছিল, কিন্তু তথাপিও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধে পুরাণ-ইতিহাস কলঙ্কিত। এক্ষণে শতবর্ণ উৎপন্ন হইয়া সহানুভূতি একেবারেই বিনাশ করিয়াছে।

এই জাতিভেদপ্রথা এক্ষণে কিরূপে সংশোধন করা যায়, ইহা এক মহাপ্রশ্ন। যদি একেবারে তুলিতে হয়, সমাজে মহান্ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণসন্তান তাহার চিরাগত কিম্বদন্তী লইয়া মুচির সহিত একাসনে বসিতে কখনও স্বীকার করিবেন না। আবার মেথর-মুদ্দফরাস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত সম-আসনে বসিতে সাহস করিবে না। সুতরাং আমি শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন যেরূপ একবার "ইন্ডিয়ান মিররে" লিখিয়াছিলেন তাহারই অনুমোদন করি।

১। বঙ্গের সকল শ্রেণীর বাহ্মণ— রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, উড়িয়া, হিন্দী সকল এক জাতি হইবে। এবং আহার বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্রাহ্মণের সহিত প্রচলিত হইবে।

২। বৈশ্য, সৎকায়স্থ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত প্রভৃতি জাতি দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর-বিবাহ, আদান-প্রদান, আহার-বিহার করিবেন। নিম্নশ্রেণীর মহাজন শিক্ষিত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতগণও এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন।

৩। ইতর কায়স্থ, নবশাখ, শিরিগণ ও সমস্ত জলচল জাতি তৃতীয় শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া বৈশ্যস্থানীয় থাকিবেন। প্রত্যেকেই আপন আপন জাতি-ব্যবসায় চালাইবেন। কিন্তু বনিক্, তিলি, তাতী, শাঁখারী প্রভৃতি স্ব স্ব ব্যবসায়ে থাকিয়াও আদান-প্রদান, বিবাহ একত্রে করিবেন।

৪। চতুর্থ শ্রেণীর সমস্ত জাতি একত্র আহার, বিবাহ করিবেন। এবং তাহাদের প্রতি সামাজিক ঘৃণা দূর করিয়া দিতে হইবে, তাহাদেরও জল চল হইবে। মনুষ্যে মনুষ্যে অত ইতর বিশেষ ভগবানের চক্ষে অতি বিসদৃশ। অতএব ভাই হিন্দু, এই বিনীত অনুরোধ, এই চিরাশ্রিত অথচ সমাজের পৃষ্ঠবল এই শূদ্র সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিয়া জাতীয় দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করিবেন না। বরং যখন সম্ভব ইহাদিগকে উন্নত করিয়া তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম স্তরে গ্রহণ করিবেন। কালে যখন আবার জাতিভেদসংস্কার হইবে, তখন এই চারিবর্ণ দুই বর্ণে ও কালে "ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং" কথা হিন্দুসমাজে ঘোষিত হইবে।

আর হিন্দুগণের এক্ষণে মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের প্রতি বিভেদ দূর করিয়া অন্ততঃ তাহাদের সহিত একত্র জলপানাদি প্রচলিত করার সময় আসিয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে আর তাঁহাদের ভিন্ন মনে না করিয়া হিন্দু বলিয়াই মনে করিলে জাতীয় অভ্যুত্থান নাতিদূরবর্ত্তী হইবে। এবিষয়ে হিন্দুগণকে আমি সবিনয় অনুরোধ করি।

৩। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস পাল চৌধুরী

হিন্দুসমাজে বহুকাল হইতে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত। উদ্দেশ্যশূন্য কার্য্য প্রায়ই দেখা যায় না, যখন জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজে প্রথম প্রচলিত হয়, তখন তৎকালিক সমাজের সমস্ত অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াই ইহা প্রচলিত করা হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে ইংরেজ কর্ত্তৃক ভারত অধিকার পর্য্যন্ত এই প্রথা অক্ষুণ্ণভাবে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজাধিকারের পরেও কিছু দিন হিন্দুসমাজের জাতিভেদ জাতীয় সমৃদ্ধি বা রাজনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক, ইহা

কেহ মনেও করে নাই— ইহার কারণ কি? হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংলিপ্ত করা হইয়াছে— জাতিভ্রষ্ট হওয়া আর হিন্দুধর্ম্মচ্যুত হওয়া একই কথা— এই বিশ্বাসের জন্যই বুদ্ধদেব এবং গৌরাঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষেরা জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে উঠাইতে পারেন নাই।

ইংরেজ ভারতে আসিল, পাশ্চাত্যশিক্ষাও সঙ্গে আসিল এবং সরলমনে অকাতরে ভারতবাসীকে বিতরণ করিতে লাগিল। নূতন শিক্ষা, নূতন ভাব ভারতবাসী আগ্রহে গ্রহণ করিল— ক্রমে ইহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল— রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এই পাশ্চাত্যশিক্ষার ফল। এই শিক্ষার ফলেই আজ সম্পাদক মহাশয় এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

কালের পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিক সমস্ত প্রথারই প্রায় পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জাতিভেদপ্রথার আবশ্যকতা পুরাকালে থাকিলেও বর্ত্তমান যুগে যে তাহাব পরিবর্ত্তন যা দূরীকরণের কারণ উপস্থিত হইয়াছে— তাহা প্রবন্ধ লিখিয়া, তর্ক করিয়া কিম্বা যুক্তি দেখাইয়া সুপ্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। ঘোষজা, বসুজা, কি দত্তজা, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, সম্ভ্রম এবং চরিত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় কি মুখোপাধ্যায় মহাশয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও জাতিভেদপ্রথা অনুসারে বন্দ্যোপাধ্যায় কি মুখোপাধ্যায়ের সহিত অপরের কন্যা-পুত্রের বিবাহের তো কোনো কথাই নাই। এইরূপ প্রথা যে, এক জাতির সহিত অপর জাতির সৌহার্দ্দ্যের, নৈকট্যের এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতির প্রতিবন্ধক এবং তজ্জন্য জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক উন্নতিরও প্রতিবন্ধক তাহাও কাহাকে বুঝাইতে হইবে না। ভেদ ব্যক্তিগত হইলে সমাজের উন্নতির কারণ, কিন্তু জাতিগত হইলে অবনতির কারণ হইয়া উঠে।

সমাজের বাহির হইতে কোন শক্তি প্রয়োগ দ্বারা জাতিভেদ দূরীভূত করা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে বুদ্ধদেব কি গৌরাঙ্গের পরে হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা থাকিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জাতিভেদপ্রথা হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংলিপ্ত করা হইয়াছে; জাতিভ্রষ্ট হইলে পরকালে নিরয়গামী হইতে হইবে, ইহা অন্তরের বিশ্বাস, এই বিশ্বাস দূরীভূত না হইলে জাতিভেদও দূরীভূত হওয়া সুকঠিন। বিশ্বাস বাহ্যিক শক্তিদ্বারা দূরীভূত হয় না— ইহাকে দূরীভূত করিতে হইলে আভ্যন্তরিক শক্তির প্রয়োজন, এই আভ্যন্তরিক শক্তি কিরূপে জন্মাইতে পারা যায়? সাধারণত দেখা যায়, শিক্ষিতসমাজে জাতিভেদের বন্ধন শিথিল ও অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সমাজের মধ্যেই জাতিভেদের বন্ধন দৃঢ়; কেবল তাহাই নহে, যে সমাজ সাধারণত যত উন্নত,

জাতিভেদ বন্ধন তথায় ততই শিথিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শিক্ষা জাতিভেদ দূরীকরণের প্রধান উপায়। শিক্ষা যতই বিস্তৃত ও উচ্চতর হইবে জাতিভেদবন্ধন ততই শিথিল হইতে শিথিলতর হইবে এবং ক্রমে একেবারে দূরীভূত হইবে।

৪। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্.এ

হিন্দুসমাজের জাতিভেদপ্রথা বর্ত্তমানযুগে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক উন্নতির সহায় কি প্রতিবন্ধক— এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমতঃ সমৃদ্ধি ও উন্নতি অর্থে পাশ্চাত্য আদর্শে অর্থনীতি ও রাজনীতিসম্মত শুধু জড়শক্তির বিকাশ বুঝিতে হইবে, কি হিন্দু জাতির প্রাচীন আদর্শে ধর্ম্মোন্নিতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যাবতীয় শক্তিনিচয়ের চরমোৎকর্ষ বুঝিতে হইবে— তাহা জানা আবশ্যক; কারণ একভাবের উন্নতি কোন কোন বিষয়ে অন্যভাবের উন্নতির বিরুদ্ধ হইতে পারে। যদি পাশ্চাত্য ভাবের সমৃদ্ধি ও উন্নতি একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে জাতিভেদের প্রথা না থাকিলেও বিশেষ অনিষ্ট হয় বলিয়া আমার মনে হয় না; কারণ হিন্দুর বর্ণভেদপ্রথা ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত। পক্ষান্তবে, হিন্দুর প্রাচীন আদর্শে উন্নতিসাধন করিতে হইলে, জাতিভেদপ্রথা উন্নতির প্রতিবন্ধক হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষভাবে উহার সহায়তাই করে। অদ্বৈতবাদ যে ধর্ম্মের মেরুদণ্ডস্বরূপ, সর্ব্ববিধ ভেদরাহিত্যই যাহার প্রধান লক্ষ্য, সেই অভেদাত্মক সনাতনধর্ম্ম-সেবকদের মধ্যে এরূপ একটা ভেদপ্রথা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে, তাহাই প্রথম বিচার্য্য বিষয়। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই ভেদবাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে যাহা ভেদজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই যথাসম্ভব সমতা-স্থাপনের নিমিত্ত অবলম্বিত হইয়াছে। অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি করিবার অধিকারী হইতে হইলে, যেরূপ অশাস্ত্রীয় দ্বৈতভাব নিরাস করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈতভাব অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেরূপ সমাজস্থ বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সম্ভাবিত সাম্যভাবে স্থাপন করিতে হইলে, যথেচ্ছ বৈষম্য বিদূরিত করিবার নিমিত্ত একটি সুনিয়ন্ত্রিত ভেদপ্রথা অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভেদভাব সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, প্রত্যেক সমাজেই জ্ঞাপক, রক্ষক, পোষক এবং সেবক এই চারি শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। এই চারি শ্রেণীর এক শ্রেণীর অভাব হইলে, সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অন্যান্য দেশে সুক্ষ্মভাবে সমাজকে বিশ্লেষণ

করিয়া এই চারিশ্রেণীকে বিশিষ্টভাবে বিভক্ত করা হয় নাই; কিন্তু প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ সমাজে সুশৃঙ্খলতা স্থাপনের নিমিত্ত এই চারিশ্রেণীর কর্ত্তব্য কার্য্য সকল ভিন্ন-ভিন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং এই সামাজিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াই ভারতীয় আর্য্যগণ এক সময়ে কি ধর্ম্ম-সম্পদে, কি অর্থসম্পদে, সর্ব্ববিধভাবেই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই সনাতন প্রথা যখন বিচিত্র শোভায় হিন্দুসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখনই ইহার জ্ঞাপকশ্রেণী ষড়্দর্শন রচনা করিয়াছিলেন, রক্ষকশ্রেণী সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিতেন, পোষকশ্রেণী কৃষিবাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়' ধনধান্যে দেশকে পূর্ণ করিয়া গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেবক সম্প্রদায় নিঃস্বার্থ সেবাদ্বারা আপেক্ষিক অজ্ঞতাসত্ত্বেও প্রকৃত ধর্ম্মসম্পদ লাভ করিয়া পরমসুখে দিনযাপন করিতেন। মানবসমাজে ধনসম্পত্তির প্রভুত্ব স্বাভাবিক; কিন্তু এই প্রভুত্বকে যদি যথেচ্ছভাবে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে ইহা দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচারে পরিণত হয় এবং তাহার ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সময়ে সময়ে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্যসমাজের ইতিহাসই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমানযুগেও এবম্বিধ অত্যাচার নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রেরই নয়নগোচর হয় এবং জড়শক্তিব ক্রমবিকাশের সহিত এই অত্যাচার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে— এরূপ লক্ষণও দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশেও সামাজিক শাসনের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে ধনীদরিদ্রের মধ্যে ভেদভাব ক্রমেই প্রবল হইতেছে। বঙ্গদেশে জমীদার সন্তানদের জন্য পৃথক কলেজ স্থাপন বিষয়ে জমীদারগণের সহানুভূতিই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে সমাজে এই ধনসম্পত্তির অথবা অন্যবিধ জড়শক্তির যথেচ্ছ প্রভুত্ব সংযত করিবার নিমিত্ত রাজশক্তিব্যতীত অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ক্রিয়াশীল নহে, সেখানে এরূপভাবের ভেদভাব অনিবার্য্য; কারণ রাজশক্তি অনেক সময়েই এই প্রভুত্বের প্রতিকূলতা না করিয়া বরং সহায়তাই করে। রুষ দেশের বর্ত্তমান সংঘর্ষের ইতিহাসই ইহার প্রমাণ। জ্ঞানধর্ম্মের প্রভুত্বই প্রকৃতভাবে ধনসম্পত্তির প্রভুত্বকে সংযত করিয়া রাখিতে সক্ষম; বিশেতঃ জ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি ধনসম্পত্তিকে তুচ্ছ করিয়া— স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব সাম্যভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। জাপানে যে সামুরাই শ্রেণীর মধ্যে অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা নাই, ইহাও বোধ হয় সমাজের হিতচেষ্টায়ই বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত ভারতের ব্রাহ্মনগণ ধনরত্নের আকাঙ্ক্ষা করিলে, কিছুতেই নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে

পারিতেন না, এবং ক্ষত্রিয়াদি জাতির ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিতেন না। তাই বলিতেছিলাম, যথেচ্ছ বৈষম্য বিদূরিত করিবার নিমিত্তই হিন্দু সমাজে বর্ণভেদপ্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। জাতিভেদের মূলতত্ত্ব আমার এরূপই মনে হয়। গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী শ্রেণীবিভাগেরও ইহাই তাৎপর্য। বিস্তারিতভাবে এই তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থ লিখিতে হয়। উপরোক্ত যুক্তির আশ্রয়ে বর্ণভেদ প্রথা-প্রচলন বিষয়ে বোধ হয় আধুনিক সাম্যবাদীরও আপত্তি থাকে না; কিন্তু বংশপরম্পরায় বর্ণ নির্দ্দেশ করিবার তাপৎর্য্য কি, এবং এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নীত হইবার পথ রুদ্ধ কেন? আন্তজার্তিক বিবাহ ও যথেচ্ছ আহার নিষিদ্ধ কেন— এসব বিষয়ে অনেক সময়েই তর্ক উপস্থিত হয়। সাময়িকপত্রাদিতে এসব বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিস্তর যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, আমি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়াই ইহার আলোচনা হইতে নিরস্ত হইব। বংশপরম্পরায় জাতিনির্দ্দেশ না করিলে গুণ ও কর্মবিভাগ তিষ্ঠিতে পারে না; কারণ মানুষ পূর্ণবয়স্ক না হইলে তাহার আভ্যন্তরিক গুণের বিকাশ হয়না; সুতরাং পূর্ণবয়স্ক হইবার পূর্ব্বে পুত্র পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইবে, এই স্বাভাবিক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই স্ববর্ণোচিত সংস্কারাদি ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে; এবং যদিও সময় সময় সংসর্গ শিক্ষাদির প্রভাবে এই নিয়মের কতকটা ব্যতিক্রম ঘটায়, তথাপি সমষ্টিভাবে ধরিতে গেলে গুণ ও কর্ম্ম বংশপরম্পরায়ই অনুসৃত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভারতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হয়। একজাতি হইতে অন্য জাতিতে উন্নীত হইবার পথ রুদ্ধ না থাকিলে, সমাজে বিপ্লব ঘটিবারই সম্ভাবনা এবং সর্ব্বজ্ঞ সমাজপতি ব্যতীত তাহা হওয়াও অসম্ভব। উচ্চজাতির গুণসকল বিদ্যমান না থাকিলে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙক্ষা এবং তজ্জনিত সম্মানলাভ করিবার ইচ্ছা সকলের মনেই প্রবল হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু জন্মের উপরে যখন কাহারও আধিপত্য নাই, তখন জাতিপরিবর্ত্তনের কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, সকলেই স্ববর্ণোচিত কর্ম্ম করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। একশ্রেণীর লোকের অন্য শ্রেণীর উপযুক্ত প্রতিভা জন্মে না— ইহা আমি বলিতে চাহি না, সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে সমষ্টিভাবে ধরিতে হয়, ব্যষ্টিভাবে বিচার চলে না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও বুদ্ধদেব জন্মিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের মধ্যেও দ্রোণাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু বর্ণভেদপ্রথা বর্ত্তমান সত্ত্বেও ইঁহাদের প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার কোনই বিঘ্ন হয় নাই। আন্তর্জাতিক বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও, গুণ ও কর্ম্মবিভাগ প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যখন লোকসংখ্যা অল্প্ ছিল,

তখন অনুলোমবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর উপবিভাগগুলি তুলিয়া দিলেই যথেষ্ট। যথেচ্ছ আহার নিষেধের বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। মানুষ ধর্ম্মের পথ হইতে বিপথে না যায় তজ্জন্যই সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক-ভেদে আহারের ব্যবস্থা। বর্ণভেদপ্রথার প্রকৃততত্ত্বগুলির বিচার না করিয়া, উপস্থিত সময়ে ইহা জাতীয় সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক উন্নতির সহায় কি প্রতিবন্ধক— এই প্রশ্নের উত্তর হয় না বলিয়া একটু উপক্রমণিকা করিয়া লইতে হইল।

বর্ত্তমান যুগে লৌকিক কর্ম্মগুলির বিশিষ্টভাবে বিভাগ না থাকাতে, বর্ণভেদপ্রথা একটু বিসদৃশ বোধ হইতেছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যাহা আদর্শ, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিতে গেলে তাহা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা বর্ত্তমান সমাজের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু বিবিধ প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি-সমূহের সংঘর্ষসত্ত্বেও, কর্ম্মের বৈদিক অংশের বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যতটুকু এখনও আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদসাধন করিতে গেলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হইবে, কারণ উহা হইতে ধর্ম্মোন্নতিসম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবেই সহায়তা লাভ করিতেছি। এবং আমাদের আত্মরক্ষার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে যে সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা হইয়াছে— উহা কোনক্রমেই তাহার প্রতিবন্ধকতা-আচরণ করিতেছে না। জাতীয় উন্নতির পথে যতগুলি অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধিৎসাই প্রবল। যে সকল শিক্ষিত মুসলমানগণ ধর্ম্মমতসম্বন্ধে স্বাধীনতার বিরোধী নহেন, তাঁহারা যে স্বদেশী-আন্দোলনে আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন, ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, শিক্ষার উন্নতির সহিত একটা উদারতার উৎকর্ষসাধিত হইলেই, জাতিগত আচারাদি ভেদহেতু পরস্পর ঘৃণাভাব বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। আমাদের এখন আপদকাল উপস্থিত, তাই বলিয়া যে কখনও সম্পদের দিন আসিবে না— এরূপ মনে ভাবাও পাপ। আপদের সময়েই বিশেষ সতর্কভাবে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ধর্ম্মকে এখন ছাড়িয়া দিলে, আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।* দেবতার জাতি নির্ব্বিশেষভাবে পশুত্বকেই আদর করিতে শিখিবে; আধ্যাত্মিকতাকে জাতীয় আবর্জ্জনা মনে করিবে; প্রাচীন আদর্শে সমাজ গঠিত করিবার প্রবৃত্তিই থাকিবে না।

* (১) এই আদর্শকে কাউন্ট টলষ্টয় এবং অন্যান্য সূক্ষ্মদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পরে বলিতেছে "ঘরে তব কুললক্ষ্মী" তথাপি আমাদের চেতনা হয় না।

বর্ণভেদপ্রথা বর্ত্তমান থাকাতেই যুগযুগান্তর ধরিয়া হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে; এবং যতদিন এই প্রথা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই বিশেষত্ব কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। মুসলমান রাজত্বের সময় আত্মকলহদ্বারা আমরা এতই শক্তিহীন হইয়াছিলাম যে, জাতিভেদেব কতকটা বাঁধাবাঁধি না থাকিলে ইসলামধর্ম্মের প্রবল প্রত্যপ হইতে হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব রক্ষা করাই অসম্ভব হইত। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভারতের আত্মকলহের ইতিহাসে এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবোধের একটি ঘটনাও বিবৃত হয় নাই; অধিকন্তু পরস্পর সম্পর্ক হইতে ক্ষত্রিয়সন্তানদিগের মধ্যে সখ্যস্থাপনই অনেক ব্রাহ্মণের চেষ্টা ছিল। আত্মপ্রাণে মায়া না করিয়া রাজপুতপুবোহিতের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিবারণ চেষ্টাই ইহার উদাহরণ। বর্ণভেদপ্রথা না থাকিলে এই দেড়শত বৎসর মাত্র ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আমরাও Imperial Anglo Indian বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিতাম। এরূপ শোচনীয় পরিনাম কি কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে যে আত্মকলহ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও একবর্ণের সহিত অন্যবর্ণের নহে; এই কলহ স্বার্থের সহিত নিঃস্বার্থভাবের, এবং একের স্বার্থের সহিত অন্যের স্বার্থের, আর কিছুই নহে। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আপাত দৃষ্টিতে যাহা অনিষ্টজনক মনে হইতেছে, তাহাই অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের অশেষকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। তবে নিরপেক্ষ বিচারক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সমাজপতির অভাবে এবং শিক্ষাসংসর্গাদির প্রভাবে, এই পরম সুফলপ্রদ সামাজিক উদ্যানে কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছে; এবং তজ্জন্য পুষ্পফল প্রদায়ী বৃক্ষ সকল সতেজে বাড়িতে পারিতেছে না। সমাজসংস্কারকদের এখন এই আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলিয়া উদ্যান পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু অভিজ্ঞ উদ্যানরক্ষকের ন্যায় অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে; আগাছা উৎপাটিত করিতে গিয়া যেন মূল উদ্যানের কোন অনিষ্ট না ঘটে। ক্ষণস্থায়ী অকল্যাণকর প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিতে গিয়া যেন যুগান্তরস্থায়ী বর্ণভেদপ্রথার কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটিত না হয়। সুসংস্কৃত জাতীয়শিক্ষা যথেষ্টরূপে বিস্তৃতিলাভ করিলে, আন্তর্জাতিক উপবিভাগ, বিকৃত কৌলীন্য প্রভৃতি অকল্যাণকর প্রথাগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে, এবং বিদ্যালাভার্থ সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতির নিমিত্তও কাহারো আজীবন জাতিচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে না। আমি স্বদেশভক্ত বিলাত ফেরতদিগকে কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে পুনঃগ্রহণ করিবার পক্ষপাতী; কিন্তু তাহাদিগকে স্বস্ব বর্ণোচিত সামাজিক আচারাদি পালন করিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে যাহা

দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ইহাদিগের পূর্ব্ব মতিগতি অনেক ফিরিয়াছে। সুতরাং এই বিষয় বাঁধাবাঁধি আপনা হইতে শিথিল হইয়া আসিতেছে। স্মৃতির বৈদিক অংশই পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু লৌকিক অংশ চিরকালই পরিবর্ত্তিত হইয়া অসিতেছে, সুতরাং ইহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগেরও বিশেষ অমত হইবে এরূপ আমার মনে হয় না। গুরুত্ব ও পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মাণগণেরও অবস্থানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে কোন কোন বিষয়ে সংস্কারের আমি পক্ষপাতী, কিন্তু মূল বর্ণভেদপ্রথার আদর্শের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে যখন আমাদের প্রকৃত সম্পদের দিন আসিবে, তখন অপূর্ব্ব প্রভাবসম্পন্ন তখনকার জাতীয় নেতাকে সমাজপতিত্বে বরণ করিয়া পুনরায় প্রাচীন আদর্শে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইবে না। তখন দেবতাগণ স্বর্গ হইতে পুনরায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিবেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তখন আর পেটের ক্ষুধায় আর্ত্তনাদ করিবে না। তখন জড়শক্তির উপর ধর্ম্মের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল

আমাদের মধ্যে আজকাল দুইটি দল হইয়াছে; একদল বলিতেছেন— জাতিভেদ উঠাইয়া দাও। 'যদি বড় হতে চাও, দেশোদ্ধার করিতে চাও, দেশ বিদেশে গমন করিয়া শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতিতে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে চাও, তবে জাতি ছাড়। জাতি থাকিতে কিছু হবে না। কবে কোন্ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক সংস্কার হইয়াছে, অথচ জাতি যায় নাই? হায়, যাঁহাদের মনে মনে পূজা করি, আদর্শ বলিয়া মনে করি, যাঁহাদের কলম স্পর্শ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করি, যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিলে আত্মাকে উন্নত বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের কাহারও জাতি নাই। সুতরাং আমরা জাতি চাই না, তাঁহাদের চাই।'*

অপর দল বলেন,— 'জাতিভেদপ্রথা একবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত নহে। একবারে তুলিয়া দিয়া সকলকে সমান করিয়া যে, তখনকার সামাজিক অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। হয় তো ভালও হইতে পারে— কিন্তু মন্দ হইবার আশঙ্কা যে নাই, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রাসাদের স্থানে স্থানে

* নব্যভারত ১৩১১ সাল

ভগ্ন হইলে, একবারে সমস্ত নষ্ট না করিয়া ভগ্ন অংশ সংস্কৃত করাই কি উচিত নহে? আমরা সকলেই দেখিতেছি, কালের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত সহিয়াও বর্ত্তমান প্রথা টিকিয়া রহিয়াছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই'। ইত্যাদি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমিও এই শেষোক্ত দলেরই একজন। যে দেশে ও সমাজে বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতিভেদপ্রথা চলিযা আসিতেছে সে দেশ বা সমাজ হইতে যে উহা সহজে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা তুলিয়া দেওয়া উচিত, তাহা আমাব মনে হয় না।

গীতায় আছে,— "চতুর্ব্বর্ণা ময়া সৃষ্টা গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতিব ক্রমানুসারে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও কর্ম্ম ও বৃত্তি অনুসারে সমাজে তাহা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। যাহারা যে প্রকাব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত, তাহারা সেই কার্য্যেব গুণ বা যোগ্যতানুসারে এক বিশেষ জাতিতে পরিণত হইত। অর্থাৎ যাঁহারা যজনযাজন, অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহাবা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহাবা ক্ষত্রিয়। এইরূপ বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতিরও পৃথক্ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। কালক্রমে এই চতুর্ব্বর্ণ হইতে এদেশে নানা উপজাতির সৃষ্টি হয়, কর্ম্মবিভাগবশতঃ জাতিবিভাগ হওয়ায়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতির অভাব ছিল না। এই প্রীতি, সহানুভূতি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সে সম্প্রদায়ও অপরাপর সম্প্রদায় হইতে ততই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। অবশেষে তাঁতী, কামার, কুমোর প্রভৃতি শিল্পীসম্প্রদায় এক এক পৃথক জাতিতে পরিণত হয়।

জাতিভেদপ্রথার প্রথম সূত্রপাতসময়ে উহা বংশগত ছিল না, কিন্তু কালক্রমে তাহা বংশগত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির যে সমুদয় স্বাভাবিক গুণ বা লক্ষণসমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল, জাতিভেদ বংশগত হওয়ায় তাহাও সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব হইয়া যায়। তবে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক বর্ণের অধোগতি হইতে থাকায়, ঐ সকল গুণাবলীর পরিমাণও মন্দীভূত হইয়াছে। স্বকর্ম্মদোষেই যে, এরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে তাহার আর পূর্ণ [?] নাই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও ভারতীয় চতুর্ব্বর্ণ বংশগত গুণাবলী হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই।

স্মরণাতীতকাল হইতে প্রচলিত এই জাতিভেদপ্রথা ভারতবর্ষ হইতে সমূলে উৎপাটিত করা সুসাধ্য কিনা, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। তদ্রূপ সুসাধ্য হইলেও জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেও যে তাহার ফল কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? পরে যে তাহা হইতে আরো অনর্থ সংঘটিত হইবে না, তাহারই বা কি নিশ্চয়তা আছে?

সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাই— ধর্ম্ম; তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা সংসার-যাত্রা নির্ভর [নির্বাহ] করিতেছি। সুতরাং তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইলে, বিপুল শক্তিসামর্থ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন। একজন মনীষী লিখিয়া গিয়াছেন—

"Custom is a violent and treacherous school-mistress, who, by little and little, slyly, unperceived, steps in the foot of her authority, but having thus by gentle means and humble begininngs with the hand of time established it, unmakes [unmasks] a furious and tyrannical countenance against which none has the courage nor the power so much as to lift up his eyes."

পণ্ডিত বিষণ রাম বলেন যে, জাতিভেদপ্রথা চিরকাল চলিতে থাকিবে, তাহার বিরাম, বিস্মৃতি আমাদের পক্ষে শুভফলপ্রসূ নহে।

"Caste system, an institution of the immemorial antiquity which has made its impression upon every nerve and fibre of our social organism will continue to exist."

এই জাতিভেদ কোন জাতির মধ্যে নাই? সাম্যবাদী ইংরেজদিগের মধ্যে কি নাই? একেশ্বরবাদী মুসলমানসমাজের মধ্যে কি জাতিভেদ নাই? তবে উক্ত দুই সমাজের ভেদনীতি হইতে হিন্দুসমাজের ভেদনীতি কিছু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইংরেজদিগের জাতিভেদ মুখ্যতঃ অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ধনবান ও উচ্চবংশসম্ভূত ইংরেজ কখনও নির্ধন ও নীচবংশীয় ইংরেজের সহিত আহার, বিহার বা আদান-প্রদান করেন না। তবে নিম্নশ্রেণীর লোকের হস্তে আহারাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের জাতিভেদ আধ্যাত্মিক উপচীকির্ষার তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার ফলে শূদ্রের সন্তান চিরকাল শূদ্রই রহিয়া যায়। ইংরেজ সমাজের জাতিভেদে স্থিতিস্থাপকতা গুণ পরিদৃষ্ট হয়, হিন্দুসমাজের জাতিভেদে ঐ গুণের সম্পূর্ণ অভাব। এই অভাব মোচন করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং সমাজের দূষিত অংশের পরিহার বা তাহার সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন; তাহাতে কাহারো আপত্তি হইতে পারে না,— আমাদের শাস্ত্রও তদ্রূপ নিষেধ করেন না। মাননীয় চন্দ্রবরকর 'Social Reforms' নামক পুস্তকে এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"The Shastras have been more liberal than we care to be, by giving us a free hand to deviate from them when necessary;

...the shastras are valuable means of showing that our history has been a history of change."

এখন আমরা বলিতে পারি যে, হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদপ্রথা একবারে তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে এবং সম্ভবপরও নহে। তবে স্থানে স্থানে উহার সংস্কার প্রয়োজন, যাহাতে আমবা— হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, মারাঠী, শিখ, পার্শী প্রভৃতি প্রত্যেক জাতি একত্রে একসূত্রে আবদ্ধ হইযা জাতীয় সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক উন্নতির সহায়তা করিতে পারি। জাতীয় উন্নতির মূল উপাদান,— জাতীয় একতা, ধর্ম্মের একতা, আচাবব্যবহাবেব একতা এবং দেশের ও বাজায় একতা। শেষোক্ত দুইটি বিষয়ের একতা ভিন্ন ভাবতবর্ষে অপব কযেকটি বিষয়ের একতা কিছুতেই সংসাধিত হইতে পারে না। ভারতভূমি আমাদের সকলেবই মাতা,— হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি এই একই মাতার ভিন্ন ভিন্ন সন্তান। এই ভারতমাতার অন্ন-জলে সকলেই পুষ্ট হইতেছে, এই ভারতের বায়ু, ভারতের সম্পদ সকলজাতিই সমানে ভোগ করিতেছে ও করিবে এবং ভারতমাতার এই সকল সন্তানই এক রাজার— ইংরেজ কর্ত্তৃকই শাসিত হইতেছে। সুতরাং ভারতবাসীমাত্রেই বলিবে— "হিমালয আমাদেব, গঙ্গা-যমুনা ও সিন্ধু-কাবেরী আমাদের, বিন্ধ্যাচল আমাদের, কলিকাতা, বাবাণসী, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি নগর আমাদের, ভারতমাতার ধনরত্ন, বিভব, সম্পদ আমাদের এবং ভারতমাতাও আমাদের। আমবা সকলেই এক মায়ের সন্তান, আমরা সকলেই এক মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমরা সকলেই এক মায়ের স্তন্যে লালিত পালিত হইতেছি; আমাদের আচার-ব্যবহার, রুচি, ধর্ম্মমত, ভাষা ও কার্য্যকলাপ বিভিন্ন হউক, কিন্তু আমরা আমাদের জননীর নিকট অভিন্ন; আমরা সকলেই ভাই ভাই; আমরা সকলেই মায়ের নিকট বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া যাইব; আমরা সকলেই মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রাণপণে খাটিব এবং জননীর দুঃখ-বিমোচনের নিমিত্ত দেহপাত ও প্রাণপাত করিব। এক জননীর সন্তানরূপে আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ নাই; আমরা সকলেই এক। আমরা ভারতমাতার গৌরবসাধনের জন্য একত্র ভাবিব, একত্র কার্য্য করিব এবং একত্র প্রাণপাত করিব। মায়ের মন্দিরে আমাদের কোনো পার্থক্য নাই, কোনো বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই,— দ্বন্দ্ব নাই। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মুর্খ, আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু, ম্লেচ্ছ, কাফের মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, হিদেন, বাঙ্গালী, মারাঠী, শিখ, পার্শী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী— মায়ের মন্দিরে এই সকলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; সকলেই সমান। সকলেই এক, সকলেই অভিন্ন। মায়ের

মন্দিরে সকলেরই হৃদয় একই তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়, একই সুরে বাজিয়া উঠে এবং একই আশায় উৎফুল্ল হয়। এরূপ মিলন কি আর কোথাও আছে? এরূপ মহামিলন স্বর্গের দেবতাগণের মধ্যেও বুঝি দুর্লভ! ধন্য আমাদের ভারতমাতা এবং ধন্য আমরা যে তাঁহার সন্তান রূপে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহার একই ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছি।"* আমরা সকলে এক দেশের অধিবাসী বলিয়া আমাদের মধ্যে কিরূপ একতা উপস্থিত হইতেছে, জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী— এই কবিবাক্য আমরা কেমন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, মাতৃ-মন্ত্রের মধুর রসে আমরা কেমন তন্ময় হইয়াছি, তাহা সকলেই আজ দেখিতে পাইতেছেন। তুমি হিন্দু,— যাও তুমি বিষ্ণুর মন্দিরে উপাসনা করিয়া আইস, আমি তোমার অপেক্ষায় মন্দির-দ্বারে বসিয়া রহিলাম; তুমি মুসলমান— যাও, তুমি নমাজ পড়িয়া আইস, আমি হেথায় তোমার প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমরা যে যে ধর্ম্মাবলম্বীই কেন হও না, যাও নিজ নিজ উপাস্য দেবের আরাধনা করিয়া আইস, তৎপর সকলে একত্র হইয়া গরীয়সী জননী জন্মভূমির জয় ঘোষণা করিতে যাত্রা করিব। পাঠক! এতদপেক্ষা মধুর সম্বন্ধ আর কি হইতে পারে? এতদপেক্ষা কঠিন ঐক্যবন্ধনই বা আর কোথায় কোন্ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি বিদ্যমান থাকিতে, তথায় জাতীয় একতা সংসাধিত হইতে পারে না, আমরা বলি, তাঁহারা ভ্রান্ত। যাহার যে ধর্ম্ম সে তাহাই পালন করুক, কেহ তাঁহার হন্তারক হইবে না; তবে মাতৃ-আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র যেন সকলেই একই জাতীয়পতাকামূলে স্বদেশসেবায় একত্রিত হয়।

এই যে মধুর সদ্ভাব, এই যে জাতীয় একতা— এ দেশে তাহার বীজ কে বপন করিল? আমি বলি,— এক ভারতমাতা আর এক ইংরেজ রাজা। ইংরেজশাসন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত না হইলে যে, এ ভাব এত সত্বর আমাদের হৃদয়ে সঞ্জাত হইত— এই অপূর্ব্ব দৃশ্য এত শীঘ্র দেখিতে পাইতাম, তাহা কিছুতেই মনে লয় না। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম ইংরেজদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ প্রত্যেক ভারতবাসীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারাই আমাদের জাতীয় একতা সূচিত করিয়াছেন, আর এই ভাবের মূল মন্ত্র— মাতৃ-সেবা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুসমাজে স্থিতিস্থাপকতাগুণের সম্পূর্ণ অভাব; ইহাই আমাদের উন্নতির এক প্রধান অন্তরায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বজাতির সম্মিলন দেখিবার

বাসনা থাকিলে, ঐ গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে আহার-ব্যবহারের যে সমুদয় নিয়ম ছিল, কুসংস্কারবশে এখন তাহার প্রভূত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা কি কুসংস্কারান্ধ হইযাই বহিব? না প্রকৃত উন্নতির পথে ধাবিত হইব? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেতর জাতির অন্নভোজন করিতে ব্রাহ্মণের জাতিপাত হইত না এবং অধুনা-নিষিদ্ধ নানা প্রকার খাদ্য ব্রাহ্মণসমাজে অবাধে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন তদ্রূপ করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হয়, সমাজ তাহাকে একঘরে করে। এই প্রথার সংস্কার প্রয়োজনীয়, নতুবা আমরা স্বাধীনতা-বর্জ্জিত ও গতি-শক্তিহীন হইয়া রহিব। পূর্ব্বকালে যে ভাবে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত ছিল, যে পরিমাণ সংকীর্ণতা-বর্জ্জিত ও স্থিতিস্থাপক ছিল, বর্ত্তমান কালেও তদ্রূপ করিতে হইবে; তবেই আমাদের উন্নতির অন্তরায় বিদূরিত হইবে।

এইভাবে জাতিভেদের কুসংস্কারগুলি দূর করিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানেব কর্ত্তব্য। তাহ' করিতে পারিলে আমাদের জাতীয সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক উন্নতির বিবর্দ্ধক হইবে। নতুবা যে প্রথা সমাজ-হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার উচ্ছেদসাধন করিতে চেষ্টা করিলে, সমগ্র সমাজ বিপদাপন্ন হইবে। তাই উপসংহারে শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মহাশয়ের ভাষায় বলি,—

"An open crusade against caste can end only in disaster; for I consider it nothing short of disaster that the Hindu community should by the action of an aggressive and reckless radicalism be driven into the arms of the re-actionary movements which have of late created so much stir and urnest in the country... the old does not die without a struggle, the new is not born without travail."

৬। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জাতিভেদপ্রথা লইয়া অনেক বাদপ্রতিবাদ হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐগুলি সঙ্কলিত হইলে মহাভারত অপেক্ষাও বড় একখানি গ্রন্থ হয়। অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়াই যে, সংক্ষেপে জাতিভেদের অনুকূল বা প্রতিকূল কথা লেখা যাইতে পারে, তাহাতে আমার সন্দেহ আছে। নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে গেলে, যে

সকল কথা অবলম্বন করিয়া, এবং যে সকল অবস্থা লক্ষ্যে রাখিয়' অগ্রসর হইতে হয়, সেগুলির সংক্ষেপ নির্দ্দেশেই দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে কয়েকটি কথার সূচনা করিতেছি।

(১) অতি প্রাচীনকালে যখন সমাজ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তখন জাতিভেদপ্রথা ছিল কি না, অথবা কিরূপভাবে ছিল? যে সকল আভ্যন্তরিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ত্তমানতায়, প্রাচীন সমাজকে বৃদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ভেদের প্রয়োজনে ঐ প্রভেদের জন্ম হইয়াছিল কি না? এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে এখন সেই প্রভেদ রক্ষিত হইতে পারে কি না?

(২) পুরাণাদিতে পাই যে, জম্বুদ্বীপের (ভারতের) বাহিরে অন্যান্য দ্বীপে বা দেশেও জাতিভেদ ছিল। প্রাচীন ঈজিপ্ত, বাবিলন প্রভৃতি দেশে কর্ম্ম বা ব্যবসায়জনিত জাতিভেদ, সত্যসত্যই ছিল। কিন্তু ঐ সকল স্থানে, স্পর্শ, আহার এবং বিবাহাদির নিয়মের কিছুমাত্র কড়াকড়ি ছিল না। তবে ভারতবর্ষে অন্যরূপ হইল কেন, এবং কখন হইল? এখানে কি সত্যকার বহুজাতি (tribes) লইয়া সমাজ গড়িতে হইয়াছিল বলিয়া ঐ প্রভেদের জন্ম? বর্ণভেদ, tribeভেদ এবং ব্যবসায়ভেদ জড়াইয়া আমাদের জাতিভেদ হইয়াছিল বলিয়া কি ঐরূপ হইয়াছিল? Sabine এবং রোমানেরা স্বতন্ত্র জাতি ছিল; উহাদের মধ্যে যে Racial বিদ্বেষ ছিল, তাহা দূর করিবার জন্য Numa Pompilius উভয় দলের জাতিভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন।

(৩) ম্লেচ্ছ বলিতে প্রাচীনকালে যে সকল শবর, পুলিঙ্গ, মুতিব প্রভৃতি জাতি বুঝাইত, তাহাদের ভাষাশিক্ষা করাও আর্য্যের পক্ষে পাপ ছিল। বিস্তৃত ভারতবর্ষে তাহারা আর্য্যদিগের সংস্পর্শে না আসিয়াও স্বতন্ত্র থাকিবার স্থান পাইয়াছিল; তাহাদের দ্বারা আমাদের কোন কার্য্য ছিল না। উহারা যদি আর্য্যদিগের শাসনাধীনে থাকিত, তাহা হইলে হয়ত উহাদের ভাষাশিক্ষায় পাপ হইত না। বরং ইংরাজ যেমন এখন ঐ ভাষা শিক্ষা করিলে কর্ম্মচারীদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্যবস্থা হইত। ভিন্নদেশ হইতে আসিয়া বিদেশীকে কেবল শাসন করা নহে, দেশরক্ষার জন্য যদি উহাদিগকে সমাজের অঙ্গে বাঁধিতে হয়, তাহা হইলে ভাষাশিক্ষার উপরেও সংশ্রবটা কতদূর বাড়াইবার প্রয়োজন?

(৪) সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে ১/৫ এর কিঞ্চিৎ অধিক ভাগ এমন সকল জাতি যে, যাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিলেই ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয়েরা স্নান করিয়া

থাকেন। যে সকল শূদ্রের জলচল, তাহারাও উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। উহাদের শরীরের গঠন এবং মস্তিষ্কের ব্যাবৃতি, আচরণীয় নীচশূদ্রদিগের অপেক্ষা হীন নহে; বরং বুদ্ধির কার্য্যে এবং সাধুতায় উহারা নীচশূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যখন উহারা মুসলমান বা খৃষ্টান হয়, তখন কিন্তু উচ্চজাতীয়েরা উহাদিগকে স্পর্শ করেন, এবং সেলামের প্রতিসেলাম দিয়া থাকেন। খৃষ্টান হইয়া উহারা যাঁহাদিগের দ্বারা রক্ষিত এবং পালিত হয়, তাঁহাদিগের ইহা স্বার্থ নহে যে, ঐ সকল লোক দেশের অন্য লোকের সহিত সদ্ভাব বা মিলন রাখে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা উহাদিগকে গুলি করিয়া বা বিষপ্রয়োগে মুক্তিদান দিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেব মত নিষ্কলঙ্ক আর্য্যবাস স্থাপন করিয়া যান নাই। এখন উপায় কি?

(৫) এদেশের নীচশূদ্রেরা কিযৎ পরিমাণে, এবং খাঁটি-অনার্য্য বা আরণ্য জাতীযেরা বহুপরিমাণে, আপনাদের tribal স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কবিয়া আসিয়াছে; অর্থাৎ নীচজাতীয় লোকের মধ্যে সঙ্করতা অনেক কম। কিন্তু উচ্চজাতীয় লোকদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সঙ্করতা এবং জাতিমিশ্রণ অধিক পরিমাণে হইয়া গিয়াছে। যবন, শক, চীন, হুন্ প্রভৃতি জাতির লোকেরা, কেবল স্বতন্ত্রভাবে ক্ষত্রিয় হইয়াই ছাড়েন নাই, এদেশের অনেক জাতির সঙ্গেই উহাদের পূর্ণ মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। বিদেশী হুন্ এবং অনার্য্য মালব ও গুর্জর জাতির সঙ্করতায়, কুলীন ক্ষত্রিয়বংশেব উদ্ভব। প্রাচীনকালে একজাতির লোকের মধ্যেই যাঁহারা দেব-পূজায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাই সেই জাতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিভিন্নদেশীয় জাতির আগমনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণদল আসিয়াছিলেন, এদেশের বনিয়াদি ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। দশম শতাব্দীতেও অনুলোমক্রমে বিবাহ দূষিত হয় নাই; রাজা মহেন্দ্র পালের গুরু, কবি রাজশেখর, চাহমান ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া গৌরব জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রথাটা দূষিত হইলে নাটকের ভূমিকায় ঐ গৌরবের পরিচয় কদাচ প্রদত্ত হইত না।

ব্রাহ্মণের শূদ্রানী পত্নী থাকিলে, তিনি সেই পত্নীসহ যজ্ঞ করিতে পারিবেন না; সেই পত্নীর সন্তান পিতৃসম্পত্তির অল্পভাগ পাইবেন; ব্রাহ্মণের উদরে শূদ্রান্ন হজম্ হইয়া গিয়া না থাকিলে তিনি শ্রাদ্ধের পংক্তিভোজনে নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য নহেন, প্রভৃতি স্মৃতির ব্যবস্থার কড়াকড়ি হইতে স্মৃতিরচনার সময়ের, এবং তৎপূর্ব্ব সময়ের স্বাধীনভাবই সূচিত হয়। দেখা যায় যে, বর্ণভেদ এবং tribal জাতিভেদ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

উক্তপ্রকার মিশ্রণে অধঃপতনের ভয় ছিল বলিয়া, বেশি বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এরূপ মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালের মিশ্রণের ফল কি অশুভকর হইয়াছিল? এবং বাঁধাবাঁধি নিয়মের পর কি শুভফল ফলিয়াছে?

(৬) পূর্ব্বে যে কোন একজাতির লোকের মধ্যে বিবাহ চলিত; বর্ণ বা tribe এর বড় বিচার হইত না,— ব্যবসায়ের হিসাবে একজাতি বলিয়া পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই চলিত। এখন একপ্রদেশের একজাতির মধ্যেও জাতিভেদ আছে। ইহারও প্রাকৃতিক কারণ হয়ত, পরবর্ত্তী সময়ের ভিন্ন ভিন্ন tribeএর একজাতি সংজ্ঞা প্রাপ্তি। তাহা হউক, তবুও ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি নামে যাঁহারা পরিচিত, অন্ততঃ যখন তাঁহাদের স্বজাতি নামে চিহ্নিত লোকদিগের মধ্যে রূপগুণাদির প্রভেদ দেখা যায় না, তখন সেই প্রকার স্বজাতি-মিশ্রণে অশুভ ফলের ভয় আছে কি?

আর একপদ অগ্রসর হওয়া যাউক। বর্ণ বা গায়ের রংএর ভেদ তো এক রকম নাইই; ব্যবসায়ের জাতিভেদও তো উচ্চশ্রেণীর মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে। Tribal জাতিভেদটা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিদ্যাবুদ্ধি পদমর্য্যাদা প্রভৃতির বিচারেও কোন পার্থক্য নাই। তবে অল্পপরিমাণে প্রতিজাতি-নিষ্ঠ কতকগুলি আচার-ব্যবহার এবং ধরণ-ধারণ আছে বটে। একই জাতিতে বিবাহ এবং একই জাতির লোক লইয়া সামাজিকতা আছে বলিয়াই উহা আছে; একটু বাঁধন খুলিলেই আর থাকিবে না। এদেশে কলকারখানার বেশি বিস্তার হইলে, নীচজাতীয়দিগের মধ্য হইতেও ব্যবসায়গত জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে।

বিবাহে যদি জাতিভেদ না থাকে, তাহা হইলেই ভদ্রলোকেরা চাষার ঘরে, কিম্বা কোল্ সাঁওতালের ঘরে বিবাহ করিতে ছুটিবেন না। যে প্রকার সমতা দেখিয়া স্বজাতীয়ের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহা কদাচ নষ্ট হইবে কি? কোন দেশেই তাহা হয় কি? যাঁহারা গুণগৌরবাদির সঙ্গে বর্ণভেদ খুঁজিবেন, তাঁহারা অনেক সময়ে বরং 'কালো ব্রাহ্মণ' ফেলিয়া "কটা-শূদ্র" পাইতে পারেন। শূদ্র "কটা" হইলেই কি দুষ্ট হয়?

(৭) Tribal ভেদ, বর্ণভেদ, এবং ব্যবসায়ভেদ ব্যতীতও আর একটি ভেদে জাতিভেদ হইতেছে, সেটি ধর্ম্মভেদ। যে সমাজে মতের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্মান নাই, সে সমাজ কি জীবন্ত? রামকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস জন্মিল যে, খৃষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস না করিলে মুক্তি নাই; শ্যামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দৃঢ় প্রত্যয় যে, মহম্মদ-প্রচারিত কথা অবলম্বন না করিলে নরকভোগ হয়, এখন যদু

গাঙ্গুলি যদি বুঝিয়া থাকেন যে, গীতার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তখন কি তিনি কেবল ধর্ম্মভেদের জন্য মুখোপাধ্যায় এবং চট্টোপাধ্যায়ের সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন? জাপানে শুনিয়াছি, এক গৃহে বিভিন্ন-ধর্ম্মবিশ্বাসী সুখে বসবাস করেন।

(৮) প্রাচীনকালে নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ছিল না। একালে, ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের শেষ চিহ্নই রহিয়া গিয়াছে। বহুদিন হইতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া, ঐ ভিত্তির উপর সমাজশাসনের নূতন বিধি, অথবা নূতন রকমে উচ্ছৃঙ্খল সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপন করা চলে কি? পদগৌরবে এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে এখন অন্য জাতীয়েরা যে উচ্চতালাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহাতে ঐ নূতন বিধান মান্য হইবে কি? হইলেও উন্নতির আশা আছে কি? নূতন রকমের ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলে কিন্তু জাতিভেদের প্রাচীন প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। একটু পরিবর্ত্তন হইলেই প্রাচীন ভিত্তির দৃঢ়তা একেবারে শিথিল হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় কোন প্রকার জোড়াতালির চেষ্টা চলে কি? চালাইবেই বা কে?

(৯) যখন জাতিগঠনের প্রয়োজন ছিল, মিলন না হইলে চলিত না, এদেশের সেই সময়ের ইতিহাসে যবন, শক, চীন, ও হুনেরা সমাজে মিলিয়া গিয়াছিলেন। আসামের (প্রায় একালের) ইতিহাসে পাই, যে মঙ্গোলীয় জাতি এবং কাছাড়ি জাতি উচ্চজাতির লোক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং আহম্‌দিগের দেওধাই বা দেহেরিগণও একেবারে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন। প্রয়োজন ছিল বলিয়া এই সকল হইয়াছিল। এখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি?

ইংরাজরাজত্বে আমরা কে কত বিদ্যাবুদ্ধি চালাইয়া উদরপূর্ত্তির পথ করিতে পারি, ইহাই সকলের লক্ষ্য। কেহ কাহারো সঙ্গে যদি মিলন স্থাপন না করি, তবে আমাদের সাংসারিক সচ্ছন্দতা দিতে বড় বাধা পড়ে না। এইজন্য যখন কেহ বলেন যে, জাতি থাকায় ক্ষতিটা কি, অথবা জাতি উঠিয়া গেলেই কি উপকার হইবে, তখন তাহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন হয়। আমাদের এমন কি প্রয়োজন পড়িয়াছে যে, দল বাঁধিতে না পারিলে চলিতেছে না? সভাসমিতি করিবার জন্য যে প্রয়োজন, তাহাতে মুসলমানের সঙ্গে বসিয়া লুচি না খাইলেও কাজ চলিতে পারে। টাকাকড়ি দিয়া যৌথ কারবার করিতে গেলেও জাতিতে বাধে না।

মহারাষ্ট্র যখন জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন যুদ্ধের জন্য সকল জাতির লোককে এক সঙ্গে বহুদূর যাইতে হইত। আহারপানের নিয়ম তখন প্রয়োজনবশতঃ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। 'দেশ' বা পুণা অঞ্চলের বাহিরে গেলে জাতিভেদ মানিবার প্রয়োজন

নাই, এই ব্যবস্থা তখন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পেশোয়ার মুসল্‌মান পত্নীর গর্ভজাতপুত্রের উপবীতের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। আবার যখন মহারাষ্ট্র দেশ শান্তির ক্রোড়ে শায়িত হইল, তখন কর্ম্মহীনদেশের শাস্ত্রব্যবসায়ীরা ব্যবস্থা করিলেন যে, নীচজাতীয়েরা গলায় হাঁড়ি বাঁধিয়া রাজপথে চলিবে, কেন না অন্যথা তাহাদের মুখের থু থু আর্য্যের পথ কলঙ্কিত করিতে পারে।

চাকুরি প্রভৃতির জন্য এখন এক প্রদেশের লোককে অন্য প্রদেশে প্রবাসী হইতে হয়। প্রতিলোক তাঁহার জাতির দলবল লইয়া বাস করিতে পারেন না বলিয়া, প্রবাসে জাতিভেদের অনেক নিয়ম শিথিল হয়। যেখানে দৃঢ়তা বজায় থাকে, সেখানে মৃতশব বহন করিবার লোক না পাইয়া কেহ কেহ এমন কষ্ট পাইয়াছেন জানি যে, বিপদের দিনের পর আর একজনকে অন্যজন মন খুলিয়া ভাল বাসিতে পারেন নাই।

(১০) এখন ব্রাহ্ম প্রভৃতিরা যে, জাতি ভাঙিতেছেন, সেটা তাঁহাদের ধর্ম্মমতের চাপে। মানমর্য্যাদা এবং অর্থলাভের উপায় করিবার জন্য যাঁহারা বিলাত যাত্রা করিয়া জাতি ভাঙিতেছেন, তাঁহারা 'মানের প্রাণের পেটের দায়ে' কার্য্য করিতেছেন। প্রয়োজনের চাপ ভিন্ন কিছুই হয় না। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে দায়ে পড়িয়া পরিবর্ত্তন হয়। বিনাদায়ে যদি বৈঠকী রকমের বিচার হয়, তবে সূক্ষ্ম যুক্তির বিস্তার হইবে মাত্র। তর্কে বহুদূর, একথা অনেক সময়ে খাটে।

যাঁহারা যথার্থ বুদ্ধিমান, তাঁহারা মিলনের প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। এই বুদ্ধি প্রখর হইলে প্রয়োজনের চাপে যাহা সুসিদ্ধ হইবে, তাহাই শুভফলপ্রদ হইবে। আলোচনা সকল সময়েই ভাল; তবে দায়ে ঠেকিয়া আলোচনা করিলে Bias এর হাত এড়াইয়া সুপথে চলিতে পারিব; নহিলে কেহ বা জাতিভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখাইবেন, এবং কেহ বা উদ্ধত প্রকৃতিতে অন্য লোককে তিরস্কার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

ভান্ডার ।। কার্ত্তিক ১৩১৩

আগামী কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা*

একুশ বৎসর হইল কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ রাজনীতিকেরা কখন প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলন আলোচনা করেন নাই।

কেবলমাত্র একবার আঠার বৎসর পূর্ব্বে সে সময়ে বড়লাট ডফারিণ ও উত্তর-পশ্চিমের ছোটলাট স্যার অক্ল্যান্ড্ কল্ভিন্ এ বিষয়ে কতকটা বাক্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। তারপরে আর কেহ এ বিষয়ে বিশেষ কোন উচ্যবাচ্য [উচ্চবাচ্য] করেন নাই।

আঠার বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ইংরাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তারই জন্য কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টায় তাহারা নিযুক্ত হয়। কংগ্রেসের জন্মকালে ইংরাজ ইহাদ্বারা আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইবে এরূপ ভাবিয়াছিল। হিউম্ সাহেব কংগ্রেসের জন্মদাতা, কিন্তু হিউম্ তখনকার বড়লাট ডফারিণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ডফারিণ অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের ইংরাজপ্রবাসীদিগকে না চটাইয়া কোন প্রকারে দেশের ইংরাজীনবীশদিগকে হাত করিতে পারিলে ইংরাজশাসনের অনেকটা সুবিধা করা যাইতে পারিবে। এই ভাব হইতেই তিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হিউম্কে এইরূপ সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন।

ইংরাজ এদেশের শাসনভার পাইয়া অবধিই বড় এক বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিল। দেশের লোকের সঙ্গে কোনপ্রকার সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোন সুযোগ ছিল না। প্রজার মনোভাব সে কিছুতেই জানিতে পারিত না। অথচ কি করিয়া যে, সে দেশের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করিবে, কিরূপে প্রজাসাধারণের আনুকূল্যের উপরে আপনার প্রভুশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহারও কোন পথ দেখিতে পায় নাই। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়া সে এই পথই খুঁজিতে লাগিল। ইংরাজ মনে করিল যে, দেশের প্রজাসাধারণ একদিকে এবং দেশীয় রাজপুরুষেরা আর একদিকে,

* পৌষ ১৩১৩ (ডিসেম্বর ১৯০৬) কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে লেখা এই প্রবন্ধ। — **সংকলন-সম্পাদক**

কংগ্রেস এই দুই দলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রজার ভাব গভর্ণমেন্টকে জানাইয়া ব্রিটিশশাসন যাহাতে লোকপ্রিয় হইয়া স্থায়িত্বলাভ করে তাহার চেষ্টা করিবে এবং অন্যদিকে গভর্ণমেন্টের কার্য্যাকার্য্যের প্রকৃত মর্ম্ম প্রজাবর্গকে বুঝাইয়া দিয়া গভর্ণমেন্টের প্রতি তাহাদের মনে কোন বিরূপভাব উৎপন্ন হইলে তাহা নষ্ট করিবে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তখন এইরূপ কথাই বলিতেন। সুতরাং আপনার স্বার্থসিদ্ধির আশায় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ প্রথম প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালে মান্দ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। সে সময়ে মান্দ্রাজ গভর্ণমেন্টের বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারী কংগ্রেসের মঞ্চে বসিয়া কংগ্রেসের কার্য্যের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। লাট কন্যেম্যারা তখন মান্দ্রাজের গভর্ণর। তিনি কংগ্রেসের সভ্যগণকে আপনার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া বিশেষভাবে আপ্যায়িত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

১৮৮৭ সালের কংগ্রেসে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠে। সেই সময় হইতেই কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দণ্ডায়মান হয়। রাজভক্তির ধুয়া তখনও ছাড়া হয় নাই, কিন্তু প্রজাশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা তখনই প্রথম সূত্রপাত হয়। ইংরাজ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস কেবলই একটা ইংরাজীনবীশদিগের মজলিস হইবে। ইহারা ইংরাজী ভাব প্রচার করিবে, ইংরাজী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবে ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিবে, আর ইংরাজের রাজকার্য্যের যতই কেন নিন্দাবাদ করুক না, এই সকল যে চিরদিনই ইংরাজের অনুকূল ও অনুগত থাকিবে এ ধারণা তখনও নষ্ট হয় নাই। সুতরাং ইংরাজীনবীশদিগের এই মজলিসের দ্বারা কখন যে দেশে প্রকৃত প্রজাশক্তি জাগিয়া ইংরাজের প্রতিকূলে দাঁড়াইবে, রাজপুরুষদিগের মনে তখনও এ আশঙ্কা হয় নাই। তারই জন্য তাঁহারা প্রথম প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে এইরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কিন্তু মান্দ্রাজের কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণ পড়িয়া তাঁহাদের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। তাঁহারা তখন দেখিলেন যে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আর কেবল ইংরাজীনবীশদিগের মধ্যে আপনাদের রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনাকে আবদ্ধ রাখিতেছেন না। তাঁহারা দেশের লোকের মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়া দেশের সাধারণের মধ্যে ইংরাজরাজত্বের দোষ ত্রুটির কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার অন্যদিকে অস্ত্র-আইন রদ করিবার জন্য এবং সখের সেনাদলে এদেশীয় লোকদের প্রবেশাধিকার বিস্তার জন্য আব্দার আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া

আঠার বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের প্রাণে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই আতঙ্কবশতঃ তখন তাহারা কংগ্রেসকে জব্দ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

তখন কংগ্রেস কেবল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল। দেশের লোকের চক্ষু কংগ্রেসের উপর সবে পড়িয়াছিল। প্রতিবৎসর নূতন লোক কংগ্রেসে যোগদান করিয়া তাহার শক্তিবৃদ্ধি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া ইংরাজের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এবং ছোটলাট কল্‌ভিন্ ও বড়লাট ডফারিন্ দুইজনে মিলিয়া কংগ্রেসের শক্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কল্‌ভিন্ কংগ্রেসকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান এবং এই দুর্ণাম [দুর্নাম] তুলিয়া দেশের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাহাতে কংগ্রেসে যোগদান না করেন তাহার চেষ্টা করেন। ডফারিন্ কংগ্রেসকে নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বিদ্রূপ করেন। যাহারা কংগ্রেসের শক্তি দেখিয়া তাহাতে যোগদান করিত তাহাদিগকে বিরত করাই ডফারিণের নিন্দাবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তখন এই কারণে বড় বড় রাজপুরুষেরা কংগ্রেসের কথা লইয়া একবার বড় বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। তারপর কংগ্রেস ক্রমে ইংরাজের চক্ষে নির্ব্বিষ ঢোঁড়া সাপ হইয়া পড়ে। সুতরাং এই আঠার উনিশ বৎসরকাল মধ্যে ইংরাজ রাজপুরুষ কি রাজনীতিকেবা কংগ্রেসের কথা লইয়া কোন উচ্যবাচ্য [উচ্চবাচ্য] করেন নাই। আঠার বৎসর পরে ইংরাজের প্রাণে আবার এক নূতন ভয় ঢুকিয়াছে। তাই তাহারা হঠাৎ কংগ্রেসকে সুপরামর্শ দিয়া সৎপথে চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পদিন হইন বিলাতের টাইম্‌স্ পত্র, বোম্বাইয়ের টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া এবং কলিকাতার ইংলিশম্যান্ ইহারা সকলে কংগ্রেসসম্বন্ধে অনেক লেখালিখি আরম্ভ করিয়াছে। দেশে একটা নূতন রাজনৈতিক আদর্শ জাগিয়াছে। বিলাতীবর্জ্জনের পণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালার নেতৃবর্গ দেশের প্রজাশক্তিকে জাগাইয়াছেন। কেহ কেহ এই বয়কট-পণকে কংগ্রেসের সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। একদল লোক কেবল বিলাতী পণ্য নহে কিন্তু ইংরাজের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বর্জ্জন করিবার জন্য দেশের লোককে আহ্বান করিতেছেন। ইঁহারা প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতার কথা প্রচার করিতেছেন এবং দেশের লোককে ইংরাজের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইতে বিরত করিয়া, বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে ক্রমে একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিবেন, এই ভয় দেখাইতেছেন, ইংরেজ কখনও এমন প্রগল্‌ভ কথা ভারতের প্রজার মুখে শুনে নাই। এদেশের লোক যে কখনও এরূপ ধর্ম্মঘট করিয়া তাহার শাসনকে বিকল করিয়া দিবে, কল্পনাতেও ইংরাজের মনে এ

আশঙ্কা কখনো স্থান পায় নাই। হঠাৎ দেশে এই নূতন শক্তির ও এই নূতন আদর্শের প্রকাশ দেখিয়া, সহজেই তাহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। এই ভয় হইয়াছে বলিয়াই বিলাতে ও এদেশে, ইংরাজী সংবাদপত্রে, Congress লইয়া এতটা লেখালিখি আরম্ভ হইয়াছে।

আঠার বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ কংগ্রেসকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। ক্রমে কংগ্রেস যে পরিমাণে আত্মচেষ্টা ও আত্মনির্ভরের ভাব ছাড়িয়া ইংরাজের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া, আবেদন ও আর্ত্তনাদের পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল, সেই পরিমাণে ইংরাজের ভয়ও কমিতে লাগিল, এখন ইংরাজ কংগ্রেসকে আর ভয় করে না; কিন্তু বয়কট মুখে করিয়া, যে স্বদেশী আন্দোলন দেশে জাগিয়াছে, তাহাকেই ইংরেজ এখন ভয়েব চক্ষে দেখিতেছে। যাঁহারা এই স্বদেশী আন্দোলনকে কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সঙ্গে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃবর্গের সঙ্গে একটা বিরোধ বাধাইয়া দিতে পারিলে, কংগ্রেসের শক্তি স্বদেশী এবং বয়কটের পোষকতা করিবে না এই আশায় ইংরেজ কংগ্রেসের সেবকদিগের মধ্যে একটা দলাদলি বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ইচ্ছা কংগ্রেসকে হাত করিয়া, তাহাকে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবে।

তারই জন্য টাইম্‌স্ পত্র কংগ্রেসের দলাদলির কথা লইয়া এত লেখালিখি করিতেছে। কংগ্রেসের মধ্যে মোটামুটি দুইটা দল জন্মিয়াছে স্বীকার করি*। দুই ভাবে, দুই শ্রেণীর লোক, ভারতের প্রজাশক্তিকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইঁহাদের আদর্শের পার্থক্য আছে, কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্নতাও আছে, কিন্তু এসকল পার্থক্য-বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই উভয় দলই যে, জাতীয় উন্নতি এবং স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য লালায়িত ইহাও অস্বীকার করা যায় না। যাঁহারা ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া রাজপুরুষদের মন ভুলাইয়া, ক্রমে অল্পে অল্পে ও অলক্ষিতে, প্রজার শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়াইতে চান, আর যাঁহারা ইংরাজের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সাহচর্য্য বর্জ্জন করিয়া দেশের লোককে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, এই উভয় দলেরই চরম লক্ষ্য এক; বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া ইঁহারা একই লক্ষ্যের অনুসরণ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যে বিরোধ তাহা

---

* নরমপন্থী (moderate) আর চরমপন্থী (extremist)। এই প্রবন্ধের লেখক বিশ্রুত বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন দ্বিতীয় দলে। — সংকলন-সম্পাদক

বাহ্য ও অতি অকিঞ্চিৎকর†। কাজের বেলায় এইরূপ বিরোধ কোন দেশে থাকে নাই, এই দেশেও থাকিবে না। জাপানের রাজনীতিতে কি এরূপ বিরোধ কখনও ছিল না, কি এখনও নাই? আদর্শবিচারে, পন্থা-নির্ব্বাচনে, সকলদেশের নেতৃবর্গের মধ্যেই এরূপ বিরোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু কাজের বেলায় কখনও কোথায় ইহাতে কিছুই আটকায় নাই।

ইংরাজ আমাদের এই মতবিরোধটাকে পাকাইয়া তুলিয়া কংগ্রেসকে আপনার করতলগত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। অক্‌লাণ্ড কল্‌ভিন যেমন মুসলমান নেতৃবর্গকে হাত করিয়া আঠার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কংগ্রেসের বিরোধী একটা প্রবল দল গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ রাজনীতিকেবা কংগ্রেসকে সেইরূপ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এ চেষ্টা ফলবতী হইলে কংগ্রেস রাজপুরুষদের হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়িবে। এবারকার কংগ্রেসের সমক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। কংগ্রেস নূতন দলের হাতে থাকিবে কি পুরাতন দলের হাতে থাকিবে, এখন আর এ কথা নাই। কংগ্রেস, ইংরেজের হাতে পড়িবে, না দেশের লোকের হাতে থাকিবে, এখন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসাব উপরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

† সরকারী নজর থেকে এই বিরোধ আড়াল করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র যাই বলুন, প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দেয় ১৯০৭এর সুরাট কংগ্রেসে। — **সংকলন-সম্পাদক**

কংগ্রেসের সমস্যা

ভাণ্ডারের বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেসের সম্বন্ধে যে সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছেন, সে বিষয়ে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। বিপিনবাবু খ্যাতনামা সুলেখক সুতরাং তাঁহার বক্তব্য কথা উপেক্ষা করিবার যো নাই। যাঁহারা তাঁহার মত অনুমোদন না করেন তাঁহাদিগকেও বিপিন বাবুর কথা মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিতে হয়। বিপিনবাবুর মতে কংগ্রেসের উপস্থিত সমস্যা হচ্ছে যে, কংগ্রেস আমাদের আয়ত্তের ভিতর রহিবে কিম্বা ইংরাজের হস্তগত হইবে? আপাততঃ বিবেচ্য এই যে সত্য-সত্যই কি কংগ্রেসের উভয় পার্শ্বে এই উভয়সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে? কেননা, যদি সমস্যা না থাকে তো তাহার মীমাংসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। বিপিনবাবু তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য সংক্ষেপে কংগ্রেসের আজন্ম ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। হিউম সাহেব যে কংগ্রেসের আদিকর্ত্তা তাহা সকলেরই জানা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিনি কংগ্রেসস্থাপনার পূর্ব্বে তৎসাময়িক বড়লাট ডফারিণের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং লর্ড ডফারিণও হিউম সাহেবের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই কারণে বিপিনবাবু অনুমান করেন যে, যাহাতে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট আমাদের প্রকৃত মনোভাব জানিতে পারেন সেই উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্যই উভয়ে কংগ্রেস স্থাপিত করেন। অর্থাৎ রাজা নিজের কার্য্য উদ্ধারের জন্যই আমাদের একটা দল বাঁধিয়া দেন। এ যুক্তি আমার মনে নেয় না। কারণ লর্ড ডফারিণ একজন অতিশয় বুদ্ধিমান, সুচতুর এবং বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সংবাদপত্রে এবং সভাসমিতিতে বারোমাস ত্রিশদিন ধরিয়া যে সকল মতামত ব্যক্ত করিত, কংগ্রেসে তাহাই একত্রিত হইবে তাহা ছাড়া অপর কোন নূতন মনোভাবের পরিচয় সেখানে পাওয়া যাইবে না। বহুলোকের বিচ্ছিন্ন মত কোন সূত্রে একত্রিত হইলে তাহার শক্তি যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এসত্যও তাঁহার অবিদিত ছিল না। প্রজার মধ্যে একটা দল বাঁধিয়া দেওয়াতে প্রজাশক্তি যে প্রবল হয় তাহাও অবশ্য তিনি জানিতেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহা অনুমান করা অন্যায্য নয় যে, এদেশে রাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণের মত উদ্বোধিত এবং কতক পরিমাণে বলবান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তবে দু'এক বৎসর পরে সেন্ট আন্ড্রুস ডিনারে তিনি যে কংগ্রেসকে বিদ্রূপ করেন তাহার কারণ বোধ হয়

যে, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির সংশ্রবে তিনি অনেকটা নিজমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ কংগ্রেসেরও হালচাল তাহার ঠিক মনোমত হয় নাই। আর একটি কথা, যে সময়ে লর্ড ডফারিণ প্রকাশ্যে কংগ্রেসকে বিদ্রূপ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই তিনি তখনকার কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান দাবী, (Expansion of the Legislative Councils) মঞ্জুর করিবার ব্যবস্থা করেন। ফলকথা রাজনীতির পথ সরল নয়, এবং রাজপুরুষের চরিত্র বোঝা ভার। ইলবার্ট বিল লইয়া আন্দোলনের পরই কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। উক্ত আন্দোলনের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা দেশব্যাপী অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, এবং লর্ড রিপণের রাজশাসন প্রণালীতে একটা নূতন আশার সঞ্চার হয়, এই আশা এবং এই অসন্তোষই কংগ্রেসসৃষ্টির মূলকারণ। কংগ্রেস গঠনসম্বন্ধে বিচার করিবার সময় আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আদিতে মাদ্রাজের থিওজফিকাল কংগ্রেসের অনুকরণেই আমাদের রাজনৈতিক কংগ্রেস প্রথমে গঠিত হইয়াছিল। মিষ্টার হিউম থিওজফিষ্ট ছিলেন বলিয়াই পরে কংগ্রেসওয়ালা হন। এবং এ কথাও সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, থিওজফির দরুণই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জাতীয়ভাবের প্রথম উৎপত্তি। থিওজফির নিকট আমরা সকলেই এ বিষয়ে ঋণী। এই সকল কারণে একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দেশের লোকের নব জাগ্রত জাতীয়ভাব, রাজনৈতিক ভাব, রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক আশাই,— কংগ্রেসের জন্মের কারণ এবং কংগ্রেস রাজার হাতের গড়া এবং আমাদের হাতে ন্যস্ত ছেলে ভোলান মোয়া নয়। যে শ্রেণীর ইংরাজ এদেশের শাসনপ্রণালী অটুট রাখিতে চান, রাজ-পুরুষের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তাঁহারা কংগ্রেসের চিরশত্রু, সুতরাং আজ যে তাঁহারা কংগ্রেসকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসকে যে তাঁহারা হস্তগত করিতে চাহেন তাহা নহে, কারণ কংগ্রেসকে হাতে নিয়া তাঁহাদের কোন লাভ নাই বরং হাতযোড়া হইবার বেশী সম্ভাবনা। পূর্ব্বে যাহাদের চেষ্টা ছিল, গভর্ণমেন্টের দ্বারা কংগ্রেসকে চাপিয়া দেওয়া, আজ তাহাদের চেষ্টা হইয়াছে আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ জাগাইয়া তুলিয়া কংগ্রেসের ঘরভাঙ্গানো। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'টিদল সৃষ্টি হইবার উপক্রম দেখিযা ইঁহারা যাহাতে দলাদলিটা ভাল করিয়া পাকে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। এমন কি নূতন দল সম্বন্ধে বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিতে ইঁহারা সকলেই রাজি। আমাদের নিজের ভিতর দলাদলিটাই কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা। সাধারণে বিপিনবাবুকে কংগ্রেসের ভাঙ্গা দলের একজন প্রধান নেতা বলিয়া গণ্য করে,

সুতরাং বিপিনবাবু তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত দলাদলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। তিনি এই প্রবন্ধে উভয় পক্ষের মত সাতিশয় নিরপেক্ষভাবে প্রকটিত করিতে যত্ন পাইয়াছেন এবং অনেক পরিমানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কোন মতেরই উপর তিনি বিশেষ ঝোঁক দেন নাই। তাঁহার আসল কথা এই যে, কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে মতভেদ হওয়া অনিবার্য্য, তবে কার্য্যক্ষেত্রে তজ্জন্য একতার কোন বাধা হওয়া উচিত নয়। এই মত অনুসারে যদি সকলে কার্য্য করেন তাহা হইলে কংগ্রেসে গৃহবিচ্ছেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই রাজনৈতিক মতভেদসম্বন্ধে আমার দু'একটি কথা বক্তব্য আছে। এক কথায় বলিতে গেলে ভেদ এই যে, এক পক্ষের মতে, আমাদের জাতীয় উন্নতি গভর্ণমেন্টনিরপেক্ষ হওয়া উচিত, অপর পক্ষের মত, গভর্ণমেন্টসাপেক্ষ না হইলে তাহা হইতে পারে না। শেষোক্ত মত প্রচলিত মত; পূর্ব্বোক্ত মত নূতন মত। আমি নিজে প্রাচীন মতের পক্ষপাতী, তবে 'সাপেক্ষ' শব্দের অর্থে আমি গভর্ণমেন্টের 'অনুগ্রহ' বুঝি না। আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি কেন যে গভর্ণমেন্টসাপেক্ষ, তাহা দু'চার ছত্রে বুঝান অসম্ভব; এবং আজকার প্রবন্ধে তাহার বিচার অপ্রাসঙ্গিক হইবে। যখন কথাটা উঠিয়াছে তখন বৎসর ধরিয়া কাগজে পত্রে সভায় সমিতিতে বাঙ্গালী জাতি ইহার বিচার করিবে। যে পক্ষ নিজের মত যুক্তিদ্বারা জ্ঞানের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন সেই পক্ষের মতই সাধারণে গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষের এবং উত্তরপক্ষের এই পণ্ডিতের বিচার প্রথমতঃ সাহিত্যজগতেই হওয়া শ্রেয়, কার্য্যক্ষেত্রে ইহা লইয়া আপাততঃ বিরোধ উপস্থিত করা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়, তাহাতে কার্য্যহানি ব্যতীত অপর কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। যে মনোভাবের উপর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছে একদিনে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অসম্ভব। দেশে একটা নূতন মত উঠিয়াছে বলিয়াই যে কংগ্রেসের আগাগোড়া রূপান্তর হইবে এমন আশা করাও উচিত নয়। সুতরাং নূতন মতাবলম্বীদিগকে কেহই কংগ্রেসে বিরোধ উপস্থিত করিতে পরামর্শ দিতে পারেন না এবং বিপিনবাবুর প্রবন্ধ হইতে মনে হয় যে, তিনিও কার্য্যতঃ বিরোধের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। নূতন দলের মনে রাখা উচিত যে, মহিরাবণের পুত্র অহিরাবণের ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হওয়াটা রামায়ণের সময়েও একটা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আসল কথাটা এই যে আমাদের জাতীয় উন্নতি ইংরাজ গভর্মেন্টসাপেক্ষ কিম্বা নিরপেক্ষ এই লইয়া একটা বাক্‌বিতণ্ডা উত্থাপন করার দোষ এই যে, তখন উভয় পক্ষে "জাতীয় উন্নতির" কথাটা চাপা দিয়া ঐ "সাপেক্ষ" কিম্বা "নিরপেক্ষ" লইয়াই মারামারি

করিতে প্রস্তুত হয়। আসল জিনিষ ভুলিযা ঝগড়াটা স কিম্বা নিঃ এই অব্যয়ের উপর গিয়াই পড়ে। আমাদেব বিপক্ষ দল, কংগ্রেসের যখন পক্ষোদগম হইতেছে তখন অবশ্যই তাহার "মরিবার তরে" এই বিশ্বাসে যে আনন্দ অনুভব কবিতেছিলেন তাহা নিরানন্দে পরিণত হইবে। দেশে দুই কেন দু'শ বকম মতভেদ আছে কিন্তু কংগ্রেসেব দুটি পক্ষ নাই এবং আশা কবি শীঘ্র হইবেও না।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

ভাণ্ডারের নিয়মাবলী।

১। ভাণ্ডারের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহর ও মফঃস্বলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ২।০ প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

২। গ্রাহকগণ মূল্যাদি পাঠাইবার সময় বা অপর কোন বিষয়ের জন্য পত্র লিখিবার সময় নম্বর দিয়া লিখিবেন। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকে, তাহাই গ্রাহকনম্বর।

৩। ভাণ্ডারসম্বন্ধীয় টাকাকড়ি চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি সমস্তই নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। কেহ কোন বিষয় জবাব চাহিলে রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন অন্যথা জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

৪। ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপনের হারঃ— একপৃষ্ঠা ৫ৎ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩ৎ এবং সিকিপৃষ্ঠা ২ৎ টাকা হিসাবে দিতে হয়। বেশী দিনের বন্দোবস্ত হইলে সুবিধাজনক নিয়ম আছে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশেষ দ্রষ্টব্য— শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে এই বৎসর ভাণ্ডার ১।।০ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইতেছে।

Printed by K.C. Aich at the "Commercial Press"
27, Hurtokee Bagan Lane Calcutta.

স্বদেশ

(সাপ্তাহিক পত্র)

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম.এ, বি.এল।

"স্বদেশ" বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। লোকশিক্ষার জন্য এরূপ সংবাদপত্র আর নাই বলিলেও চলে। ইহার ভাষা, ভাব, বিষয় ও রুচি সমস্তই সুন্দর ও মার্জ্জিত। "স্বদেশে" শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম্মনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি যাবতীয় অত্যাবশ্যক বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। লেখকগণ অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নহেন। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী এবং সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। বালকবৃদ্ধ, যুবকযুবতী মাতাকন্যা, পিতাপুত্র সকলে একত্র বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারেন। "স্বদেশের" কাগজ, আকার, মুদ্রাঙ্কণ সমস্তই পরিপাটী ও মনোজ্ঞ। ইচ্ছা করিলে সংখ্যাগুলি একত্র বাঁধাইয়া রাখিতে পারা যায়। মূল্য যৎসামান্য। ডাঃ মাঃ সমেত সহর ও মফস্বল সর্ব্বত্র বার্ষিক ২্ দুই টাকা মাত্র। "স্বদেশ" পাঠে একাধারে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রপাঠের আনন্দলাভ করিবেন। বঙ্গভাষায় এরূপ সংবাদপত্র অপূর্ব্ব। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সমস্ত সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ১ম ও ২য় সংখ্যা ব্যতীত পুরাতন সমস্ত সংখ্যা এখনও দিতে পারি। কিন্তু অধিকসংখ্যক কাগজ আর নাই। সুতরাং সত্বর গ্রাহক হইবেন। আবশ্যক হইলে ১ম ও ২য় সংখ্যা পরে মুদ্রিত করিয়া দিব। নমুনার জন্য /০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইবেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এখন যাঁহারা "স্বদেশে"র গ্রাহক হইতে শৈথিল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে দুঃখিত হইতে হইবে। মূল্য অগ্রিম দেয়। আমার নিকট পাঠাইবেন। ইতি।

শ্রী শরচ্চন্দ্র দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ।
২৪নং মীরজাফর্স লেন কলিকাতা।

ইংরাজি-সোপান

এই পুস্তক সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

ইংরাজি-সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের জন্য রচিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসঙ্কোচে এই গ্রন্থ সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। যাঁহারা অধিক বয়সে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার সাহায্যে অল্প দিনেই শিক্ষার্থিগণ ইংরাজিভাষার শিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন ইহা আমাদের জানা কথা।

এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নিয়মিত পাঠের অন্তর্গত নহে। ছাত্রগণ যখন অক্ষর পরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনই ইংরাজি ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য। ইহা ভাষাশিক্ষার ড্রিল্। শিক্ষক ক্লাসের জন্য ছাত্রগণকে দাঁড় করাইয়া ইংরাজি ভাষায় আদেশ করিবেন, তাহারা পালন করিতে থাকিবেন। যখন বলিবামাত্র তাহারা যথারূপে আদেশ সম্পন্ন করিবে তখন বুঝা যাইবে আদেশ-বাক্যেব তাৎপর্য্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইংরাজি বই পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই এই সহজ উপায়ে বিস্তর ইংরাজিশব্দ তাহাদের কর্ণে ও তাহার অর্থ তাহাদের মনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে শিক্ষা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।

ইংরাজি-সোপানের নিয়মিত পাঠ্য-অংশ যখন ছাত্রগণ চর্চ্চা করিবে তখনও এই ড্রিল্ অংশ প্রত্যহ অভ্যাস করিতে থাকিলে তাহাদের উপকার হইবে।

ইংরাজি-সোপানের উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দান করা হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থ অপরাপর বিদ্যালয়ে প্রচলিত ও সাধারণের নিকট আদৃত হয়, তবে তদ্দ্বারা বোলপুর বিদ্যালয় সাহায্য লাভ করিবে।

মূল্য—

প্রথম ভাগ — ছয় আনা

দ্বিতীয় ভাগ — আট আনা

শ্রীকেদারনাথ দাস গুপ্ত

৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

NOTICE

1. The "Industrial India" is a monthly journal dealing exclusively with subjects on Indian Arts, Industries and Manufactures.
2. The annual subscription is Rs. 2 only. The subscription in every case will begin from January.
3. All publications in exchange and all articles for publication should be addressed to the Editor at the "Industrial India Office".
4. All subscriptions and remittances and business communications should be addressed to the Manager.
5. Rates for advertisement may be ascertained on application to the Manager.
6. Sample copy annas 4.

"Industrial India" Office, Manager.
5, Sukea's Street, Calcutta. **INDUSTRIAL INDIA.**

N.B.— A Supplement to the February issue of "Industrial India" contains the most interesting and useful article on Handloom Industry by Mr Havell, Principal, Government School of Arts, with ten highly finished half-tone plates to illustrate the different types of handlooms used in Europe, Japan and other countries Neatly printed in handmade antique paper and nicely got up.
Price to subscribers of "Industrial India" Annas Eight only.
And to the public Rupee one only.

Commercial Press

27, Hourtokee Bagan Lane, Calcutta
We undertake all kinds of printing works :-
FANCY AND ARTISTIC
Printing in Gold and Silver Colours.
Printing from Half-Tone
Blocks and Woodcuts.

We print question papers 2 rupees a page for 1,000 copies or less than that of the same kind and keep them secret with greatest care.

K. C. Aich.
Manager.

N.B.— We promptly despatch all orders.

ভাণ্ডার ।। ফাল্গুন ১৩১৩

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত "স্বরাজ" এবং সর্ব্বসাধারণে যাহাকে "স্বায়ত্ত-শাসন" **(Self-government)** বলিয়া থাকে, তাহা আমরা পাইবার উপযুক্ত কি না?*

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত 'স্বরাজ' এবং 'স্বায়ত্ত শাসন' বলিয়া যাহা সাধারণে পরিচিত, তাহা আমার মতে ঠিক একার্থবোধক নহে। "স্বরাজে" রাজশক্তির পূর্ণ বিকাশ। স্বায়ত্তশাসনে সেই শক্তির আংশিক প্রকাশ, এই পার্থক্যের বিষয় আলোচনা না করিয়া প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়েরই অনুধাবনা করা যাক।

ইংরেজীতে যে একটি প্রবচন আছে "First deserve and then desire" অর্থাৎ "প্রথমে কোন অধিকার লাভের উপযুক্ত হও, তার পরে সেই অধিকার লিপ্সু হও।" ইহা আমার মতে সর্ব্বতোভাবে সমীচীন নহে, কারণ আকাঙ্ক্ষা হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব হয়। প্রথমে ইচ্ছা, বাসনা বা কামনা, তার পরে কার্য্য, ইহাই মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। সুতরাং ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে কোন বিষয়েই উপযুক্ততালাভ করা যায় না। যাহারা স্বরাজকামী, তাহারাই স্বরাজ লাভের অধিকারী হইতে পারে এবং তদুপযোগী উপযুক্ততা লাভ করিতে পারে। বাসনা-সংহারই কর্ম্মবন্ধচ্ছেদের একমাত্র উপায় বলিয়া হিন্দুদর্শনেও কথিত হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত ইংরেজী প্রবচনের বা কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। আমরা 'স্বরাজ' লাভের

---

* ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নওরোজি 'স্বরাজ'-এর প্রস্তাব করেন। মডারেট নেতারা কেউ-কেউ তাকে ব্যাখ্যা করেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন হিসাবে। — সংকলন-সম্পাদক

উপযুক্ত হইয়াছি কি না, এই প্রশ্নের বিচার করিতে গেলেও দেখিতে হইবে যে, আমরা 'স্বরাজ' লাভের আকাঙক্ষা করি কি না। যখন কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বরাজলাভের বাসনা উদ্বুদ্ধ হইবে তখনই ভারতবাসী স্বরাজলাভের উপযুক্ত হইবে, বাহিরের কোন শক্তিই সেই অধিকার লাভের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না।

ইংরেজ গভর্ণমেন্ট যখন তথাকথিত "স্বায়ত্তশাসন" এই দেশে প্রবর্ত্তিত করেন, তখনও এই বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, ভাবতবাসী স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত হয় নাই, সুতরাং এই প্রণালী অনবলম্বনীয়। তদুত্তরে লর্ড রিপণ প্রভৃতি রাজনীতিকগণ বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বতোভাবে স্বায়ত্তশাসনক্ষম করিতে হইলেও ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দিতে হয়। হাঁটাইতে আরম্ভ না করিলে আর শিশু হাঁটিতে শেখে না। ক্ষমতা ও শক্তিব ব্যবহাবে ও প্রয়োগেই, তাহার অস্তিত্বের বিকাশ ও প্রকাশ। আর এক কথা, স্বরাজ লাভেব কি কোন একটা বিশেষ উপযুক্ততা বিজ্ঞান কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে? যখনই জনসাধাবণের মধ্যে স্বদেশানুরাগ প্রদীপ্ত হয়, যখনই পবাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খল অত্যন্ত অসহ্য বলিয়া অনুভূত হয়, তখনই বোধ হয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনীয় হয়। মোহের অবসান না হইলে অর্থাৎ মোহবন্ধ না কাটাইতে পাবিলে যেমন দর্শন শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মপদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না, তেমন স্বরাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেও আমাদের মোহবন্ধন কাটাইতে হইবে। যে কারণেই হউক, আমরা অদ্যাপি দাসত্বের কঠিন নিগড়ের বেদনা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছি না, আত্মশক্তির মহিমা বুঝিতে পারিতেছি না। যখন এই বেদনা অনুভূত হইবে, যখন স্বদেশপ্রীতি আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত হইবে, তখনই আমরা স্বরাজলাভের অধিকারী হইব। জনসাধারণের মধ্যে সেই স্বদেশপ্রীতিকে জাগ্রত করা ও দাসত্বের বেদনা অনুভব করাইয়া দেওয়াই বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশহিতৈষীর একমাত্র কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে, আমরা এখনও স্বরাজলাভের পূর্ণ অধিকারী হই নাই, আমাদের মোহবন্ধ ছিন্ন হয় নাই, স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত হয় নাই। যে শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বরাজেব জন্য লোলুপ হইয়াছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র কর্ত্তব্য, সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে স্বদেশানুরাগ প্রদীপ্ত করা। লেখকের লেখনী, বক্তার বাগ্মিতা, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, কর্ম্মশীলের কর্ম্ম, সমস্তই এই একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। তাঁহারাই সেই শুভদিনকে নিকটবর্ত্তী করিতে পারেন, যে দিন ভারতবাসী, 'স্বরাজ' লাভ করিয়া জগতে একটি মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিবেন, তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে,

সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত, ইহা মনে করিয়াই সকলের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে, 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত, ইহা মনে করিয়াই যথাসম্ভব চলিতে হইবে; অর্থাৎ যে যে বিষয়ে অন্যের সাহায্য ভিন্ন আমরা চলিতে পারি, সেই সেই বিষয়ে যেন আমরা অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা না করি। রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজতন্ত্রেরই অভিব্যক্তি। সমাজতন্ত্রে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্রতন্ত্রেও স্বরাজ অচিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আজকাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে দুইটি দলের আবির্ভাব হইয়াছে, (অর্থাৎ যাঁহারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তির বলে রাজনৈতিক অধিকার লাভেচ্ছু তাঁহারা) তন্মধ্যে শেষোক্ত দলের অনুকূলে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময় প্রকৃত 'স্বরাজ' লাভের প্রকৃষ্ট সময় না হইলেও, সেই সময়টিকে সমীপবর্ত্তী করিতে স্বরাজের আকাঙক্ষা সকলের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, স্বাবলম্বন ও স্বপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ঘোষণা করিতে হইবে, পরানুবর্ত্তিতা ও পরমুখাপেক্ষিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রচলিত পদ্ধতির অনুগমন করিলে সিদ্ধি ক্রমেই সুদূরবর্ত্তিনী হইবে।

২। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষেই প্রজাশাসননীতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। প্রকৃতি - রঞ্জন হেতু প্রিয়তমা মহিষীকে বনবাসিনী করিয়া রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ভারতবর্ষের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। সেই বংশের বংশধরগণ স্বায়ত্তশাসনে কখনই অনুপযুক্ত হইতে পারে না। বংশ-গৌরব অনুপযুক্তকে উপযুক্ত করিতে পারে না, কিন্তু তাহার মহনীয় স্মৃতি মানবের সৎপ্রবৃত্তির উদ্বোধক হয় এবং অসৎ প্রবৃত্তির উদ্বোধনে শাণিত অস্ত্রের কার্য্য করে।

মস্তকোপরি সুশাণিত তরবারি লম্বিত রহিলে অথবা হস্তপদ সুকঠোর শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকিলে মনুষ্যহৃদয়ের প্রধানতম বৃত্তিগুলি ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন রহে। আত্মশক্তির উপর পরিচালিত না হইলে অন্তঃকরণে নির্ম্মল আনন্দ বা বিমল শান্তি অব্যাহত থাকা সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অথবা জীবনসংগ্রামে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা শতধা স্ফুরিত হইবার সুযোগও প্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে জেতা ও বিজীতগণের

[বিজিতগণের] মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা, সহানুভূতির পরিবর্ত্তে অত্যাচার অনাচার, উৎপীড়নের বাহুলতা অনিবার্য্য। যথেচ্ছাচার শাসনতন্ত্র প্রকৃত প্রজাপালনের সহায়তা কখনই করিতে পারে না, অধিকন্তু তাহায় বিষময় ফল দেশে হলাহল উদ্গীরণই করিয়া থাকে। অসভ্যাবস্থায় মানুষ মস্তক পাতিয়া রাজশক্তির সকল নির্য্যাতনই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তাহারা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলে, স্বাধীনতার বিমল জ্যোতিতে প্রতিভাত হইলে স্বভাবতই ব্যগ্র হইয়া পড়ে। তৎকালে তাহাদের এই দুর্দ্দমনীর আকাঙক্ষার ব্যর্থতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যে বিবেকী রাজা রাজ্যের এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রকৃত হিতকামী ও অনন্তকাল ধরিয়া রাজশক্তির স্থায়িত্ব অভিলাষী, তিনি স্বেচ্ছায় প্রজাকে আত্মশাসনাধিকার দিয়া প্রজার আন্তরিকতাপূর্ণ শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা এবং প্রীতি আকর্ষণ করেন।

এক্ষণে আমরা 'স্বরাজ' লাভের উপযুক্ত কিনা? দেড় শত বৎসরেরও অধিক কাল ইংরাজ আমাদের দণ্ডমুণ্ডের প্রভু, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কৈ আমাদের অন্তঃকরণে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় নাই। আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস রহিলে কেহ কখনই কোন অধিকার পাইবার অসঙ্গত বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না। আমবা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হইয়াছি বলিয়াই এ অধিকার চাহিতে সাহসী হইয়াছি। স্বীকার করি, মধ্যবর্ত্তী যুগে আমাদিগের মধ্যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। একতার অভাব, যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সমাদরে এবং তাঁহার গুণগ্রহণে পরাঙ-মুখতা জাতীয় অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। এই দুরন্ত ব্যাধি আমাদের দেহে সংক্রামক ব্যাধির আত্মপ্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে সেই জাতীয় দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। সেই জন্যই আজ আমরা বিভিন্ন প্রদেশের ভারতসন্তান একতাসূত্রে সম্বন্ধ হইয়া দেশের অভাব অভিযোগের পরিচিন্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যোগ্য ব্যক্তির অভ্যুত্থানে ঈর্ষাপরায়ণ না হইয়া তাঁহার সাহচর্য্য করিতে শিখিয়াছি। ইংরাজ আমাদিগকে স্বরাজ লাভের উপযুক্ত করিবার জন্যও শিক্ষা দিয়াছিলেন অথবা দিতেছেন, এ বিশ্বাস আমরা করি না। মহারাণীর ঘোষণায় এবং বহু উচ্চ রাজপুরুষের উক্তিতে এই প্রকার আশার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ব্যবহারে সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়; অধিকন্তু লর্ড লিটনের গুপ্ত মন্তব্য এবং কর্জ্জনের প্রকাশ্য উক্তি এ বিষয়ে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপেই নিরাশ করিয়াছে। অশিক্ষিত প্রজাশাসন দুরূহ ব্যাপার, শিক্ষিত ভারতবাসী এই কার্য্যে তাঁহাদের নির্ব্বিবাদে সহায়তা করিয়া তাহাদের

পরিশ্রমের ফল তাঁহাদিগকে উপভোগ করিতে দিবে, এই জন্যই সুচতুর ইংরাজ কূটরাজনীতির সূক্ষ্ম গবেষণায় আমাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অধিকারী করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি সদিচ্ছা নিহিত রহিত, তাহা হইলে আজ তাঁহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে বর্ণ-বৈষম্য হেতু সর্ব্ববিষয়ে তারতম্য উপলব্ধি করিবার অবসর আমাদিগের উপস্থিত হইত না। আর বহু পূর্ব্বে আমরা রাজার বিশ্বাস-ভাজন হইয়া স্বরাজ মহীরুহের সুপক্ক ফলের সুমধুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতাম।

স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক তাহা কি আমাদের নাই? দ্বিধাশূন্য হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিব, আমরা স্বরাজলাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে প্রভূত নৈতিক বল একান্ত আবশ্যক। এই নৈতিক বল ধর্ম্মভাবের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। যে হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের অভাব তথায় প্রকৃত নৈতিক বল রহিতেই পারে না। কোটি কোটি নরনারীর শুভাশুভ যাহাদের করে ন্যস্ত, তথায় নৈতিক বলের অভাব পরিলক্ষিত হইলে কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতে পারে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির সহজেই অনুমেয়। অপক্ষপাত বিচারে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ধর্ম্মজগতে ভারতবাসীরই সর্ব্বোচ্চ আসন। সুতরাং ভারতবাসী যাদৃশ নৈতিক বলে বলীয়ান হইতে পারে অন্য কোথাও তাহা সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয় উপকরণ—ন্যায়পরায়ণতা; পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বর্ত্তমান বা অতীত ইতিহাসের অনুসন্ধান লইলেই সর্ব্বত্র এই বৃত্তির অসদ্ভাব লক্ষিত হইবে। কূটরাজনীতির অবৈধ সম্মান রক্ষার জন্য পাশ্চাত্য জাতি সকল নীতিরই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন, অযথা স্বজাতিবাৎসল্য বা প্রীতির জন্য অথবা স্বার্থরক্ষার হেতু ইহারা সহজেই ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না, কিন্তু ভারতবাসী গৃহক্ষেত্রেই হউক আর বৈষয়িক বা সামাজিক অথবা যে কোন ক্ষেত্রেই হউক ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নহে। সুদূর অতীতে ইহার রাশি রাশি প্রমাণ তো আছেই, মধ্য যুগে এবং বর্ত্তমানেও এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

তৃতীয় উপকরণ— সত্যবাদিতা, সত্যের প্রকৃত আদর ভারতেই আছে। অন্য দেশের সত্যপ্রিয়তা ভাষার বাগাড়ম্বরে সূচিত হয়, উপদেশের কণ্ঠে পর্য্যবসিত হয়, আবার রাজনীতিক্ষেত্রে ইহার অস্তিত্বের অনুভূতিই লক্ষিত হয় না; আর ভারতবাসী সত্যপ্রিয়তার জন্য আদিম কাল হইতেই বিশ্ববিখ্যাত।

তাহার পর আনুষঙ্গিক উপকরণ— কার্য্যকুশলতা, প্রতিভার স্ফূরণ ও বিশ্বস্ততা। কর্ম্মক্ষেত্র ব্যতীত কাহারও গুণরাশির বিকাশ সম্ভব নহে, নিজ শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ না পাইলে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। বহুমূল্য হীরক খনির তিমির গর্ভে অনাদরেই অবস্থিতি করে। বিবিধ প্রকারের পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভারতবাসীর উচ্চ প্রতিভার জ্বলন্ত প্রমাণে পাশ্চাত্যগণের মস্তক অবনত হইয়াছে। রাজকীয় ব্যাপারে ভারতবাসী যে কোন উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের অসাধারণ কর্ম্মপটুতা, অপরিসীম প্রতিভা, অতুলীয় ন্যায়পরায়ণতা এবং বিপুল বিশ্বস্ততা দেখিয়া রাজপুরুষেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে ভারতের প্রজাসাধারণ স্বরাজের অধিকারী ছিল। যখন হিন্দুরাজা ছিল, তখন রাজা নামতঃ স্বেচ্ছাচারী হইলেও প্রজার মত লইয়াই রাজ্য শাসন করিতেন। রামায়ণের যুগ হইতে প্রজার এই অধিকারের আভাস পাওয়া যায়। তৎকালে ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল, নিষ্কাম ব্রাহ্মণ প্রকৃতিপুঞ্জের মুখপাত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। প্রতি কার্য্যেই প্রজার তুষ্টি সাধনই রাজার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" যিনি প্রজারঞ্জনে সমর্থ হইতেন, তাঁহাকেই সার্ব্বভৌম সম্রাট নামে অভিহিত করা হইত। মুসলমান রাজত্বকালেও প্রজাশক্তির প্রতিপত্তি লুপ্ত হয় নাই। তোড়লমল, মানসিংহ, বীরবল প্রভৃতি এই দেশীযেরাই মুসলমান রাজ্য-তরণীর কর্ণধার ছিলেন এবং তজ্জন্যই পাঁচশত বৎসরেবও অধিককাল তাঁহারা এ দেশে রাজত্বসুখ উপভোগে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এ দেশের লোক যদি স্বায়ত্তশাসনে অনুপযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে কোন জাতি তাহার উপযুক্ত পাত্র, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে বিষয়ের মীমাংসা হয় না।

হয়ত ২/১টি ক্ষুদ্র বিষয়ে অণুপরিমাণ অযোগ্যতার কারণ রহিতে পারে, কিন্তু কর্ম্মের দায়িত্বে ও চলিবার সুযোগ না দিলে চিরকালই সে পঙ্গু হইয়া রহিবে। ইংলণ্ডের যে স্বাধীন প্রজা নিজেকে বিশাল রাজশক্তির একটি অংশ বলিয়া অহঙ্কার করে, শক্তি প্রদত্ত না হইলে তাঁহার সে অহঙ্কার প্রদর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইত না। বীজ বপন না করিলে ফললাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগকে স্বরাজলাভের অনুপযুক্ত মনে করিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না, সুযোগ দাও, শক্তির পরিচয় পাইবে।

তবে একটি বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অন্য দেশের প্রজামণ্ডলী স্বায়ত্তশাসনের জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করে, প্রার্থনার বিফলতায় বিদ্রোহাচরণ করিয়া রাজার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, নররক্তে দেশ প্লাবিত হয়, রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন রাজা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়েন। আর আমরা ভারতবাসী রাজাকে অন্য চক্ষে দেখি, রাজার দর্শনে আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করি, রাজার অমঙ্গলকামনা করা আমরা পাপজনক বলিয়া মনে ভাবি, শত অত্যাচার আমাদের বুকের উপর হইতেছে, তথাপি রাজদ্রোহিতার কলুষ ভাব আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। কিন্তু আমাদের এ গুণের, এ সহিষ্ণুতার, এ অকপট রাজভক্তির পুরস্কার নাই। রাজার যদি গুণগ্রাহিতা রহিত, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে "স্বরাজ" "স্বরাজ" করিয়া এই ভাবে চীৎকার করিতে হইত না, আপনা হইতেই তিনি আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া এই শক্তিগুলি অর্পণ করিতেন।

সর্ব্বগুণের আধার, সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়া সঙ্গত অধিকারে আমরা বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হইতেছি, রাজার এ দুরপনেয় কলঙ্ক বাস্তবিকই রাখিবার স্থান নাই।

ভান্ডার ।। চৈত্র ১৩১৩

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা স্বরাজ অথবা স্বায়ত্তশাসন পাইবার উপযুক্ত কি না?*

উত্তর

১। শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বি.এ

এই প্রশ্নের মীমাংসা নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে ঃ—

প্রথমত ঃ— স্বরাজ কাহাকে বলে এবং ইহা লাভের সর্ত্তনির্দ্ধারিণ।

দ্বিতীয়ত ঃ— আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

প্রথমত ঃ— স্বরাজ অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের স্থূল অর্থ ব্যক্তি বিশেষের স্বসম্বন্ধীয় রাজশক্তিলাভ ও চালনা। আত্মশাসন, সমরক্ষণ, অভাবদূরীকরণ ও কল্যাণসাধনের জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা এবং অর্থসংগ্রহ ও বিলিবন্দোবস্তের আবশ্যক, সেই সকল কার্য্য যখন ব্যক্তিবিশেষ স্বয়ং নির্ব্বিরোধে সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন তাহার স্বরাজলাভ ঘটে। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজীকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত "স্বরাজে"র লক্ষ্যও ইহাই; তবে এখানে "স্ব" শব্দ কিছু বিস্তৃতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে— ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক "স্ব" একটি অতি বৃহৎ জাতীয় "স্ব" তে বিলীন হইয়াছে; ক্ষুদ্র আমিত্ব,— আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার সম্প্রদায়, আমার প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আমার দেশে, আমার জাতিতে উন্নীত হইয়াছে। অতএব ব্যক্তিবিশেষের স্বরাজলাভ ব্যাপারে যাহা, সমগ্রজাতির স্বরাজলাভেও তাহাই কর্ত্তব্য ও প্রতিপাল্য। তফাৎ, শুধু প্রথমটিতে আমিত্বজ্ঞান, দ্বিতীয়টিতে একজাতিত্ববোধ আবশ্যক।

---

* চৈত্রের প্রশ্নটি ফাল্গুনেই তোলা হয়েছিল। — **সংকলন-সম্পাদক**

এখন অর্থপর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, "স্বরাজ" লাভের জন্য নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে।

১ম— একজাতিত্ববোধ।

২য়— জাতীয় আত্মনির্ভরতা— যে ব্যক্তি কিম্বা যে জাতি আত্মনির্ভরপর নহে— বুদ্ধিবিদ্যার জন্য, নিত্য প্রয়োজনীয় ও বিলাসিতার দ্রব্যাদির জন্য, অর্থের জন্য, কি শাসন-সমরক্ষণের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী, রাজ-শক্তিলাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে চিরপরপদানত। আবার এই আত্মনির্ভরতা লাভেরও কয়েকটি সর্ত্ত আছে— আত্মাদর ও আত্মবিশ্বাস না থাকিলে কোন মানুষ কি জাতিই আত্মনির্ভরপর হইতে পারে না। যাঁহারা নিজ শক্তির উপর আস্থাবান্ হইয়া, নিজেকে সম্মান করিতে শিখিয়াছেন, শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও স্বশক্তির বলেই সিদ্ধির মন্দিরে পৌঁছিতে পারিবেন, যাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারাই এই বিঘ্নসঙ্কুল-সংসার পথে, পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়াও অধিকতর উৎসাহ ও অধ্যবসায়-সহকারে পরের হাসিভ্রূকুটি, শত্রুতা ও মিত্রতা, অদৃষ্টের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া, শান্ত মনে আত্মপদে ভর করিয়া চলিতে পারেন।

৩য়— আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মশক্তির গতি ও পরিমাণ এবং আত্ম-অভাব ও ত্রুটিবোধ। নিজেকে যথার্থভাবে জানিতে না পারিলে, স্বশক্তি যথার্থরূপে পরিমাণ করিতে না পারিলে, আত্মবিশ্বাস জন্মিতে পারে না। আত্মবিশ্বাসের অভাবে এবং আত্মশক্তির গতি ও পরিমাণ না জানিয়া শক্তি চালনা করিয়া ব্যর্থকাম হইলে অধিকাংশস্থলে আত্ম-সম্মান জন্মিতে ও তিষ্ঠিতে পারে না। ফলে আত্মনির্ভরতাগুণ বিকশিত হয় না। বিশেষ, অসাধ্য বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া দু'চারিবার অকৃতকার্য্য হইলেই আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি আত্মত্রুটিদর্শনে ও সংশোধনে অক্ষম হইয়া, হতাশভাবে ক্লান্তমনে পরের উপর চাপিয়া পড়েন।

৪র্থ— আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ — আত্ম-কলহ উন্নতির দুর্দ্দমনীয় শত্রু। প্রত্যেকের পক্ষে, সংযম ও ত্যাগ-স্বীকার ব্যতীত বহুজনসাধ্য ব্যাপারে আত্মকলহ নিবারিত হইতে পারে না। দাদাভাইর প্রস্তাবিত "স্বরাজে" জাতীয় হিসাবে ভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের কোন ক্ষমতা, অধিকার বা অস্তিত্ব নাই। এখানে সমগ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "স্ব" একটি অতি বৃহৎ "স্ব"তে পরিণত হইয়াছে; ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের নিকট আত্ম-বলিদান করিয়াছে; সর্ব্বসাধারণের মনোনীত ও নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের সুবিবেচিত সঙ্কল্প ও

অভিপ্রায়ই জাতীয় শক্তিকেন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সর্ব্বসাধারণকেই সংযতমনা হইয়া জাতীয় স্বার্থের নিকট সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বলি দিতে হইবে। যে জাতির ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া, অন্য কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, সে জাতির মধ্যে, একের সঙ্গে অপরের, প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধ ঘটে, স্বরাজলাভ তাহার পক্ষে স্বপ্নবৎ অলীক।

দ্বিতীয়তঃ— এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই সর্ত্ত প্রতিপালন করিয়াছি কি না, করিলে কতদূর করিয়াছি, দেখা যাইবে। তবেই আমরা স্বরাজ-লাভের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, ইহা মীমাংসিত হইবে।

একজাতিত্ব-বোধ— ইহার জন্য প্রধানতঃ চারিটি বিষয়ের আবশ্যক— এক দেশ, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম ও এক শাসন। প্রথমটি আমাদের পূর্ব্বাপরই আছে। শেষোক্তটিও আছে। ধর্ম্ম, সমাজ, সম্প্রদায় কি প্রদেশ হিসাবে বিভিন্ন দলভুক্ত হওয়াতে, একদেশবাসী হইয়াও পূর্ব্বে আমরা একজাতিত্বেব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু একশাসনাধীন হইয়া, কর্ত্তাকর্ত্তৃক তুল্যভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানালোকে দীপ্ত এবং অর্থ ও শাসন-বিষযে তুল্যভাবে নিষ্পেষিত হইয়া, এখন আমরা বেশ বুঝিয়াছি, আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্মকৃত্যে সহস্র-পার্থক্য থাকিলেও সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে আমরা এক। বর্ত্তমান শাসনের গুণে আমরা একভাষা পাইয়াছি, ইংরেজী ভাষা বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে হৃদয়-বিনিময়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য-জ্ঞানালোকে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়তায় ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাহ্যিক ক্রিয়া-কাণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া হিন্দু-মুসলমান, পার্শী-খ্রীষ্টান আমরা মহা অদ্বৈতধর্ম্মবাদের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এই সকল কারণে ভারতময় জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইয়াছে। তাই, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বেদনা শুধু বাঙ্গালীর প্রাণে লাগে নাই, সমগ্র ভারতের প্রাণে লাগিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, অঙ্গবঙ্গ-কলিঙ্গ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, কুমারিকা, হিমালয়, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে সকলেই বাধা দিয়াছে; সকলেই কাঁদিয়াছে, এখনো প্রতিবাদ করিতেছে। জাতীয় জীবন সতেজ হইয়াছে বলিয়াই, বরিশাল ও কুমিল্লার কলঙ্ক কাহিনী বিদ্যুদ্বেগে ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়া আমাদের মনে হিন্দু-মুসলমান, পার্শী-খ্রীষ্টান সকলেরই মনে জাতীয় দীনতা ও বিজাতীয় অত্যাচার ও উপেক্ষার কথা তপ্ত-লৌহশলাকা দ্বারা ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে। "পঞ্জাবীর" বিচারে বৃটিশ সুবিচারের উপর শুধু পঞ্জাবী নহে, সমগ্র ভারতবাসীই আস্থাহীন

হইয়াছে। এখনো গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি ভারতের হৃদয়-বেদনা-জ্ঞাপন করিতেছে। জাতীয়-ধমনীতে আজ উষ্ণস্রোত সতেজে প্রবাহিত হইতেছে, তাই একটি স্বদেশী মামলা উপস্থিত হইলে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সমগ্রভারত হইতেই অর্থ ও সহানুভূতি প্রবাহিত হয়। আজ সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বিরোধ কত প্রশমিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত জাতীয়স্বার্থ-সাধনের জন্য আজ প্রশান্তমনে বিদেশে ছাত্র পাঠাইবার 'পাতি' দিতেছেন। স্বদেশের— স্বজাতির— কল্যাণ-সাধনের জন্য আর্জ হিন্দু-মুসলমান কার্য্যবিনিময় করিতেছে। "জাতীয় উত্থানের" নিকট ভারতবাসীর সমস্ত স্বার্থই এখন উৎসর্গীকৃত। একজাতিত্ববোধ ব্যতীত কখনো কি মুসলমান গোবধে বিরত থাকিত? না, স্বার্থপর নীচাশয়ের প্ররোচনায় ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কুমিল্লায় এই আত্মকলহ করিয়া আজ হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে অনুতাপ করিত? বৃটিশশাসনের কল্যাণে এবং বর্ত্তমান যথেচ্ছাচারিতার প্রসাদে, ভারতে একজাতিত্ববোধ দিনে দিনে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

আত্মনির্ভরতা— আমাদের ছিল না, এখন হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তেজের মোহন আলোকে, পাশ্চাত্য রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতির কূটপ্রহেলিকায় এবং পাশ্চাত্য বিলাসিতার স্রোতে সুদৃঢ় আকৃষ্ট হইয়া আমরা অন্তর্দৃষ্টিহীন হইয়াছিলাম। চাহিতে অবসর পাই নাই বলিয়া আমরা এত দিন আত্মঅভাব ও শক্তি বুঝিতে পারি নাই; অভাবপূরণের ভার বিদেশীর হাতে রাখিয়াছিলাম বলিয়া বহির্জগতের সঙ্গে তেমন সংঘর্ষণে পতিত হই নাই; কাজেই শক্তিচালনার অভাবে শক্তির গতি ও পরিমাণ জানিতে পারি নাই। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাবে আত্মনির্ভরপরায়ণ হইতে চেষ্টা করি নাই। এ দিকে সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়া, কোটি-কোটিবার পরপদে লাঞ্ছনা এবং অপমান ভোগ করিয়াও আপনাকে অনন্যোপায় মনে করিয়া, জলৌকার মত, তাহাকেই আকড়িয়া ধরিয়াছি। সহসা জাপানের অভ্যুদয়ে চক্ষু ঝল্‌সিয়া উঠিল; পরমুখাপেক্ষিতার ঘন অন্ধকার একটু অপসৃত হইল। এদিকে মিত্রভাবে যথা-সর্ব্বস্বসমেত যে পরপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উপেক্ষা ও অনাদরে, তাহার স্বার্থপরতা এবং অবিচার ও শোষণে আমাদের জ্ঞাননেত্র ক্রমেই উন্মীলিত হইতে লাগিল। আবার তাহারই প্রসাদে পাশ্চাত্যজ্ঞান বিজ্ঞানালোকে ক্রমশই অন্তর্দৃষ্টিপথ অধিকতর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। যতই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিতেছে, ততই বুঝিতেছি, সে আর আমি এক নহি। তাই ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমান-পার্শী আপনার দিকে দৃষ্টি

ফিরাইতে আরম্ভ করিলাম। ফলে একদিকে আত্মজ্ঞান হইতে আত্মসম্মান জাগ্রত হইয়া উঠিল; অপর দিকে বর্ত্তমান দীনতা ও হীনতার কথা ভাবিয়া প্রাণে নিদারুণ শেলাঘাত হইতে লাগিল। এই পৌনঃপুনিক আঘাতে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পরের এবং নিজেরও অজ্ঞাতসারে, বহুপুরুষাগতা মহতী কার্য্যকরী শক্তি সঞ্জাত হইতে লাগিল। এমন সময়ে জাতীয় জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে লক্ষ-লক্ষ প্রজার আবেদন-নিবেদন, চীৎকার ও ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া লর্ড কর্জ্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই আঘাতে এত দিনের অস্পষ্ট হীনতার কথা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইল। চক্ষুর ঠুলি পড়িযা গেল; একবার আপনার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শক্তি কত— তখনি আত্মনির্ভবতার বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া দিলাম— বিদেশী বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী গ্রহণ করিলাম। বঙ্গের স্বদেশী— একজাতিত্ববোধ ও আত্মজ্ঞানের বলে— ভারতময ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সামান্য সূঁচটির জন্য যাহারা এত দিন সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী ছিল, একদিনে আত্মপদে দণ্ডায়মান্ হইবার সংকল্প করা তাহাদের পক্ষে কম আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার কথা নহে। ইহা মুহূর্ত্তের উত্তেজনার ফল নহে। কঠিন বাধা অতিক্রম কবিযা আজ দু'বৎসর তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা অচল, অটল রাখিয়াছে; সরকারের বিঘ্নসম্পাদনসত্ত্বেও স্বদেশী দ্রব্যজাত হাট-বাজার পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিষয়ের অভাব এমন সুন্দরভাবে পূর্ণ করা কত বড় আত্মজ্ঞান ও আত্মনির্ভরতার নিদর্শন? ইহাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার আরও নিদর্শন— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন, রাজকর্ম্মচারীর লাঞ্ছনা ও প্রলোভনে অবহেলা। চাকুরী ও উপাধিব প্রলোভন, অত্যাচারে ভয় কিছুই, আজ আত্মজ্ঞানী ও আত্মবিশ্বাসী ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বার্থ হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিতেছে না। আমাদের বিরোধীপক্ষকর্ত্তৃক আত্মবিবাদ জন্মাইবার চেষ্টা সর্ব্বথা বিফল হইতেছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন তারিখে যে ভাব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহা দিনে-দিনে অধিকতর শক্তিলাভ করিতেছে। দৃষ্টিশীলের পক্ষে ভারতবাসীর আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার ইহাই চূড়ান্ত নিদর্শন।

আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ— ভারতবাসী চিরকালই সংযম ও ত্যাগের অতুল দৃষ্টান্ত। এই দীনাতিদীন, পরপদতলগত অবস্থায়ও তাহারা যে সংযমপালন ও যে আত্মবলি দিতেছে, জগতে তাহা দুর্ল্লভ। অকারণে অবৈধভাবে এত যে পুলিশের হস্তে অত্যাচার ও নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে— বরিশালের সেই কলঙ্ককাহিনী

ধৌত হইবার নহে— ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাযুবক তাহাতে কি দৈবসংযম ও সহিষ্ণুতার না পরিচয় দিয়াছেন! এত নিপীড়নের মধ্যে অন্য কোন জাতি কি এমন ধীর ও শান্তভাবে কার্য্য করিতে পারিয়াছে? বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিন গবর্ণমেন্ট বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কিন্তু সংযমী ভারতে একবিন্দুও রক্তপাত হয় নাই। আর প্রলোভন, নিপীড়ন, সব সহ্য করিয়াও ভারতবাসী দৃঢ়পদে প্রশান্তমনে জাতীয় উত্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আত্মবলি আবার কাহাকে বলে?

ইহা হইতে বেশ দেখা যাইতেছে, আমরা স্বরাজ পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং আজ হোক্ দু'দিন পরে হোক্, পাইবই।

২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

উত্তর দিবার আগে প্রশ্নটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত 'স্বরাজে'র প্রকৃত অর্থ কি? এ স্বরাজে আমাদের স্থান কোথায়, আমাদের বাস্তব অধিকার কি? কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজের উপনিবেশগুলিতে যেরূপ স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা, শ্রীযুক্ত নৌরোজি মহাশয় এইরূপ বলিয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশসমূহের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ। ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি লইয়া স্বাধীন বৃটিশসাম্রাজ্য;— ভারত অধীনভাবে এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত। ইংলণ্ড ও উপনিবেশ, সর্ব্বত্রই এক ইংরেজজাতি প্রধান অধিবাসী। ইংলন্ডবাসী ইংরেজ এবং ঔপনিবেশিক ইংরেজ সকলেই সমান স্বাধীন এবং সর্ব্ববিষয়ে সমাবস্থাপন্ন. এক একটি উপনিবেশ এক একটি স্বাধীন রাজ্যের মত। অন্যনিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যেক উপনিবেশ নিজ-নিজ-শাসন ও রক্ষণে সমর্থ ও অধিকারী। তবে ইংরেজজাতির শক্তি ও গৌরবে সকলেরই সমান স্বার্থ। এক সাম্রাজ্যভুক্ত থাকাতেই এই শক্তি ও গৌরবের স্থায়িত্ব। তাই ইংলণ্ডীর ও ঔপনিবেশিক ইংরেজ এক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া আছে। ইংলণ্ড সকলেরই আদি জন্মভূমি— সাম্রাজ্যশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বে কাহারও গৌরবের হানি নাই— এই কেন্দ্র অবলম্বনে সকলেরই এক সাম্রাজ্যমণ্ডলে অবস্থান সুবিধাজনক, তাই নামে মাত্র কেন্দ্র-স্বরূপ ইংলণ্ডের প্রাধান্য উপনিবেশসমূহ স্বীকার করে। কিন্তু ইংলণ্ডের কোন প্রকৃত ক্ষমতা কোন উপনিবেশের উপর নাই।

উপনিবেশগুলি যখন ইচ্ছা ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। ইংলণ্ডের সাধ্য নাই, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে এক বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। উপনিবেশের মত আত্মশাসন ও রক্ষণে সর্ব্বদা সামর্থ্য ও অধিকারলাভই ভারতে স্বরাজলাভ। এই স্বরাজ ইংরেজসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত কি বহির্ভূত হইবে, এ বাদানুবাদ নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। অন্তর্ভূত ও অধীন এক কথা নহে। 'স্বরাজ' যদি বলি, তবে ইংলণ্ডের রাজশক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে পারে না। তবে স্বরাজ-সিদ্ধ ভারত অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মশাসন ও রক্ষণে সম্পূর্ণ সমর্থ ও অধিকারী ভারত এবং ভারত বহির্ভূত ইংরেজসাম্রাজ্য, উভয়েই যদি মনে করে, এক সাম্রাজ্যভুক্ত থাকা উভয়ের গৌরব ও স্বার্থমূলক, তবেই একত্র থাকিবে, নচেৎ একত্র থাকার কারণ নাই। ভারত থাকিবে না, ইংলণ্ডও চাহিবে না; যতদূর বুঝিতে পারি, শ্রীযুক্ত নৌরোজি মহাশয় প্রস্তাবিত 'স্বরাজ' অথবা ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী— প্রকৃতপক্ষে ইহাব কম কিছুই নহে।

দ্বিতীয়তঃ 'স্বরাজ পাওয়া'— ইহার অর্থ কি? স্বরাজ পাওয়ার কথা বলিলে সহজেই মনে হয়, ইংরেজ দিবে তবে আমরা পাইব। কিন্তু স্বরাজ— প্রকৃত স্বরাজ— যে স্বরাজ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইল— তাহা কি ধরিয়া দিবার বা তুলিয়া পাইবার জিনিষ? স্বয়ং ইংরেজজাতিও স্বরাজ পায় নাই; আত্মশক্তিবলে, বহু সাধনার ফলে এই স্বরাজলাভ করিয়াছে। ঔপনিবেশিক ইংরেজও স্বরাজ 'পায়' নাই, আত্মশক্তিবলে লাভ করিয়াছে। উপনিবেশগুলিকে অধীন রাখার জন্য ইংলণ্ড বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলে আমেরিকার 'যুক্তরাজ্য' স্বতন্ত্র হইল। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দীর পরে যখন কানেডাও যায় যায় হইল, তখন সাম্রাজ্যের একত্ব, বল ও গৌরবরক্ষার জন্য সেখানে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা হইল। কানেডায় যাহা হইল, সমাবস্থাপন্ন অন্যান্য উপনিবেশেও তাহা না হইলে চলে না, তাই ক্রমে সর্ব্বত্র স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ইংরেজের উপনিবেশের সঙ্গে ভারতের তুলনা কি? এসিয়াতে জাপান ও পারস্যের প্রজাগণ প্রবলরাজ-বিরোধ ব্যতিরেকেও স্বরাজ লাভ করিয়াছে,— চীনেরও স্বরাজলাভের দিন নিকটে। কিন্তু এ সব দেশের সঙ্গেও ভারতের তুলনা হয় না। জাপানেই জাপানরাজের রাজত্ব, পারশ্যেই পারশ্যরাজের রাজত্ব। এই রাজত্ব— রাজত্বের সম্পূর্ণ শক্তি— একেবারে রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দের শক্তিসাপেক্ষ। ইয়োরোপ সমগ্র এসিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত। জাগ্রত প্রজাশক্তির দৃঢ়ভিত্তির উপরে রাজশক্তির স্থাপনে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় ব্যতীত

ইউরোপের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ান্তর নাই। তাই এই সব দেশের দূরদর্শী রাজার ও প্রজার অধিনায়কবর্গ স্বাধীন রাজতন্ত্র হইতে প্রজাতন্ত্র স্বরাজ গঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভারত ইংরেজের বাণিজ্যক্ষেত্র, ধন-অর্জ্জনের ক্ষেত্র। ভারতবাসী এই ক্ষেত্র পরিচালনার শ্রমজীবী মাত্র। ইংরেজ আপন শক্তিতে ভারতশাসন ও রক্ষণ করে। ভারতবাসী তাহাতে নির্জ্জীব যন্ত্রের মত মাত্র তার সহায়। যদি ইংলণ্ডের এবং ভারতের বর্ত্তমান সম্বন্ধ বজায় রাখা ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ভারতে প্রজাশক্তির নিদ্রাভিভূতিতেই ইংরেজের ইষ্ট, জাগরণে ইংরেজের অনিষ্ট। সুতরাং জাপান, পারশ্য ও চীনের মত অবস্থা আমাদের নাই। এই সব অবস্থা যাঁহারা ধীর ও গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই মনে করিতে পারেন না যে, ইংরেজ ধর্ম্মজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া স্বার্থত্যাগে ভারতবাসীকে স্বরাজ ধরিয়া দিবে। এইরূপ মানবাতীত দেবত্ব যদি ইংরেজে সম্ভব বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে ইহাও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, দেড় শত বৎসর ইংরেজশাসনের ফলে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষী, সর্ব্বথা পররক্ষিত ও পরশাসিত, পররক্ষণ ও পরশাসনে সন্তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট ভারতবাসী স্বরাজলাভের উপযুক্ত। সুতরাং এক কথায় এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, স্বরাজ যদি আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমরা স্বরাজ চালনা করিবার উপযোগী।